সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী
প্রফেসর এন্ড চেয়ারম্যান
সায়েন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
মহাপরিচালক, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন
সাবেক ডীন, শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
সাবেক পরিচালক, আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৫৬
সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন প্রকাশনা: ০১১

কপিরাইট©: গ্রন্থকার

প্রকাশকাল
প্রথমপ্রকাশ রবিউল আউয়াল - ১৪৪৫
কার্তিক - ১৪৩০
অক্টোবর - ২০২৩

প্রকাশক
মহাপরিচালক
সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন (সিআরপি)
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-৪৩১৮।
ফোন: +৮৮০৯৬১৩২৩০৫০৫, এক্সট:১৮৬১
মোবাইল:+০১৮১৯৩৩৬১১৮ (হোয়াটস্অ্যাপ)
ফ্যাক্স: +৮৮০২৩৩৪৪৬১৯৩০
ই-মেইল: dg.crp@iiuc.ac.bd; dmnhnadwi@iiuc.ac.bd
ওয়েবসাইট: www.iiuc.ac.bd

ISBN: 978-984-35-9031-2

মুদ্রণ
সামস ক্রিয়েশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১১-৭৬০৯৮৮

মূল্য
৪০০.০০ (চারশত টাকা)

SIRATUNNABI (S)'R UPADESH O SHIKKA [Biography of The Prophet (SAS)' Lessons and Advice] Written by Prof. Dr. Md. Nazmul Hoque Nadwi and published by Center for Research & Publication (CRP), International Islamic University Chittagong (IIUC), Kumira, Shitakunda, Chittagong-4318, Bangladesh. IP Tel.: +8809613230505, Extn:1861, Fax.:+8802334461930, October, 2023, Website:www.iiuc.ac.bd E-mail: dg.crp@iiuc.ac.bd Price TK.400.00 (Four hundred), U.S. Dollar 10.00 (Ten) only.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

[অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মধ্যে সুন্দর আদর্শ]
আল-আহযাব:২১।

উৎসর্গ

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আমার শ্রদ্ধেয় দাদা
মরহুম গোলাম কুদ্দুস সিকদার'র মাগফিরাত কামনায়

মহাপরিচলকের কথা

আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকূলের শেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নিজ সমাজে তথা সমগ্র আরবাঞ্চলে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন বিধায় কুরাইশ তাদের মূল্যবান সবকিছু তাঁর কাছে আমানত রেখে যেমন মূল্যবান বস্তুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো; তেমনি নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁকেই সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে একমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতো।

সীরাতে রাসুল (স) সাধারণ ব্যক্তি, সমাজ সংস্কারক বা কোনো জাতীয় নেতার জীবনালেখ্য নয় যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে সঠিক চিত্রায়ন করা যাবে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশের সাথে অহীর সম্পৃক্ততা বিদ্যমান এবং তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ ব্যতীত কোনো অভিমত ব্যক্ত করতেন না বিধায় তাঁর জীবনালেখ্য রচনা কুরআন করীম ও হাদীসে রাসুল (স)'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

"সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা" শিরোনামের ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক গ্রন্থটি সীরাতে রাসুল (স)'র চিরন্তন ও নান্দনিক সৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাবিত বিষয়াদির মাধ্যমে মানবজাতির সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ তথা মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশ কুরআন করীম অথবা হাদীসে রাসুল (স)'র রেফারেন্স দ্বারা আধুনিক গবেষণার আলোকে চিত্রায়ন করেছেন গ্রন্থকার প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী যা ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় প্রকাশিত কোনো সীরাত গ্রন্থে দৃশ্যমান হয়নি বিধায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন নিজস্ব প্রকাশনা নীতিমালা অনুযায়ী দুইজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করে গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সীরাত পাঠকের জ্ঞানভান্ডারে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আলোকিত জীবনের আদর্শে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মহাপরিচালক
সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০১
প্রসঙ্গকথা	০৫
সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের প্রচার-প্রসার	০৬
সীরাতে রাসুল (স) ও ইতিহাস	০৬
সীরাতে রাসুল (স) রচনার ইতিকথা	০৭
সীরাতে রাসুল (স) রচনার পথিকৃৎ	০৭
সীরাতে রাসুল (স) বর্ণনায় গবেষণামূলক পদ্ধতি	০৯
সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের পদ্ধতি	০৯
প্রথম অধ্যায়	১১
সর্বশেষ রিসালতের জন্য আরব অঞ্চলকে মনোনয়নের তাৎপর্য	১৩
পারস্য সম্রাজ্য ও তার ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি	১৩
রোম সম্রাজ্যের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ	১৩
কুসংস্কারে অধঃপতিত সহজ-সরল আরব যাযাবর	১৪
সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)	
পূর্ববর্তী দাওয়াতসমূহের সাথে ইসলামের সম্পর্ক	১৭
আক্বীদাহ বা বিশ্বাস	১৭
শরীয়াহ বা বিধান	১৮
ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরব অঞ্চলের ধর্মীয় বিশ্বাস	২০
অন্ধকার যুগের অবশিষ্ট একনিষ্ঠতা	২৩
মুহাম্মদ (স)'র জন্ম থেকে রিসালাত পর্যন্ত	২৪
জন্ম ও বংশ পরম্পরা	**২৪**
আল্লাহ'র রাসুল (স)' দুধমাগণ	২৮
সিরিয়া ভ্রমনে আবু তালিবের সফরসঙ্গী	৩১
খদীজার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ ও বিবাহবন্ধন	৩৪
কাবা নির্মাণে নবী (স)'র অংশগ্রহণ	৩৫
হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন বিরোধের সমাধান	৩৬
হেরা গুহায় তাঁর একাকিত্ববাস	৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪১
অহীর আগমন ও রাসুল (স) হিসেবে প্রেরণ	৪৩
প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনে দাওয়াত প্রচার	৪৬
প্রকাশ্যে দাওয়াতের প্রচার-প্রসার	৪৮
সংলাপের রাজনীতি	৫১
মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমানবিক ও ধ্বংসাত্মক অবরোধ	৫৫
অমানবিক অবরোধের উপদেশ ও শিক্ষা	৫৭

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
হিজরতের অনুমোদন	৫৮
দ্বীনের স্বাধীনতা রক্ষার্থে দেশ ত্যাগের অনুমোদন	৫৮
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি প্রথম প্রতিনিধি	৬১
শোকবর্ষ	৬৪
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তায়েফ অভিযাত্রা	**৬৬**
তায়েফ অভিযাত্রার শিক্ষা	৬৯
ইস্‌রা ও মিরাজ অনন্য মুজিযা	৭২
ইস্‌রা ও মিরাজ'র বিবরণ	৭২
ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া	৭৫
ইস্‌রা ও মিরাজের শিক্ষা	৭৭
হজ্ব মসুমে ইসলামের প্রচার-প্রসার	৮২
আকবাহ প্রথম'র বায়আত	৮৩
আকবাহ প্রথম'র উপদেশ ও শিক্ষা	৮৩
আকবাহ দ্বিতীয়'র বায়আত	৮৭
আকবাহ দ্বিতীয়'র উপদেশ ও শিক্ষা	৯০
মদীনায় হিজরতের অনুমোদন	**৯১**
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হিজরত	৯৪
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হিজরতের বিবরণ	৯৬
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কুবায় অতঃপর মদীনায় আগমন	৯৯
আবু আইউবের গৃহে রাসুল (স)'র অবস্থান	৯৯
হিজরতের উপদেশ ও শিক্ষা	১০০
তৃতীয় অধ্যায়	১০৩
নবযুগের সূচনা	১০৫
মদীনায় নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন	১০৫
মসজিদ নির্মাণ	১০৫
মসজিদ নির্মাণের বিধান ও শিক্ষা	১০৬
মুহাজির-আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	১০৮
মদীনার সনদ প্রণয়ন	১০৯
মদীনার সনদের শিক্ষা	১১১
ইসলামে জিহাদের বিধান	১১৩
জিহাদের প্রসঙ্গ কথা	১১৩
সকল আসমানী ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন	১১৩
আদর্শের যুদ্ধে পরাজয়ে মারণাস্ত্ররের আশ্রয়	১১৫
আসমানী ধর্মসমূহে জিহাদের বিধান	১১৫
পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের জিহাদে অংশগ্রহণ	১১৭

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মুসা (আ)'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ	১১৮
শামভীল (আ)'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ	১১৯
দাউদ (আ)'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ	১১৯
সুলায়মান (আ)'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ	১১৯
ঈসা (আ)'র যুদ্ধভাবনা	১২০
ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১২২
আল্লাহ'র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা	১২২
বিশৃঙ্খলা নিরসন	১২২
নির্যাতনের প্রতিরোধ	১২২
নির্যাতিত জনপদকে মুক্ত করা	১২২
বিদ্রোহ দমন	১২৩
রণাঙ্গনের আদর্শ	১২৩
বদর অভিমুখে অভিযান	**১২৫**
বদর অভিযানের প্রেক্ষাপট	১২৫
বদরযুদ্ধের চিত্রায়ন	১২৮
যুদ্ধবন্দির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১৩০
বদরযুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা	১৩১
পরামর্শ গ্রহণ	১৩১
আল্লাহ'র সাহায্য কামনা	১৩২
বারযখী জীবন	১৩৩
যুদ্ধবন্দির সাথে সদ্ব্যবহার	১৩৪
নবী-রাসুলগণের ইজতিহাদ	১৩৪
গনীমতের সুসম বন্টন	১৩৫
বদরযুদ্ধের কিছু বিরল ঘটনা	১৩৬
বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান	**১৪০**
ইহুদীদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা	১৪০
বনু কায়নুকার ইহুদীদের শেষ পরিণতি	১৪১
বনু কায়নুকার অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা	১৪২
উহুদ অভিমুখে অভিযান	**১৪৫**
উহুদযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	১৪৫
উহুদযুদ্ধের বিবরণ	১৪৬
উহুদযুদ্ধের শিক্ষা	১৪৮
উহুদযুদ্ধের কিছু বিরল ঘটনা	১৫৬
বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান	**১৬২**
বনু নাযীর অভিযানের প্রেক্ষাপট	১৬২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
বনু নাযীরের নির্বাসন	১৬৩
বনু নাযীরের ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষা	১৬৪
যাতুর রিকাই'র যুদ্ধ	১৬৭
যাতুর রিকাই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	১৬৭
যাতুর রিকাই যুদ্ধের শিক্ষা	১৭০
বনু আল-মুসতালাকের বিরুদ্ধে অভিযান	১৭২
বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	১৭২
ইফ্কের ঘটনা	১৭৫
বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা	১৭৮
আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ	১৮৪
আহযাব যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	১৮৪
মুসলিমদের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ	১৮৫
মুসলিমদের পরীখা খনন	১৮৫
পরীখা খননে মুনাফিকদের অবস্থান	১৮৭
বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গন	১৮৭
বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গনে মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া	১৮৮
বিনা যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়	১৮৯
আহযাব যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা	১৯১
কাযা নামায আদায়ে ফিক্হী বিধান	১৯৭
কাযা নামায সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত	১৯৮
কাযা নামাযের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১৯৮
বনু কুরাইযাহ'র বিরুদ্ধে অভিযান	**২০১**
বনু কুরাইযাহ অভিযানের প্রেক্ষাপট	২০১
বনু কুরাইযাহ'র অবরোধ	২০১
বনু কুরাইযাহ অভিযানের শিক্ষা	২০৩
চুক্তি ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতকের হত্যা বৈধ	২০৩
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সালিস নির্বাচন বৈধ	২০৩
বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইজতিহাদের বৈধতা	২০৪
মুহাম্মদ (স)'র নুবুওয়্যত সম্পর্কে ইহুদীরা জ্ঞাত	২০৪
আগমনকারীকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গ	২০৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি	**২০৬**
হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট	২০৬
আল্লাহ'র রাসুল (স) ও কুরাইশদের মধ্যে দূত বিনিময়	২০৭
বায়আতুর রিদওয়ান	২০৮
বৃক্ষবাসীর অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদা	২০৯

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি কুরাইশদের দূত ২১০
বুদাইল বিন অরকাহ আল-খুযায়ী'র দূতালী ২১০
উরওয়াহ বিন মাসউদ'র দূতালী ২১০
হুলাইস বিন আলকামাহ'র দূতালী ২১১
মুকরিয বিন হাফস ও সুহাইল বিন আমর'র দূতালী ২১২
সন্ধির ফলাফল ও তাৎপর্য ২১৪
হুদাইবিয়ার সন্ধিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রচেষ্টা ২১৫
হুদাইবিয়ার সন্ধির উপদেশ ও শিক্ষা ২১৮
হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান ২২১
যুদ্ধ ছাড়া অন্য বিষয়ে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ ২২১
ইসলামে পরামর্শের ধরণ-প্রকৃতি ২২২
রাসুল (স)'র নিদর্শনকে পুণ্য জ্ঞান করা ২২২
ব্যক্তি বিশেষকে অসীলাহ গ্রহণ ২২৩
ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুকে অসীলাহ গ্রহণ ২২৫
মানবজাতির সৎ কর্মকে অসীলাহ গ্রহণ ২২৭
খাইবার অভিমূখে অভিযান **২৩০**
খাইবার অভিযানের বিবরণ ২৩০
হাবশাহ থেকে জাফর বিন আবী তালিবের আগমন ২৩৩
খাইবার যুদ্ধের শিক্ষা ২৩৩
খাইবার যুদ্ধে উদ্ভাবিত শরয়ী বিধানসমূহ ২৩৪
পূর্বসতর্ক করা ব্যতীত আক্রমণের বৈধতা ২৩৪
কুরআন করীমের বর্ণনার ভিত্তিতে গনীমতের বন্টন ২৩৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতদের গনীমতের অংশীদারিত্বের বৈধতা ২৩৫
ভূমি বর্গাপ্রদানের চুক্তির বৈধতা ২৩৬
আগমণকারীকে জড়িয়ে ধরা ও চুম্বন প্রদানের বৈধতা ২৩৭
খাইবার যুদ্ধে প্রকাশিত দুটি মুজেযা ২৩৭
বিভিন্ন আরব উপ-জাতির বিরুদ্ধে অভিযান ২৩৮
ইসলামী দাওয়াতের নবযুগে পদার্পনের উপকরণ ২৪০
ওমরাতুল কাযা ২৪৩
ওমরাতুল কাযার উপদেশ ও শিক্ষা ২৪৪
ওমরাতুল কাযায় উদ্ভাবিত ফিক্হী বিধান ২৪৪
মূতাহ'র অভিযান ২৪৬
মূতাহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ২৪৬
মূতাহ যুদ্ধের বিবরণ ২৪৬
মূতাহ যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা ২৪৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মূতাহ যুদ্ধে উদ্ভাবিত শরয়ী বিধান	২৪৯
মক্কাহ বিজয়ের অভিযান	২৫১
মক্কাহ বিজয় অভিযানের প্রেক্ষাপট	২৫১
কুরাইশদের বিরুদ্ধে সন্ধি লঙ্ঘনের অভিযোগ	২৫১
সন্ধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খন্ডাতে কুরাইশদের প্রচেষ্টা	২৫২
নিজ কন্যার কাছে কুরাইশ দলপতি আশাহত	২৫২
বদরী সাহাবীর অনাকাঙ্খিত আচরণ	২৫৩
মক্কাহ বিজয় অভিযানের চিত্রায়ন	২৫৫
ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে কৌশল গ্রহণ	২৫৬
আল্লাহ’র রাসুল (স)’র মক্কাহ প্রবেশের বিবরণ	২৫৮
মক্কাহ বিজয় অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা	২৬১
সন্ধি সম্পাদন ও সন্ধিলঙ্ঘন সম্পৃক্ত বিষয়াদি	২৬২
বদরী সাহাবী হাতিবের অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রসঙ্গ	২৬৩
আবু সুফয়ানের বিষয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র অবস্থান	২৬৪
আল্লাহ’র রাসুল (স)’র মক্কাহ প্রবেশের চিত্রায়ন	২৬৭
হারামে মাক্কীর সাথে সম্পৃক্ত বিধানসমূহ	২৬৮
হারামে মাক্কীতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা	২৬৮
হারামে শিকারের নিষেধাজ্ঞা	২৬৮
হারামের উদ্ভিদ কাটার নিষেধাজ্ঞা	২৬৯
হারামে মুহরিম অবস্থায় প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়	২৬৯
হারামে মাক্কীর সীমানায় অমুসলিমদের অবস্থান অবৈধ	২৭০
হারামে মক্কীতে মহানবী (স)’র কর্মসমূহ	২৭০
বায়তুল্লাহ’র ভিতরে নামায আদায়	২৭০
ছবি তোলা ও ছবি আঁকার বিধান	২৭১
মক্কাহ বিজয় দিবসে রাসুল (স)’র ভাষণ	২৭২
মক্কাহ বিজয় যুদ্ধ না সন্ধির মাধ্যমে	২৭৩
হুনায়ন অভিমুখে অভিযান	২৭৫
হুনায়ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	২৭৫
হুনায়ন যুদ্ধের চিত্রায়ন	২৭৫
গনীমতের বন্টন ও ইসলামের ঘোষণায় ফেরত প্রদান	২৭৮
গনীমতের বন্টন ও কিছু অপ্রত্যাশিত মন্তব্য	২৭৯
হুনায়ন যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা	২৮১
শত্রুপক্ষের অবস্থা জানার লক্ষ্যে শত্রুদের মাঝে গুপ্তচর প্রেরণ	২৮২
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অমুসলিমদের অস্ত্র ধার করা বৈধ	২৮২
অমুসলিমদের সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা	২৮৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা নং
অমুসলিমদের যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহায্য-সহযোগিতা	২৮৩
সক্রিয় যুদ্ধ নয় বরং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা	২৮৩
যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের সহযোগিতা	২৮৪
যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা	২৮৫
যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপশি মহিলাদের অংশগ্রহণ	২৮৫
নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও দাস-দাসীদের হত্যা সম্পৃক্ত বিধান	২৮৬
যুদ্ধে নিহত অমুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সম্পৃক্ত বিধান	২৮৬
জিহাদ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের উৎসাহিত করে না	২৮৬
গনীমতের সম্পদের মালিকানা সম্পৃক্ত বিধান	২৮৭
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে গনীমত প্রদান	২৮৭
আনসারদের মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি রাসুল (স)'র ভালোবাসা	২৮৮
তাবুক'র অভিযান	২৮৯
তাবুক অভিযানের প্রেক্ষাপট	২৮৯
তাবুক অভিযানের চিত্রায়ন	২৮৯
অভিযানে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ	২৯৩
তাবুক অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা	২৯৬
জিহাদে সম্পদের গুরুত্ব ও বিধান	২৯৭
মুনাফিকদের স্বভাব ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র	২৯৮
আহ্‌লে কিতাবদের জিযয়াহ (কর) প্রদান সম্পৃক্ত	২৯৯
অভিশপ্ত জাতি ও স্থানসমূহ এড়িয়ে চলা প্রসঙ্গে	২৯৯
শাস্তি প্রদানে মুমিন ও মুনাফিক এক সমান নয়	৩০০
ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করার বৈধতা সম্পৃক্ত	৩০০
ধর্মীয় কারণে সালামের উত্তর না দেওয়া সম্পৃক্ত	৩০১
প্রতিকূল অবস্থায় নিজের ওপর আস্থা রাখা	৩০১
সুসংবাদ শুনে সিজদাহ শুক্র আদায় করা	৩০১
চতুর্থ অধ্যায়	৩০৫
প্রতিনিধি বর্ষ	৩০৭
আবদ কায়স'র প্রতিনিধি	৩০৮
বনু সাআদ বিন বকর'র প্রতিনিধি দ্বিমাম বিন সা'লাবাহ	৩০৯
নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি	৩১০
আবু বকর (র) সিদ্দীক কে আমীরে হজ্ব হিসেবে প্রেরণ	৩১৩
আবু বকর সিদ্দীক (র)'র হজ্বের সাথে সম্পৃক্ত বিধিসমূহ	৩১৪
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিদায়ী হজ্ব	৩১৫
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হজ্বের বিবরণ	৩১৫
মহানবী (স)'র হজ্বের সংখ্যা ও হজ্ব ফরযের সময়	৩১৮

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মহানবী (স)'র হজ্বের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য	৩১৮
বিদায় হজ্বের ভাষণ	৩১৯
মহানবী (স)'র বিদায়ী হজ্বের ভাষণের তাৎপর্য	৩২১
উসামাহ বিন যায়দ (র) কে বালকা অভিযানে প্রেরণ	৩২৪
উসামাহ বিন যায়দ (র)'র অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা	৩২৪
মহানবী (স)'র অসুস্থতা	৩২৫
স্ত্রীদের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা	৩২৫
মৃত্যুমুখী মানুষের ইচ্ছাপূরণে সতর্ক থাকা	৩২৬
অধীনস্থদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান	৩২৬
বসা ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মুক্তাদীর নামায	৩২৭
রোগ বা কষ্টের কারণে গুনাহ মাফ হয়	৩২৭
কবরে সিজদাহ করার নিষেধাজ্ঞা	৩২৭
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যুযন্ত্রণা	৩২৮
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা	৩২৯
আল্লাহ'র রাসুল (স) গোসল	৩৩০
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাফন ও নামাযে জানাযাহ	৩৩১
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাফন	৩৩১
উপসংহার	৩৩২
তথ্যসহায়ক গ্রন্থাবলী	৩৩৪

ভূমিকা

সীরাতে রাসুল (স) সাধারণ ব্যক্তি, সমাজ সংস্কারক বা কোনো জাতীয় নেতার জীবনালেখ্য নয় যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে সঠিক চিত্রায়ন করা যাবে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশের সাথে অহীর সম্পৃক্ততা বিদ্যমান এবং তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ ব্যতীত কোনো অভিমত ব্যক্ত করতেন না বিধায় তাঁর জীবনালেখ্য রচনা অথবা অধ্যয়ন কুরআন করীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; যেমনটি মা আয়েশা সিদ্দীকা (র) হাসান (র) বিন আলী (র)'র প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: তোমরা কী কুরআন পড়ো না?{كان خلقه القرآن}[আল-কুরআনই তো তাঁর জীবনালেখ্য][1]। সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠক একদিকে যেমন ইসলামের সঠিক চিত্রের সন্ধান পাবে, অপর দিকে নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করার পাশাপাশি সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠক কিছুক্ষণের জন্য হলেও মদীনার অলি-গলি, জিহাদের ময়দান: বদর, উহুদ, মক্কাহ, হুনায়ন ও তাবুকসহ অসংখ্য স্থানে কাল্পনিক জগতে হলেও আল্লাহ'র রাসুল (স) সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে; কারণ পাঠক অবচেতন মনে নিজেকে পাঠ্যবিষয়ের নায়কের মতো ভাবতে থাকে।

আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকূলের শেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নিজ সমাজে তথা সমগ্র আরবাঞ্চলে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন বিধায় কুরাইশ তাদের মূল্যবান সবকিছু তাঁর কাছে আমানত রেখে যেমন মূল্যবান বস্তুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো; তেমনি নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁকেই সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে একমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতো। সুতরাং তাঁর নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে কা'বা নির্মাণের সময় সমগ্র আরবজাতির হৃদয়ে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ বস্তু "হাজরে আসওয়াদ" প্রতিস্থাপন নিয়ে অতি স্পর্শকাতর বিরোধপূর্ণ সমস্যার সমাধানে তাঁকেই সালিস মনোনীত করা হয়েছিল; কিন্তু নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পর ইসলামের মৌলিক বার্তা একত্ববাদ, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে যিনি চল্লিশ বছর ধরে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী, কখনো কবি, আবার কখনো যাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শেষ পর্যায়ে আল্লাহ'র মনোনীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়নি, একাধিকবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তা কখনো নিজের প্রাধান্য বিস্তার বা গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (স) ও আরবদের সম্পর্কে অপপ্রচার করে বলে থাকে যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স) অশিক্ষিত ও বর্বর

---

[1]) মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩।

আরবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন; যেই জাতির কোনো সভ্যতা ও আভিজাত্য নেই, নেই কোনো শিক্ষা ও সংস্কৃতি। প্রাধান্য বিস্তার কিংবা গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে অথবা বংশীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বদা যুদ্ধে মেতে থাকতো। শত্রু কিংবা বন্ধুর সাথে সামান্য বিষয়েও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দ্বিধা করতো না। শত্রুর অবর্তমানে নিজেরাই নিজেদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও ছিলেন যুদ্ধবাজ।

আল্লাহ'র রাসুল (স) সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। কারণ মহানবী (স)'র যুদ্ধাভিযান অধ্যয়ন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কখনো নিজে আগ বাড়িয়ে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সকল যুদ্ধই বলতে গেলে প্রতিরক্ষামূলক। অর্থাৎ যখন তিনি আক্রান্ত হয়েছেন অথবা কারো পক্ষ থেকে আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়েছেন কিংবা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া করে তাঁকে অবহিত করেছেন; তখনই তিনি আল্লাহ'র নির্দেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এমতাবস্থায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া প্রাচীন ও আধুনিক যুদ্ধনীতির আলোকে মোটেই পরিপন্থী নয়, বরং আত্মরক্ষা ও নিজ সম্প্রদায়ের জীবন এবং সম্পদের সুরক্ষা প্রদানে যুদ্ধ ঘোষণা অপরিহার্যও বটে। সুতরাং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধেও রয়েছে মানবজাতির জন্য এক অনুপম আদর্শ ও অপরসীম শিক্ষা।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি সর্বক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরের গভীরে তাঁকে ও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির প্রতি ভালোবাসার স্থান প্রদান করা কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে এমন অনেক আচরণ (কথা ও কর্ম) করে বসে যা কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সমর্থিত নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ও ভিত্তিহীন। উভয়দলের মনোভাব বিবেচনায় রেখে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সঠিক তথ্য-সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনচরিত'র চিত্রায়ন ও পর্যালোচনা করাই **"সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা"** শিরোনামে রচিত গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

সীরাতে রাসুল (স) সম্পৃক্ত গবেষণামূলক গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে বেশ কিছু বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে, যেমন: প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে আরবাঞ্চল ও আরবজাতিকে সর্বশেষ আসমানী ধর্মের আবির্ভাবের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের মনোনয়নরহস্য, আরবজাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থান, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী; জন্ম থেকে নুবুওয়্যতপ্রাপ্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছেঃ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অহীপ্রাপ্তি'র বর্ণনা, গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রদান, প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া, মক্কায় আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার চিত্রায়ন এবং পরিশেষে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরতের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

অনুরূপভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের পর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা ও এর নিরসনের লক্ষ্যে আল্লাহ'র নিদের্শে যুদ্ধের

প্রস্তুতি, যুদ্ধ পরিচালনা, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র যুদ্ধনীতি এবং যুদ্ধ সম্পৃক্ত বিভিন্ন শরয়ী বিধান ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।
সর্বশেষ চতুর্থ অধ্যায়ে মহানবী (স)'র নিকট আগমনকারী বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের বর্ণনা, আবু বকর (র) কে আমীরে হজ্জ হিসেবে প্রেরণ এবং বিদায়ী হজ্ব ও তাঁর ইন্তেকালের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে একটি উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে।

সীরাতে রাসুল (স) সম্পৃক্ত শতাধিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হলেও **"সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা"** শিরোনামে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং সীরাতুন্নবী (স)'র শিক্ষা পর্যালোচনা সম্পৃক্ত বাংলা ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হতে পারে এটি উক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ-রচনার প্রথম পদক্ষেপ। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য নয়; বরং সীরাতে রাসুল (স)'র আলোকে ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য উপস্থাপনে কুরআন করীম, হাদীসে রাসুল ও সীরাত গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে গ্রন্থখানি প্রাথমিক উৎসে রচিত হয়েছে বিধায় গ্রন্থ রচনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ করা হয়নি। তবে তথ্যনির্ভর ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সূত্রসমূহ প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণানীতির আলোকে যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে।

গ্রন্থে উদ্ধৃত পবিত্র কুরআনের আয়াতের আরবী টেক্স (মূল পাঠ){ }বন্ধনিতে এবং এর বাংলা অনুবাদ [] বন্ধনিতে স্থান পেয়েছে এবং কুরআনের আয়াতের সূরাহ'র নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে হাদীসের ক্ষেত্রেও আরবী টেক্স (মূল পাঠ){ }বন্ধনিতে এবং এর বাংলা অনুবাদ [] বন্ধনিতে স্থান পেয়েছে। হাদীসের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি সংকলিত গ্রন্থসমূহের হাদীসের ক্রমিক নাম্বারানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ক্ষেত্রে সংক্ষেপে (স), আলাইহিস সালাম'র এর ক্ষেত্রে সংক্ষেপে (আ), রদিয়াল্লাহু'র ক্ষেত্রে সংক্ষেপে (র) এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ক্ষেত্রে সংক্ষেপে (রা) ব্যবহারের পাশাপাশি বানানের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাচীন ইসলামী বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে বিধায় আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষার যে শব্দ (ِي) দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে এবং তার পূর্বে কাসরাহ বা "যের" রয়েছে সেগুলোতে "ী" ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে "ি" ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক ভুল; যদিও বাংলা একাডেমী "ি" ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। কুরআন করীমের ক্ষেত্রে এগুলো শুধুমাত্র ভুল নয়; বরং মারত্মক গুনাহও বটে কারণ এর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অর্থের বিকৃতি ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রন্থটি রচনায় সাধারণ গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সূত্রসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণানীতির আলোকে যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে।

মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগোচরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠক সমাজের কারো নজরে এলে লেখককে অবগত করা হলে কৃতজ্ঞ হবো এবং তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার প্রয়াস পাবো।

সীরাতে রাসুল (স) সম্পৃক্ত গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন প্রকাশের দায়িত্ব পালন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা ও সীরাতপ্রেমীদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র মাষ্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের চাহিদার কারণে কাজটি ত্বরান্বিত হয়েছে। যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"সীরাতে রাসুল (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা" শিরোনামের ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক গ্রন্থটি সীরাতে রাসুল (স)'র চিরন্তন ও নান্দনিক সৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাবিত বিষয়াদির মাধ্যমে মানবজাতির সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ তথা মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক রীতিনীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বিধি-বিধানের চিত্রায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সীরাত পাঠকের জ্ঞানভান্ডারে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আলোকিত জীবনের আদর্শে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

প্রসঙ্গকথা

সার্বিকভাবে সীরাতে রাসুল (স)'র অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার অর্থ শুধুমাত্র কিছু ঘটনাপ্রবাহের অধ্যয়ন ও বর্ণনা নয়। মহানবী (স) এর জীবনালেখ্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল হলেও চলবে না। সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে তা নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিত্রায়ন ও বাস্তবায়ন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নিজের জীবন পরিচালিত করা। যেমনটি মা আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) হাসান (রা) বিন আলী (রা)'র প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: তোমরা কী কুরআন পড়ো না? {كان خلقه القرآن}[১][আল-কুরআনই তো তাঁর জীবনচরিত। সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠক একদিকে যেমন ইসলামের বহুমাত্রিক সঠিক চিত্রের সন্ধান পাবে, অপর দিকে নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করবে। তাই সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নে বেশ কিছু বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন:

(ক) আল্লাহ'র রাসুল (স) এর ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব পর্যালোচনা করা, যে ব্যক্তিসত্ত্বার মাধ্যমে তিনি অহীপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সমাজে সবার নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তিসত্ত্বাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য অহীর মাধ্যমে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে প্রামাণ্য করে উপস্থাপন করেছেন।

(খ) মহানবী (স) এর জীবনচরিত অধ্যয়নে পাঠক তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় চরিত্রের উত্তম আদর্শের সন্ধান পাবে; যা মানবজীবনের দীর্ঘ চলার পথে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনার পাথেয় হিসাবে সারা জীবন ছায়ার মত থাকবে যেমনটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মানবতার উত্তম আদর্শ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষায়:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[নিশ্চয় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ][২]।

(গ) সীরাতে রাসুল (স) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে; কারণ আল-কুরআনের বহু অংশ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। সীরাতে রাসুল (স)'র অধ্যয়ন ব্যতীত যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা মোটেই সম্ভব নয়।

(ঘ) যথাযথ পর্যায়ে সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠক ইসলামের সঠিক জ্ঞান, আক্বীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করবে; যা ইসলামের আলোকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বির্নিমাণ, উত্তম চরিত্র ও সুন্দর জীবন গঠনে কার্যকারী ভূমিকা রাখবে।

(ঙ) সঠিকভাবে সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক, আলেমে দ্বীন বা দায়ী ও ইসলামের পথপ্রদর্শক প্রাণবন্ত একটি আদর্শের সন্ধান লাভ করবে; যা শিক্ষা-

---

[১]) মুসনাদ আহমদ [২৫৮১৩] ।

[২]) সূরাহ আল-আহযাব:২১।

প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক এবং উত্তম চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) এরশাদ করেছেন:{إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}[অবশ্যই আমি উত্তম চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণতাদানকারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি][১]। অপর এক হাদীসে আল্লাহ'র রাসুল (স) এরশাদ করেছেন:{إنما بعثت معلما}[অবশ্যই আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি][২]।

সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের প্রচার-প্রসার

কীভাবে মহানবী (স)'র সীরাত অধ্যয়নের প্রচার-প্রসার ঘটেছে তা সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের জন্য অতীব জরুরী। সীরাতে রাসুল (স)'র সাথে যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন জড়িত; অনুরূপভাবে ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনাবলীও সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই সীরাতে রাসুল (স)'র সাথে ইতিহাসের সংমিশ্রণের বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচনা করা প্রয়োজন।

সীরাতে রাসুল (স) ও ইতিহাস

সীরাতে রাসুল (স)'র সাথে ইতিহাসের সংমিশ্রণের বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। সর্বজন স্বীকৃত যে, সীরাতে রাসুল (স) ইতিহাসবিদ্যার নীতিরও মূল ভিত্তিপ্রস্তর তৈরী করেছে যা নিয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমজাতি ভাষা, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে গর্ববোধ করে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মুসলিম ইতিহাসবিদগণের রচিত গ্রন্থসমূহের মূল বিষয়বস্তু ছিল সীরাতে রাসুল (স)'র ঘটনাপ্রবাহ। অতঃপর তার সাথে সংযোজন করা হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংকলনসমূহ যা আজ ইতিহাসের আধুনিক যুগে ইসলামের ইতিহাস Islamic History বা মুসলিম ইতিহাস Muslim History হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমনকি প্রাগ-ইসলামী যুগের আরব উপ-দ্বীপের ইতিহাস রচনাও মুসলিম ইতিহাসবিদগণ আরব ও অনারবদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছেন (যেমন রাসুল (স)'র জন্মের সময়কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ) তাও সীরাতে রাসুল (স) কে কেন্দ্র করেই হয়েছে। তাই এক কথায় বলা যায় যে, আরব উপ-দ্বীপের ও ইসলামের ইতিহাস সংকলনের মূল তথ্য-উপাত্ত সীরাতে রাসুল (স) থেকেই সংগৃহীত। বরং আরো বলা যেতে পারে যে, আরব উপ-দ্বীপ ও সমগ্র মুসলিমবিশ্ব নিয়ে রচিত সমগ্র ইতিহাস সংকলনের মূল উপাত্ত Theme সীরাতে রাসুল (স)। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, মুসলিম ও আরবদের নিকট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্যসূত্র পরীক্ষণ একটি অতি সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি Scientific System হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

---

১) মুসনাদ আহমদ [৮৯৩৯], মুসনাদ বজ্জার [৮৯৪৯] ও ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবু আল-মুফরাদ [২৭৩] গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ'র বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২) সুনান ইবন মাজাহ [২২৯]। শায়খ আলবানীসহ অনেকেই হাদীসটিকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বললেও অর্থের দিক থেকে হাদীসটি প্রমাণিত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

সীরাতে রাসুল (স) রচনার ইতিকথা

সময়ের পরিক্রমায় সীরাতে রাসুল (স)'র রচনাকাল দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। প্রথমে রাসুল (স) এর হাদীস লিপিবদ্ধকরণ শুরু হয়। সর্বজন স্বীকৃত যে রাসুল (স) এর জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধকরণের কাজ শুরু হয়। এতে কোনো সমস্যা বা অপরাধ নেই। কারণ হাদীস লিপিবদ্ধকরণের কাজ রাসুল (স)'র অনুমতিক্রমে বা তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে শুরু হয়। অহী অবতরণের সূচনাকালে আসহাবে রাসুল (স) কুরআন লিপিবদ্ধের সাথে রাসুল (স) এর হাদীসও লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা থাকায় রাসুল (স) সাহাবীদের হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করলেও কিছু কিছু সাহাবী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুমতিক্রমে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন বলে যথাযথ প্রমাণ রয়েছে; যেমন রাসুল (স)'র প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস সম্পর্কে বলা যায়[১]। তিনি (বিশেষ কারণে) নিষিদ্ধকালীন সময়েও রাসুল (স)'র অনুমতিক্রমে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পরে যখন আসহাবে রাসুল (স) এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণের আশঙ্কা নিরসন হয় তখন রাসুল (স)'র হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তবে রাসুল (স)'র জীবনী রচনা ও তাঁর যুদ্ধাভিযানের লিপিবদ্ধকরণ বিলম্বে হলেও আসহাবে রাসুল (স) তা মৌখিকভাবে অতি গুরুত্বসহকারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরআন করীম ও সংরক্ষিত হাদীস নাবভী সীরাতে রাসুল (স)'র মৌলিক দলিল।

সীরাতে রাসুল (স) রচনার পথিকৃৎ

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, রাসুল (স)'র জীবনী রচনার প্রতি সর্বপ্রথম গুরুত্বারোপ করেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়াহ বিন যুবাইর (মৃ ৯২ হি) তারপর আব্বান বিন ওসমান (মৃ ১০৫ হি) তারপর ওহাব বিন মুনাব্বিহ (মৃ ১১০ হি) তারপর শুরাহবিল বিন সাআদ (মৃ ১২৩ হি) প্রমুখ। অতঃপর রাসুল (স)'র জীবনী রচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হাদীসবিদ ইবন শিহাব আয-যুহরী (মৃ ১২৪ হি)। তাঁদের সকলেই রাসুল (স)'র জীবনী রচনায় পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত ও সুপরিচিত এবং তাঁদের সীরাত বিষয়ক রচনাসমূহ সীরতে রাসুল (স) রচনার প্রাথামিক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে তাঁদের সীরাত বিষয়ক কোনো রচনা কোথাও সংরক্ষিত আছে মর্মে কোথাও কোনো প্রমাণ নেই। সব যুগের বিবর্তনে বিনষ্ট হয়ে গেছে; সামান্য কিছু সম্পর্কে যা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তাবারী তাঁর গন্থে উল্লেখ করেছেন, তাও গবেষকদের মতে সার্বিক বিবেচনায় সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর নয়। কথিত আছে যে, ওহাব বিন মুনাব্বিহ'র সীরাত বিষয়ক রচনার কিছু অংশ জার্মানীর জাতীয় গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে[২]।

তবে উপরিউক্ত বিশিষ্ট সীরাতবিদগণের পরে ইতিহাসবিদ তাবারীর মতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃ ১৫২ হি) রাসুল (স)'র জীবনী রচয়িতাদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন বলে

[১]) সহীহ বুখারী [১১৩]।

[২]) সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিক্হুস সিরাহ, দারুস সালাম, কায়রো,২১তম সংস্করণ-২০১০, পৃ-১৮।

সকল সীরাত গবেষকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন[১]। মুহাম্মদ বিন ইসহাক'র সীরাত বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আস-সিয়র ওয়া আল-মাগাযী" আমাদের নিকট সরাসরি পৌঁছেনি; তবে হাদীস গ্রন্থসমূহে জিহাদ, মাগাযী ও সিয়র এর অধ্যায় বিদ্যমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত বলে উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইব্ন খাল্লেকান বলেন যে, প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইব্ন হিশাম রচিত সীরাত গ্রন্থটি মূলত ইব্ন ইসহাকের সীরাতগ্রন্থ থেকে সংকলিত করে রচিত হয়েছে; যা পরবর্তীতে সাধারণ পাঠকের কাছে "সীরাতে ইব্ন হিশাম" নামে পরিচিতি লাভ করে[২]। তবে বাস্তবতা যাই হোক, সীরাতসাহিত্য রচনায় সীরাতবিদগণ তথ্যসূত্র হিসাবে যে সকল গ্রন্থাদির ওপর নির্ভর করেছেন তা নিম্নরূপ:

(ক) আল-কুরআন: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনী সংক্রান্ত সাধারণ ঘটনাবলী ও সংক্ষিপ্তাকারে সীরাতে রাসুল (স)'র জ্ঞান অর্জনের জন্য আল-কুরআন অপেক্ষা কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পৃথিবীতে নেই। আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে রাসুল (স)'র পরিচিতি ও কার্যক্রমের বর্ণনা স্থান পেয়েছে যা কুরআন এর মিশন ও দাওয়াতেরই অন্তর্ভূক্ত। তাই ইসলাম ও মুসিলিম বিদ্বেষীদের হাজারো অপচেষ্টা সত্ত্বেও কুরআন করীমের মতো সীরাতে রাসুল (র)'রও কোনো রকম বিকৃত অথবা কলুষিত করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না।

(খ) হাদীস সংকলনসমূহ: রাসুল (স)'র হাদীসের সংকলিত গ্রন্থসমূহ যা প্রসিদ্ধ হাদীসবিদগণ সংকলন বা সম্পাদনা করেছেন, যাঁরা সারা বিশ্বে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। যেমন কুতুব সিত্তাহ (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনান নাসাঈ ও সুনান ইব্ন মাজাহ) মুআত্তা ইমাম মালিক ও মুসনাদ ইমাম আহমদ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও বা উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের মূল উৎস রাসুল (স)'র বাণী বা কর্মকে কেন্দ্র করেই সংকলিত হয়েছে এবং তা ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে নয়; বরং সুন্নাহ ইসলামী শরীআহ'র প্রধান দ্বিতীয় উৎস হিসাবেই সর্বজন স্বীকৃত বিধায় উপরিউক্ত হাদীস গ্রন্থসমূহের কোনোটি ফিক্হ শাস্ত্রের গ্রন্থের ন্যায় অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে। আবার কোনোটি হাদীসের বর্ণনাকারী আসহাবে রাসুলের নামানুসারে বিন্যাস করা হয়েছে। যেখানে সময় পরম্পরার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়নি বলে সাধারণত প্রতীয়মান হয়।

(গ) রাসুল (স)'র সীরাত বা জীবনী বর্ণনাকারীদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। তাঁদের বেশীর ভাগই রাসুল (স)'র সাহাবীগণ। কারণ রাসুল (স)'র সাহাবীগণ জীবনে অন্তত একবারের জন্য হলেও রাসুল (স)'র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং প্রত্যেক সাহাবী রাসুল (স)'র জীবনের কোনো না কোনো অংশ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের নিকট অতি মর্যদাপূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং এর আলোকে বলা যায় যে, রাসুল (স)'র সাহাবীগণ সীরাতে রাসুলের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী হিসাবে পথিকৃৎ। রাসুল

---

[১]) বিস্তারিত দেখুন: ইব্ন ইসহাক এর জীবনীগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত "উয়ূনুল আছার" এর ভূমিকা, ইবন কাইউম রচিত যাদুল মাআদ ও মাওলানা আকরাম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত এর ভূমিকা।

[২]) ইব্ন খাল্লেকান, অফইয়াতুল আয়ান, মায়মুনিয়্যাহ সংস্করণ, ১৯৬৮ ইং, বৈরুত:১/২৯০।

(স)'র সীরাত বা জীবনী তাঁদের যুগে গ্রন্থাকারে সম্পাদিত হয়নি বিধায় পূর্বে তাবেয়ীগণকে সীরাতে রাসুলের পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সীরাতে রাসুল (স) বর্ণনায় গবেষণামূলক পদ্ধতি

সর্বজন স্বীকৃত যে, সীরাতসাহিত্য রচনা মূলতঃ ইতিহাসেরই অর্ন্তভূক্ত। যদিও পরে সীরাতসাহিত্য ইতিহাসবিদদের নিকট স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সীরাতবিদগণ কোন পদ্ধতিতে সীরাতসাহিত্য রচনা করেছেন তা উল্লেখ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তবে সীরাতবিদগণ তাঁদের সীরাত রচনার প্রাথমিক স্তরে হাদীসশাস্ত্র সংকলনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। পরে সেই প্রাচীন পদ্ধতিকে অক্ষুন্ন রেখে তার সাথে সংযোজিত হয় গবেষণামূলক রচনার আধুনিক পদ্ধতি। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দির পারম্ভে ইতিহাস রচনা ও সংকলনে প্রাচীন পদ্ধতির পাশাপাশি বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতির আর্বিভাব হলে [Scientific System] (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা গবেষণামূলক পদ্ধতি) তা সীরাতসাহিত্য রচনায়ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়। সুতরাং সেই থেকে আধুনিক গবেষণামূলক পদ্ধতির আলোকে সীরাতসাহিত্য রচনার বিকাশ ঘটে। আরবী ভাষার পাশাপাশি বিশ্বের সকল প্রচলিত ভাষায় অসংখ্য সীরাতসাহিত্য রচিত হয়েছে। তারমধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশীয় ভাষায়ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সীরাতসাহিত্য রচনা বিদ্যমান এবং আমাদের বাংলা ভাষায়ও শতাধিক সীরাতসাহিত্য রচিত হয়েছে।

সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের পদ্ধতি

আরব উপদ্বীপে যখন মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আর্বিভাব ঘটে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট নিজেকে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল ও পথ প্রদর্শক হিসাবে উপস্থাপন করলেন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে প্রেরণা ও উৎসাহের সাথে তাগাদা দিলেন সেই সত্যের বাস্তবরূপ প্রদান করার জন্য যার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলগণ। সমগ্র বিশ্ববাসীকে সেই দায়িত্ব পালন করার আহবান জানালেন; যেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ ও তাঁদের জাতিসমূহ। তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিলেন যে, তিনি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে প্রেরিত নবী-রাসুল পরম্পরার সর্বশেষ নবী। তিনি নিজের পরিচয় বর্ণনা দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বললেন মানবসন্তান ও মানবজাতির সকল গুনাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান; তবে আল্লাহ পাক তাঁর বার্তা সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছানোর জন্য অহীর মাধ্যমে তাঁকে মনোনীত করেছেন। তাঁর প্রতি অর্পিত অন্যতম দায়িত্ব হলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।

সুতরাং তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে অবগত করলেন এই বলে যে, আল্লাহ'র ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের কোথাও সংযোজন, বিয়োজন অথবা পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর নেই; যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর বার্তা প্রেরণ করেছেন সেভাবেই সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছানোই তাঁর একমাত্র দায়িত্ব। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। { تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ }[এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে

ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না][১]।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ (স) বিশ্ববাসীর নিকট নিজেকে নিছক কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কোনো জাতীয় লীডার হিসাবে উপস্থাপন করেননি। কিংবা কোনো সংগঠন বা গোষ্ঠির তাত্ত্বিক পথ পদর্শক বা সমাজ সংস্কারক হিসাবে করেননি; বরং তিনি অহীর মাধ্যমে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যা নির্দেশনা পেয়েছেন তা কোনো রকম সংযোজন, বিয়োজন অথবা পরিবর্তন করা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গন্থে আরো বর্ণনা করেছেন:{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না; বরং তা অহী যা প্রত্যাদেশ হয়][২]।

মহানবী মুহাম্মদ (স) বিশ্ববাসীর নিকট নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তার আলোকেই সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়ন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। তাই মহানবী মুহাম্মদ (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশ সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের আওতায় নিয়ে আসা অতীব জরুরী। যেমন মহানবী মুহাম্মদ (স)'র জন্ম ও দুগ্ধপান, লালন-পালন ও তাঁর স্বভাব-চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন-যাপন, তাঁর ধর্য্য ও সহনশীলতা, তাঁর ক্ষমাপরয়াণতা ও পরিমার্জনশীলতা, অন্যের সাথে তাঁর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রণকৌশল, সাথী-বন্ধু ও শত্রুদের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার, পৃথিবীর চাকচিক্য ও পার্থিব বিষয়াদির প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণসহ সকল ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কোনো রকম সংযোজন, বিয়োজন অথবা পরিবর্তন করা ব্যতীত সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেননা তিনি নিজের জন্য বা নিজের ইচ্ছায় কিছু করেননি। যা কিছু করেছেন আল্লাহ'র ইচ্ছায় বা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেছেন; সেই আলোকে আমরা যদি সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়ন করি তাহলে সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নে আমরা নিজেরাও লাভবান হবো এবং সঠিক পন্থায় সীরাতে রাসুল (স) অধ্যয়নের সুযোগ পাবো।

সুতরাং এক কথায় বলা যায়, মহানবী (স) এর জীবনচরিত মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উত্তম পাথেয় এবং উজ্জল ভবিষ্যৎ বির্নিমাণের মূল ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখবে। যিনি ছিলেন তাঁর স্বজাতি ও সাথী-বন্ধুদের নিকট পরম সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে প্রজ্ঞা ও সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহ প্রদত্ত পথে পরিচালিত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও পথপদর্শক।

---

[১]) সূরাহ আল-হাক্কাহ:৪৩-৪৭।

[২]) সূরাহ আন-নাজম: ২-৪।

প্রথম অধ্যায়

সর্বশেষ রিসালতের জন্য আরব অঞ্চল'র মনোনয়ন
পূর্ববর্তী দ্বীনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক
মুহাম্মদ (স)'র জন্ম ও শৈশব
হেরা গুহায় তাঁর একাকিত্ববাস ও অহীর আগমন

সর্বশেষ রিসালতের জন্য আরব অঞ্চলকে মনোনয়নের তাৎপর্য

মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আলোকিত জীবনের আলোচনার পূর্বে সর্বশেষ রিসালতের আবির্ভাব ও তার প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথিবীর সকল উর্বর অঞ্চলের পরিবর্তে মরুময় আরবাঞ্চলকে মনোনয়ন এবং সমকালীন গ্রীক, রোম ও পারস্যের মত উন্নত ও অগ্রসর জাতির পরিবর্তে অনগ্রসর আরবজাতিকে ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নির্বাচিত করার কী ঐশী রহস্য বা তাৎপর্য থাকতে পারে তার প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমেই উল্লেখ করা জরুরী যে, ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের পাশাপাশি আরবদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট এবং সেই যুগের অন্যান্য সুপরিচিত জাতি-গোষ্ঠী যেমন পারস্য, রোম, গ্রীক ও ভারতবাসীর সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার আলোকে দেখা যায় যে, সমকালীন বিশ্ব মূলত পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অধীনেই ছিল এবং এর পরে ছিল গ্রীক ও ভারতের অবস্থান।

পারস্য সাম্রাজ্য ও তার ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি

ইসলামের আবির্ভাবের সময় পারস্য মূলত ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের লীলাভূমি ছিল। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী যরাদস্তের অনুসারী ছিলেন এবং নিজের মা অথবা মেয়ে অথবা বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাদের কুরুচিপূর্ণ জীবনচর্চার সবচেয়ে সম্মানজনক বিষয় ছিল। তৎকালীন পারস্যসম্রাট ২য় ইয়াযদাগির্দ যিনি ৫ম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে পারেস্যের সম্রাট ছিলেন তিনি তার ঔরশজাত মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং পরে তাকে হত্যা করেন[১]। অন্যদিকে বিরাজমান ছিল আল-মাযদকিয়্যাহ'র ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুসারীবৃন্দ। তারাও ধর্মীয় কুসংস্কারে উপরিউক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী যরাদস্তের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না। ইতিহাসবিদ শাহ্‌রিস্তানী'র মতে তারাও নারীদেরকে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মালিকানার অংশ মনে করতেন[২]।

রোম সাম্রাজ্যের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আবির্ভাবের সময় রোম সম্রাজ্যে একদিকে উপনিবেশ চিন্তাধারা কাজ করতো, অন্যদিকে রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের ঝড় এবং সিরীয় ও মিশরীয় খৃষ্টানদের মাঝে নিষ্ফল মতানৈক্য ও মতবৈষম্যের বিরোধ পুরো খৃষ্টান সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ফেলে। তারা নিজেদের সামরিক শক্তি ও উপনিবেশিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করে খৃষ্টান ধর্মের কল্পনাপ্রসূত প্রচার-প্রসারে এক অদ্ভূত অন্তর্কলহে নিমজ্জিত ছিল। শুধু তাই নয় রোম সাম্রাজ্য অধঃপতনের দিক থেকে পারেস্যের মতই অবস্থানে ছিল এবং নিজেদের অন্তকলহের কারণে অস্বাভাবিক জীবন-যাপন, অর্থনৈতিক অধঃপতন ও নিপীড়নের শিকার ছিল।

---

[১]) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারাল, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮৬,পৃ: ৪৯/ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: A short History of the World, Vol.viii-p.84.

[২]) শাহ্‌রিস্তানী, আল-মিলল ও আল-নিহাল, মাকতাবা মিশর, ১৯৬৪, কায়রো: ২/৮৬-৮৭।

অতঃপর গ্রীক জাতি বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার ও যুক্তিবিদ্যার কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন নিষ্ফল বিতর্কে এতই জড়িত ছিল যে, যা গ্রীকের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ভারতের অবস্থাও ছিল বিশ্বখ্যাত ইসলামী গবেষক মাওলানা আবুল হাসন আলী নাদভী'র মতে খুবই করুণ। তিনি বলেন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে ভারতের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত ও অন্ধকারতম যুগ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় অপেক্ষা ভারতের অবস্থান কোনো প্রকার উন্নত ছিল না। তাছাড়া ভারতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অতি ব্যতিক্রমধর্মী। ঐগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো:

১) দেব-দেবীর সংখ্যাধিক্য।
২) যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা।
৩) জাতিভেদ ও শ্রেণী বৈষম্য যা ভারতকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল[১]।

কুসংস্কারে অধঃপতিত সহজ-সরল আরব যাযাবর

অতঃপর আরব উপদ্বীপের অবস্থা মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আবির্ভাবের সময় উপরিউল্লেখিত বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে ও প্রকৃতপক্ষে অনেক শান্ত ছিল। যদিও তাদের অঢেল প্রাচুর্য ছিল না। অধিকাংশ আরব ছিলেন মরুময় অঞ্চলের যাযাবর; যারা পারস্যবাসীর মত অগ্রসরতার স্পর্শ পায়নি কিংবা রোমানদের ন্যায় আভিজাত্যের স্বাদ গ্রহণ করেনি, যেমন তারা পায়নি গ্রীকদের মত দর্শনের সাক্ষাৎ। তবে তাদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা ও বিতর্ক ছিল না কিংবা রোমানদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল সামরিক শক্তি যা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ সৃষ্টির স্বপ্ন ছিল না। তারা অজ্ঞতা ও বিভিন্ন রকম কুসংস্কারে জর্জরিত এক আত্মসম্মানী ও পথভ্রষ্ট বীর জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের আত্মসম্মানবোধ এতই প্রকট ছিল যে, ভ্রান্তসম্মান ও কথিতসম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজেদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। যার বর্ণনা কুরআন করীমে বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। অনুরূপ ভৌগোলিকভাবে আরব উপদ্বীপের অবস্থান ছিল ঠিক ভূমন্ডলের মধ্যখানে যেমন স্বভাব-আচারেও মধ্যপন্থী। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও আরব বিশ্ব দুই সভ্যতার মাঝখানে বিদ্যমান; একদিকে পাশ্চত্যের বৈষয়িক সভ্যতা যা ইউরোপসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে বিরাজমান, অন্যদিকে প্রাচ্যের কল্পনাপ্রসূত আধ্যাত্মিক সভ্যতা যা সমগ্র ভারতবর্ষ, চীন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল[২]।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা যদি ইসলাম পূর্বের জাহেলী যুগের আরবজাতি ও সমকালীন জাতিসমূহের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করি তখন আমরা মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আবির্ভাব ও সমগ্রবিশ্বে ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অন্যান্য জাতির পরিবর্তে আরবজাতি বা আরবাঞ্চলকে নির্বাচিত করার ঐশীরহস্য বা তাৎপর্য

[১]) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারাল, প্রাগুক্ত,পৃ: ৫৬।

[২]) মুহাম্মদ আল-মুবারক, বাস্তবতার আলোকে আরবজাতি, দারুল কলম (মূল আরবী), বৈরুত, ১৯৭৬,পৃঃ ১৪৭।

সহজেই বুঝতে পারি। যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পারস্য, রোম, ভারতবর্ষ অথবা অন্য কোনো অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাবের ইচ্ছা পোষণ করতেন তাহলে ইসলামের প্রচার-প্রসার সহজতর ও সফল করার লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলে অবশ্যই আরববিশ্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন যা সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে সমগ্রবিশ্বে ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত জাতিকে মনোনীত করেননি। অনুরূপভাবে তাঁর রাসুল মনোনয়নের ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত ব্যক্তির পরিবর্তে এমন একজন স্বশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিকেই মনোনীত করেছেন যিনি কখনো কোনো কিতাব বা গ্রন্থ পড়েননি এবং নিজ হাতে লিখতেও অভ্যস্ত নন; যেন তাঁর আসমানী নুবুওয়্যত ও রিসালতপ্রাপ্তির ব্যাপারে কারো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী (স) কে সমকালীন অগ্রসর ও শিক্ষিত জাতি এবং পরিবেশের পরিবর্তে এমন এক অজ্ঞ ও যাযাবর জাতি এবং পরিবেশ থেকে মনোনীত করেছেন; যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো ইতিহাস নেই। যাতে করে কেউ এমন সন্দেহ পোষণ করতে না পারেন যে, নবী মুহাম্মদ (স) যে দ্বীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহবান করেছেন তা তাঁর জাতীয় বা বংশীয় দ্বীন ও সভ্যতারই অর্ন্তভূক্ত। যেমনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন:{ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}[তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের থেকে এমন একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা)। ইতিপূর্বে তারা অবশ্যই ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল][১]।

মহানবী (স) কে অধিকাংশ নিরক্ষর জাতির মধ্যে নিরক্ষর রাসুল হিসেবে প্রেরণ করা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই ইচ্ছারই বহিপ্রকাশ, যাতে করে নুবুওয়্যতের মু'জিযাহ ইসলামী শরীয়া'হর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে; এটি কোনো মানবীয় মতবাদ নয় বরং এটি ঐশী মতবাদ যার আর্বিভাব ঘটেছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

ইসলামের আবির্ভাবের জন্য আরবাঞ্চলকে মনোনীত করার সম্ভাব্য আরো কিছু কারণ বা রহস্য থাকতে পারে যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই ভালো জানেন। তবে ইতিহাসবিদগণ ও গবেষকগণ নিম্নের কারণগুলো উল্লেখ করেছেন:

ক) সর্বজন জ্ঞাত যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বায়তুল্লাহকে সমগ্র মানবজাতির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং মানবজাতির ইবাদত ও ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে প্রথম অবকাঠামো হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এটি সেই অঞ্চল যেখানে নবীগণের পিতা খ্যাত ইবরাহীম (আ)'র দাওয়াত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নবী ইবরাহীম (আ)'র দাওয়াতের পরিপূর্ণতা প্রদান করার লক্ষ্যে ইসলামী

[১]) সূরাহ আল-জুমুআহ:২।

দাওয়াতের আবির্ভাবের জন্য আরবাঞ্চলকে মনোনীত করা হয়েছে। কারণ ঐশী দাওয়াতের সর্বশেষ রাসুল ও আহ্বায়ক তিনি তো ইবরাহীম (আ)'রই বংশধর।

খ) ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আরবাঞ্চল সর্বশেষ ঐশী দাওয়াতের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান; কারণ উক্ত অঞ্চল তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যখানে অবস্থিত যেখান থেকে সমগ্রবিশ্বে ইসলামের আলো অতি সহজে প্রচার-প্রসার লাভ করবে। যেমনটি আমরা পরবর্তী সময়ে দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রাথামিক যুগ থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অতি সহজে আরবাঞ্চলের চর্তুপার্শে ইসলামের বিস্তার তথা প্রচার-প্রসার ঘটে।

গ) আরবাঞ্চলের ভাষাগত বৈশিষ্টের কারণেও এ অঞ্চল নির্বাচিত হতে পারে। আরবী ভাষার সাথে অন্যান্য ভাষাসমূহের তুলনা করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টসমূহের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আরবী ভাষাই খুব সহজে ও অতি অল্প সময়ে আয়ত্ব করা যায়; অন্য কোনো ভাষা নয়, যা দাওয়াতী কাজের জন্য প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচ্য। তাই আরবীই একমাত্র ভাষা যা আল্লাহ পাকের ঐশী বাণী প্রকাশের ভার বহন করতে পারে। সর্বশেষ ঐশী দাওয়াতের ভাষা হিসেবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবী ভাষাকেই মনোনীত করেছেন।

পূর্ববর্তী দাওয়াতসমূহের সাথে ইসলামের সম্পর্ক

মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে কোনো নবী বা রাসুলের আগমন ঘটবে না। এই বিষয়ে বিশ্বের সমগ্র মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে বিশ্বাস অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। মহানবী (স) বলেছেন:{ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ ، إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاس يَطُوفُونَ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ }[আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের উদাহরণ যেমন কোনো ব্যক্তি একটি ভবন নির্মাণ করলো। অতঃপর অতি উত্তমরূপে একে সাজালো ও পরিপূর্ণ করলো শুধুমাত্র কোনো এক কর্ণারে একটি ইট পরিমাণ স্থানে অপরিপূণতা ছাড়া। অতঃপর মানুষ এর চর্তুপার্শ্বে ঘুরে ফিরে দেখে এবং এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বলে: কেন এই ইটটি দিয়ে ভবনটি পরিপূর্ণ করা হলো না? আর আমি সেই ইট এবং আমি সর্বশেষ নবী][১]। অতঃপর নবী (স)'র দাওয়াত ও পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের দাওয়াত একই সূত্রে গাঁথা যা উপরিউক্ত হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়। কারণ দুটি মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিটি নবী-রাসুল দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম আক্বীদাহ ও বিশ্বাস দ্বিতীয় শরীয়াহ বা বিধান ও আদর্শ।

১ম-আক্বীদাহ বা বিশ্বাস

আক্বীদার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নবী আদিপিতা আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত কোনো ভিন্নতা নেই। নবী-রাসুলগণ সকলেই আক্বীদার ক্ষেত্রে একই বিষয়ে স্ব স্ব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তা হলো আল্লাহ'র একত্ববাদে বিশ্বাস ও তাঁর সাথে সমাচিন নয় এমন সবকিছু থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা দেয়া। পরকালে বিশ্বাস ও জবাবদিহী এবং জবাবদিহীর আলোকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের প্রতিদানে বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রত্যেক নবী-রাসুল স্ব স্ব জাতিকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁদের প্রত্যেকই পূর্ববর্তী দাওয়াতের সত্যায়িত করেছেন এবং পরবর্তী নবী-রাসুলের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন জাতি-গোত্র ও জনপদে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন। সকলেই একটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতিকে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন তা হলো; দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহ'র এ বিষয়ে কারো অংশিদারিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন:{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }[তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না][২]।

১) সহীহ বুখারী [৩৫৩৫] ও মুসলিম [২২৮৬]। শব্দমালা সহীহ মুসলিম শরীফের।

২) সূরাহ আশ-শুরা:১৩।

বরং আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে নবী-রাসুলগণের দাওয়াতের ভিন্নতা অকল্পনীয়; কারণ আক্বীদাহ'র বিষয়টি অনেকটা সংবাদ প্রদানের মতো এবং কোনো একটি বিষয়ে একেক জন একেক রকম সংবাদ প্রদান করলে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হওয়ার নয়। যেমন আল্লাহ সম্পর্কে কোনো এক নবী সংবাদ দিলেন যে, তিনি তিনজনের তৃতীয় জন (আল্লাহ তাদের মিথ্যাচার থেকে অনেক প্রবিত্র) তারপর তাঁর পরবর্তী নবী সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ এক ও তাঁর কোনো অংশিদার নেই। একটি বিষয়ে দুজনের সংবাদ প্রদান ভিন্ন হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং একটি সত্য এবং অপরটি অবশ্যই মিথ্যাচার।

২য়-শরীয়াহ বা বিধান

শরীয়াহ বা বিধান হলো মানবজাতির ইবাদত-বন্দেগীর বিধানাবলীসহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থারই প্রতিশব্দ যা যুগের বা স্থানের পরিবর্তনে অবশ্যই পরিবর্তনশীল এবং তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বিভিন্ন নবী-রাসুলগণের শরীয়াহ বা বিধান স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন হতে পারে এবং তাতে দোষের কিছু নেই। এটি মানবজাতির সামনে আবির্ভূত জীবন ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণ মানবজাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে আক্বীদাহ'র বিষয়টি আবির্ভূত কোনো জীবন ব্যবস্থা নয় যা মানবজাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে; বরং আক্বীদাহ'র বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা যা কোনো ক্ষেত্রে কোনোভাবে পরিবর্তন হতে পারে না এবং সর্বদা এক ও অভিন্ন থাকাই অপরিহার্য।

যেমন মুসা (আ) ইহুদী জাতির নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে মুসা (আ)'র যুগের শরীয়াহ বা বিধান ইহুদী জাতির জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রবর্তিত যা কিছুটা কঠিন ছিল। সেখানে রুখসতের (ছাড়) কোনো বিষয় ছিল না; বরং সম্পূর্ণ আযীমতের (আবশ্যক) ওপর ভিত্তিশীল। অতঃপর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সেই জাতির প্রতি ঈসা (আ) প্রেরিত হলেন এবং তিনি তুলনামূলকভাবে মুসা (আ) অপেক্ষা সহজ শরীয়াহ বা বিধান নিয়ে আগমন করলেন। যেমন ইহুদীজাতিকে সম্মোধন করে ঈসা (আ)'র মুখে আল্লাহ পাকের বাণী এরশাদ হচ্ছে: { وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ }[আমি প্রেরিত হয়েছি আমার সামনে তাওরাতের বিধানসমূহকে সত্যায়িত করার জন্য এবং কিছু বিষয় তোমাদের জন্য বৈধ করার জন্য যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল][১]। অতঃপর এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাদেরকে আক্বীদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বর্ণনা করেন এবং তাওরাতে আলোচিত বিধানসমূহকে দৃঢ়তার সাথে সত্যায়িত করেন; হালাল-হারাম এর বিধানসমূহে কিছুটা সংজোযন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে সহজ বিধানে রূপান্তারিত করেন যাতে করে তাওরাতে আলোচিত কঠিন বিধানসমূহের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রত্যেক রাসুলকে আক্বীদাহ ও বিধানসহ প্রেরণ করা হয়েছে। আক্বীদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দৃঢ়তার সাথে সত্যায়িত করা নবাগত রাসুলের দায়িত্ব; যাতে কোনো রকম পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। তবে

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:৫০।

বিধানসমূহের ক্ষেত্রে পরবর্তী বিধানে যা সমর্থন করা হয়েছে অথবা নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে তা ব্যতীত পূর্ববর্তী সকল বিধানসমূহ রহিত করা হয়ে থাকে।

এতে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বা ধর্ম অপরিবর্তিত; তবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহ আল্লাহ'র নির্দেশেই অবশ্যই পরিবর্তনশীল। সুতরাং সত্য ধর্ম অভিন্ন, সকল নবী-রাসুলগণ যুগে যুগে সেই অভিন্ন দ্বীনের দাওয়াত নিয়েই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং মানবজাতিকে সেই দ্বীন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছেন। অবশ্যই সেই দ্বীন "ইসলাম" ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন বা ধর্ম নয়।

যেমনটি আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও ইয়াকুব (আ) এই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, এরশাদ হচ্ছে: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[ইবরাহীমের দ্বীন থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সেই ব্যক্তি যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত। স্মরণ করো, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: অনুগত হও। সে বলল: আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। এরই অছিয়ত (নির্দেশ) করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও এই মর্মে যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না][১]।

কুরআন করীমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা (আ) বনী ইসরাঈলদের প্রতি এই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফেরাউনের যাদুর ঘটনা বর্ণনায় এরশাদ হচ্ছে: {قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ }[তারা বললো, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পালনকর্তার নিকট ফিরে যেতেই হবে। বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নির্দশনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করো][২]।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ) এই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, এরশাদ হচ্ছে: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[অতঃপর ঈসা যখন বনী ইসরাঈলের কুফ্‌রী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন: কারা আছে আল্লাহ'র পথে আমাকে সাহায্য করবে? একান্ত সঙ্গী-সাথীরা বললো: আমরা রয়েছি আল্লাহ'র পথে

১) সূরাহ আল-বক্‌রা:১৩০-১৩২।

২) সূরাহ আল-আ'রাফ:১২৫-১২৬।

সাহায্যকারী। অমরা আল্লাহ'র ওপর ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম][১]।

সঙ্গত কারণেই এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সকল নবী-রাসুল যদি একই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়ে থাকেন তবে কেন ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসীদের মতো নয় এবং খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসীদের চেয়ে ভিন্ন? এই প্রশ্নের উত্তরে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে যে:{ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ}[নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবসতঃ][২]।

কুরআন করীমে অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে:{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ}[তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন; যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা পারস্পারিক বিভেদের কারণে মতবিরোধ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকতো, তবে তাদের ফায়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে][৩]।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রতিটি নবী-রাসুল ইসলামের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন যা আল্লাহ'র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন, এবং এ বিষয়ে সকল আল্লাহ'র কিতাবপ্রাপ্ত ধর্মাবলম্বীরা অবগত, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ইসলামের আর্বিভাবের সময় আরবাঞ্চলের ধর্মীয় বিশ্বাস

মুহাম্মদ (স) বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা অঞ্চলের নবী হিসেবে প্রেরিত হননি যেমন মহানবীর পূর্বে একই সময়ে একাধিক নবী বা রাসুল অঞ্চল ভিত্তিক বা গোষ্ঠী ভিত্তিক প্রেরিত হয়েছিলেন; যা কুরআন করীমের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ) একই সময় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে শুয়াইব (আ) ও মুসা (আ) একই সময় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নুবুওয়্যতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু মহনবী মুহাম্মদ (স) সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:৫২।

[২]) সূরাহ আলে ইমরান:১৯।

[৩]) সূরাহ আস-শুরা:১৩-১৪।

এককভাবে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। যেই অঞ্চলে তিনি বাল্যকাল, শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকালসহ নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে জীবনের চল্লিশ রছর অতিবাহিত করেছেন সেই অঞ্চলের জনগণ সাধারণত ইবরাহীম (আ)'র পুত্র ইসমাঈল (আ)'র বংশধর। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে ইবরাহীম (আ)'র দ্বীনের (মিল্লাতে ইবরাহীম) অনুসারী ছিলেন এবং তাই কুরআন করীমে আরবদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে:{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ...}[তোমরা আল্লাহ'র পথে যথাযথ পরিশ্রম ও সংগ্রাম করো! তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে অটল থাকো। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বে (আসমানী গ্রন্থসমূহে) এবং এই কুরআনেও, যেন রাসুল (স) তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সমগ্র মানবজাতির জন্যে সাক্ষ্যদাতা হতে পারো...][১] অনুরূপভাবে আল-কুরআনে আরো এরশাদ হচ্ছে:{قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন; সুতরাং সকলেই ইবরাহীমের দ্বীনের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্মের অনুসারী এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না][২]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরবজাতি ইবরাহীম (আ)'র অনুসারী ছিলেন। শুধু তাই নয় কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে আরবদের সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে যে, তাঁরা আল্লাহকেই স্রষ্টা হিসেবে জানতেন ও বিশ্বাস করতেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}[যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও যমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ][৩] এবং তাঁদের মধ্যে অসংখ্য মানবিক গুনাবলী বিদ্যমান ছিল। যেহেতু তাঁরা ইবরাহীম (আ)'র অনুসারী ছিলেন এবং তাদের নিকট ইবরাহীম (আ)'র সঠিক তথ্য উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কুরআন করীমে ইবরাহীম (আ)'র আলোচনায় সর্বক্ষেত্রে এই বাক্যটি{وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না] উল্লেখ করা হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও আরবজাতি কিভাবে মুশরিক জাতিতে রূপান্তরিত হলো তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কয়েকটি কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক) শেষনবী মুহাম্মদ (স)'র পূর্বে সকল নবী-রাসূল বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত হলেও আরবাঞ্চলে ইবরাহীম (আ)'র পুত্র ইসমাঈল (আ)'র পর কোনো নবী-রাসুল প্রেরিত হননি।

খ) আরবদের নিকট ইবরাহীম (আ)'র কিতাব বা সহীফাসমূহ বিদ্যমান ছিল না।

গ) আরবদের অধিকাংশ নিরক্ষর ছিলেন। অজ্ঞতা ও সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেখাদেখি তারাও শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হাদীসে বর্ণীত

---

১) সূরাহ আল-হজ্ব:৭৮।

২) সূরাহ আলে ইমরান:৯৫।

৩) সূরাহ আয-যুমর:৩৮।

হয়েছে যে, খুযাআহ গোত্রের পূর্বপুরুষ আমর বিন লুহাই বায়তুল্লাহ'র নেতৃত্ব লাভের পর সর্ব প্রথম আরবদের মধ্যে শির্ক'র প্রবেশ ঘটিয়ে তাদেরকে মুর্তি পূজার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাক প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরাইরাহ (র)'র বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (স) আকসাম বিন জউন খুযায়ী (র) কে বেলছেন: "হে আকসাম আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে হেঁছড়ে নিয়ে চলতে দেখেছি। আমি তোমাকে ছাড়া কোনো মানুষকে দেখতে তার মতো দেখেনি। অতঃপর আকসাম (র) রাসুল (স)কে জিজ্ঞাসা করলেন: তার মতো হওয়াটা কী আমাকে ক্ষতি করবে? রাসুল (স) বললেন: না। কারণ তুমি মুমিন সে কাফির। সে প্রথম ব্যক্তি যে নবী ইসমাঈল (আ)'র ধর্মকে পরিবর্তন করেছে। অতঃপর মুর্তি স্থাপন করেছে এবং বহীরাহ, সায়িবাহ, ওসীলাহ ও হাম'র মতো কুসংস্কার ইসমাঈলের ধর্মে প্রবেশ ঘটিয়েছে"[১]।

আমর বিন লুহাই আরবাঞ্চলে কীভাবে মুর্তি পূজার গোড়াপত্তন করেছে প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন হিশাম তার বর্ণনা দেন যে, "আমর বিন লুহাই এক সময় মক্কাহ থেকে সিরিয়া সফরে বের হয়ে বালকা অঞ্চলের মাআব স্থানে পৌঁছালে তখনকার যুগে সেখানে অবস্থানরত আমালিকাদের (আমালিকারা নূহপুত্র সামের বংশধর) মুর্তি পূজা করতে দেখে তাদেরকে মুর্তিগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে বলে যে, এই মুর্তিগুলোর নিকট আমরা বৃষ্টির প্রার্থনা করি। অতঃপর এগুলো আমাদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। আমরা এগুলোর নিকট বিজয় প্রার্থনা করি। অতঃপর আমাদের বিজয় প্রদান করে তাই আমরা মুর্তিগুলোর পূজা করি। তখন আমর বিন লুহাই তাদেরকে বলে যে, তোমরা কী একটি মুর্তি দেবে না? আমি আরবদেশে নিয়ে যাব এবং তারা এর পুজা করবে। অতঃপর তারা তাকে একটি মুর্তি উপহার দেয় যাকে তারা "হুবল" নামে ডাকত। অতঃপর আমর বিন লুহাই মুর্তিটি মক্কায় নিয়ে এসে যথাস্থানে স্থাপন করে মক্কাবাসীকে তার পূজা করতে ও তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ প্রদান করে"[২]।

এভাবেই আরব তথা মক্কাহ অঞ্চলে মুর্তি পূজার গোড়াপত্তন হয়। ধীরে ধীরে সমগ্র আরবাঞ্চলে মুর্তি পূজার প্রচার-প্রসার ঘটে এবং আরবজাতি ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)'র ধর্মের একত্ববাদী বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে পৌত্তলিক জাতি হিসেবে পরিচিত হয়। তা সত্ত্বেও আরবাঞ্চলে বিশেষভাবে মক্কাহ নগরীতে স্বল্প সংখক লোক ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)'র ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তাওহীদের ওপর অটল ছিলেন। যাঁদেরকে কখনো পৌত্তলিকতা স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরা পরকাল ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নির্দেশ পালনকারীদের পুরুস্কৃত করবেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তি প্রদান করবেন। তাঁদেরকে কখনো পৌত্তলিকতা স্পর্শ করতে পারেনি বরং তাঁরা আরবদের সৃষ্ট পৌত্তলিকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট আরব দার্শনিক ও বক্তা কুস

---

১) সহীহ বুখারী [৩৫২০] ও সহীহ মুসলিম [২৮৫৬]। বিস্তারিত দেখুন: সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১/৭৬।

২) সীরাত ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৭৭। বিস্তারিত দেখুন: ইব্‌ন কালবী রচিত "কিতাবু আসনাম" প্রাগুক্ত, পৃ:৮-৯।

বিন সাআদাহ, বুহাইরা রাহিব ও মহানবী (স)'র পিতামহ আব্দুল মোত্তালিব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[১]।

অন্ধকার যুগের অবশিষ্ট একনিষ্ঠতা

মক্কাহ অঞ্চলে ইসমাঈল (আ) থেকে মহানবী মুহাম্মদ (স)'র রাসুল হিসেবে আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নবী-রাসুল প্রেরিত না হওয়ায় এবং পথপ্রদর্শক বিহীন সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে আরবাঞ্চলে ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন আসলেও ইবরাহীম (আ)'র যুগের কিছু সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সমগ্র আরবাঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। যদিও সেগুলো যুগের বিবর্তনে অনেকটা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছিল। যেমন: বায়তুল্লাহ'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এর তাওয়াফ করা, হজ্ব ও ওমরাহ করা এবং হজ্ব মওসুমে আরাফাহ'র অবস্থান ও সাফা-মারওয়াহ'র সায়ী করা, দূর-দূরান্ত থেকে হজ্ব করতে আসা হাজীদের আপ্যায়ন ইত্যাদি যা সম্পূর্ণ ইবরাহীম (আ)'র দ্বীনের অংশ এবং আরবদের মধ্যে সেগুলো ইবরাহীম (আ)'র উত্তরাধিকার সূত্রে বিরাজমান ছিল। তবে কুরাইশ ব্যতীত অন্যরা হারামের বাইরে আরাফায় যাওয়া পরিত্যাগ করেছিল।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আরব ইতিহাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ইবরাহীম (আ)'র দ্বীন ও তাঁর একনিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে বিধায় আরবদের জীবন-যাপন তাওহীদ, হেদায়ত ও ঈমানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অতঃপর তারা ধীরে ধীরে যুগের বিবর্তনে সেই সত্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর যখন মুহাম্মদ (স) তাঁদের মাঝে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়ে সততা ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাওহীদ ও ঈমানের আলোকে সেই একনিষ্ঠ দ্বীনের প্রতি আহবান জানালেন যা তারা যুগের বিবর্তনে অনেকটা পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছিল তার আলো আবারো তাঁদের মাঝে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে এবং সেই আলোতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়ে যায়।

[১]) সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সিরাহ,দারুস সালাম, কায়রো, ২১তম সংস্করণ-২০১০, পৃ-৩৮।

মুহাম্মদ (স)'র জন্ম থেকে রিসালাত পর্যন্ত

বংশ পরম্পরা

মহানবী (স)'র বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ: মুহাম্মদ (স)'র পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিব (তাঁকে শায়বাহ আল-হামদ নামেও ডাকা হতো) তাঁর পিতা হাশিম তাঁর পিতা আবদ মনাফ (প্রকৃত নাম মুগীরাহ) তাঁর পিতা কুসাই (প্রকৃত নাম যায়েদ) তাঁর পিতা কিলাব তাঁর পিতা মুররাহ তাঁর পিতা কাআব তাঁর পিতা লুআই তাঁর পিতা গালিব তাঁর পিতা ফিহ্‌র তাঁর পিতা মালিক তাঁর পিতা আল-নাদ্বর তাঁর পিতা কিনানাহ তাঁর পিতা খুযাইমাহ তাঁর পিতা মুদরিকাহ তাঁর পিতা ইলিয়াস তাঁর পিতা মুদ্বার তাঁর পিতা নিযার তাঁর পিতা মাআদ তাঁর পিতা আদনান।

মায়ের পক্ষ থেকে মহানবী (স)'র বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ: মুহাম্মদ (স)'র মাতা আমিনা তাঁর পিতা ওয়াহাব তাঁর পিতা আবদ মনাফ তাঁর পিতা যুহরাহ তাঁর পিতা হাকীম তাঁর পিতা মুররাহ। তাঁর পূর্বপুরুষ মুররাহ'র পরে মহানবী (স)'র পিতা-মাতার বংশ এক হয়ে যায়।

মহানবী (স)'র উপরিউক্ত বংশ পরম্পরা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত তাতে কারো দ্বিমত নেই। এর ওপরে আদি পিতা আদম (আ) পর্যন্ত মহানবী (স)'র যে বংশ পরম্পরা ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান তাতে বেশ কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে বিধায় এর আলোচনা করা হলো না। তবে মহানবী (স)'র পূর্বপুরুষ আদনান যে ইবরাহীম (আ)'র পুত্র ইসমাঈল (আ)'র বংশধর তাতেও কারো দ্বিমত নেই; যাঁদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট জাতি ও উত্তম বংশরূপে নির্বাচন করেছেন এবং যেই বংশকে অন্ধকার যুগের ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রেখেছেন।

মহানবী (স) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন:{ إن اللّٰهُ اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم }[মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসমাঈলের বংশ থেকে কিনানাহ গোত্রকে নির্বাচন করেছেন, কিনানাহ'র বংশ থেকে কুরাইশ গোত্রকে নির্বাচন করেছেন, কুরাইশ গোত্র থেকে হাশেম গোত্রকে নির্বাচন করেছেন এবং হাশেমের বংশ থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন][১]।

জন্ম

মহানবী মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ৯ রবিউল আউয়াল এবং প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। যেই বছর তৎকালীন ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কাহ দখল ও পবিত্র কাবা শরীফ ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করেছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। কুরআন করীমের সূরা আল-ফীলে যার বর্ণনা এসেছে এবং ইতিহাসে তা আম্মু আল-ফীল (হাতীযুদ্ধের বছর) হিসেবে খ্যাত। মাতৃগর্ভে দুই মাসকালীন সময়ে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ

---

১) সহীহ মুসলিম [২২৭৬]।

মারা যান[১]। অতঃপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তবে তাঁর জন্মদিবস নিয়ে কোনো মতোবিরোধ না থাকলেও মাস ও তারিখ নিয়ে ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রশিদ্ধ সাহাবী আবু কাতাদাহ আনসারী (র) থেকে বর্ণিত যে, সোমবারের সিয়াম পালন সম্পর্কে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমি ঐদিন জন্মগ্রহণ করেছি[২]। আল্লামা ইব্ন আবদুল বার বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সোমবারে জন্মগ্রহণের বিষয়ে কারো মতবিরোধ নেই[৩]। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন: ইতিহাসবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন[৪]। ইমাম নাভভী বলেন: মুহাদ্দিসীনগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন[৫]। আল্লামা ইব্ন কসীর বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) সোমবারে জন্মগ্রহণ এমন একটি বিষয় যেখানে কারো মতবিরোধ নেই[৬]।

তবে আল্লাহ'র রাসুল (স) এর সোমবারে জন্মগ্রহণ নিয়ে কোনো মতবিরোধ না থাকলেও মাস ও তারিখ নিয়ে ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদগণের মধ্যে বেশ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) এর জন্মমাস নিয়ে একাধিক বর্ণনা এসেছে:

ক) অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদদের মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর, আল্লামা কান্নানী ও আল্লামা যুরহুনী এই অভিমতকে বিশুদ্ধ বর্ণনা বলে মন্তব্য করেছেন[৭]।

খ) কিছু ইতিহাসবীদ ও সীরাতবিদদের মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) রমাদ্বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এই অভিমত সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন কাসীর বলেন: আল্লামা ইব্ন আবদুল বার যুবাইর বিন বাক্কার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন: কুরআন করীমের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) পবিত্র

[১]) সহীহ মুসলিম [১৭৭১]।

[২]) সহীহ মুসলিম [১১৬২] জামে তিরমিযী [৭৪৭] সুনান আবু দাউদ [২৪২৬]। শায়খ আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

[৩]) আল্লামা ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল বার,আত-তামহীদ, মুআসসাতু আল-ফুরকান লি আত-তুরাস আল-ইসলামী, লেবানন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ হিজরী/১৯৭৬ ইং: ৩/২৬।

[৪]) আল্লামা অবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালে আল-মুসতাফা, মুআসসাতু আস-সাদিয়্যাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ২০১৫ ইং:১/৪৯।

[৫]) ইমাম নাভভী, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ:১৫/১০০।

[৬]) আল্লামা ইবন কসীর,আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ,দারু আল-ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংসকরণ, ১৩৯৭ হিজরী:১/১৯৭।

[৭]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখা যেতে পারে; আল্লামা ইবন কসীর, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:১/১৯৭, আল্লামা ইজ্জুদ্দীন ইব্ন বদরুদ্দীন আল-কান্নানী, আল-মুখতাসারু আল-কাবীর ফী সীরাতে আর-রাসুল, দারু আল-বাশীর, আম্মান, জর্ডান, ১৯৯৩ ইং, পৃ:২২, আল্লামা মুহাম্মদ ফুযাইল যুরহুনী, আল-ফাজরু আস-সাতিয় আলা আস্-সহীহ আল-জামেয়, মাকতাবাতু আর্-রুশ্দ, বৈরুত, লেবানন, ২০০৯:৩/১১।

রমাদ্বান মাসে অহীপ্রাপ্ত হন এবং বিশুদ্ধ হাদীস মতে তিনি চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর অহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কারো মতবিরোধ নেই; সুতরাং তাঁর জন্ম রমাদ্বান মাসে হওয়াই অধিক যৌক্তিক। অন্য মতানুসারে আল্লাহ'র রাসুল (স) এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে হলে চল্লিশ বছর থেকে ৬ মাস কম অথবা চল্লিশ বছর ৬ মাস পর অহীপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে ধরে নিতে হবে যা বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী[১]।

গ) আল্লামা কান্নানী'র দ্বিতীয় বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আখির মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর তৃতীয় বর্ণনা মতে সফর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন[২]।

তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদদের মতানুসারে আল্লাহ'র রাসুল (স) এর জন্মমাস রবিউল আউয়াল ধরে নিলেও জন্মতারিখ নিয়ে সর্বাধিক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদদের বিভিন্ন অভিমত উপস্থাপন করা হলো :

১) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার এই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ইতিহাসবিদ আল-ওয়াকিদী আবী মাশর নুজাইহ বিন আবদুর রাহমান মাদানী থেকে এই অভিমত বর্ণনা করেন[৩]।

২) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা কান্নানী দুর্বল শব্দ দ্বারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন[৪]।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা হুমাইদী ইব্‌ন হায্‌ম থেকে এই অভিমত বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক, আকীল, ইউনুস বিন ইয়াযীদসহ একাধিক মুহাদ্দিস ইমাম যুহরী থেকে মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতঈম এর বরাতে উক্ত অভিমত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার ইতিহাসবীদদের বরাতে উক্ত অভিমত বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেন। আল্লামা খাওয়ারযিমী এই অভিমতকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেন এবং হাফিয আবুল খাত্তাব বিন দিহয়া তার রচিত “আত্-তানভীর ফী মাওলিদি আল-বাশীর ওয় আন্-নাযীর” গ্রন্থে এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন[৫]।

৪) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অভিমতের পক্ষে অধিকাংশ সহীহ হাদীসের সমর্থন রয়েছে। শায়খ উসাইমীন এই অভিমতকে অধিক সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন এবং শায়খ সফিউর রাহমান মুবারকপুরী রচিত “আর-রাহীকু আল-মাখতুম” সীরাত গ্রন্থে এই অভিমত গুরুত্বসহকারে স্থান

---

[১]) আল্লামা ইব্‌ন কসীর, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:১/১৯৮।

[২]) আল্লামা আল-কান্নানী, আল-মুখতাসারু আল-কাবীর ফী সীরাতে আর-রাসুল, প্রাগুক্ত, পৃ:২৫।

[৩]) ইব্‌ন আবদুল বার, আত-তামহীদ, প্রাগুক্ত:৩/২৯।

[৪]) আল্লামা আল-কান্নানী, আল-মুখতাসারু আল-কাবীর ফী সীরাতে আর-রাসুল, প্রাগুক্ত, পৃ:২৭।

[৫]) হাফিয আবুল খাত্তাব, আত-তানভীর ফী মাওলিদি আল-বাশীর ওয় আন-নাযীর, দারু আল-ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংসকরণ, ১৩৯৭ হিজরী, পৃ:১৯৭।

পেয়েছে[১]। প্রখ্যাত সীরাতবিরদ ড. সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী ও প্রখ্যাত সীরাত গ্রন্থাকার ড. আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী এই অভিমতকে নির্ভুল বলে মন্তব্য করেন[২]।

৫) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অভিমতের পক্ষে ইবন দিহয়া তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে এই অভিমতকে অধিক সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবন আসাকির আবী জাফর আল-বাকির থেকে এবং মুজালিদ ইমাম শাআবী থেকে এই অভিমত বর্ণনা করেছেন[৩]।

৬) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অভিমতের পক্ষে প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইবন ইসহাক তাঁর "আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ" গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি এই অভিমতের পক্ষে আল্লামা ইবন আবী শায়বাহ তাঁর "মুসান্নাফ" গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবির বিন আবদুল্লাহ এবং ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: তাঁরা দুজনই বলেছেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ঐ তারিখ নুবুওয়্যতপ্রাপ্ত হয়েছেন, ঐ তারিখ তাঁর মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, ঐ তারিখ মাদীনায় হিজরত করেছেন এবং ঐ তারিখ মৃত্যুবরণ করেছেন। এই হাদীসের মধ্যে শুধুমাত্র জন্মতারিখের সাথে সম্পৃক্ত অংশে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদগণের ঐকমত্য রয়েছে[৪]।

৭) আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অভিমতের পক্ষে আবু রাফেয় ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাযম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবন কাসীর বলেন: ইমাম হুমাইদী এটি বর্ণনা করেছেন[৫]।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদগণের অভিমত থাকলেও আল্লাহ'র রাসল (স) এর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ হওয়ার বিষয়টি অধিক বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। আধুনিক ইসলামিক স্কলারগণ সূক্ষ্মভাবে হিসেব করে বের করেছেন যে, রবিউল আউয়াল মাসের ৮, ৯, ১০ ও ১২ তারিখসমূহের মধ্যেই অধিকাংশ মতামত পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ তারিখসমূহের মধ্যে ৯ তারিখ ব্যতীত অন্য কোনো তারিখে সোমবার পড়ে না এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) এর সোমবারে জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

---

[১]) শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ উসাইমীন, মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু ইবন উসাইমীন, দারু আল-ওয়াতন, রিয়াদ, সৌদি আরব, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী:৭/২৮১ এবং সফীউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকু আল-মাখতুম, মুআসসসাতু আর-রিসালাহ, লেবানন, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ ইং, পৃ:৩৫।

[২]) আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন্-নাবভিয়্যাহ আরদ ওয়াকায়ে ওয়া তাহলীল আহদাস, মুআসসাসাতু আর-রিসালাহ, লেবানন, ২০০৯ ইং/১৪৩০ হিজরী, পৃ:৪৫।

[৩]) হাফিয ইবন দিহয়া, ইলামু আল-ওয়ারা বিআলামি আল-হুদা,দারু আল-ফিক্র, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংসকরণ, ১৩৯৭ হিজরী, পৃ: ৯৭।

[৪]) ইবন ইসহাক,আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ,দারু আল-ফিকর, বৈরুত, লেবানন,৪য় সংসকরণ, ১৩৯৪ হিজরী :১/১৯৯।

[৫]) আল্লামা ইবন কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:১/২০৩।

এ বিষয়ে মিশরের স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাসের আলোকে আল্লাহ'র রাসুল (স) এর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন:

১) সহীহ হাদীসে বর্ণীত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) এর শিশুপুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল।

২) হিজরী ৮ম সালের জিলহজ্ব মাসে ইবরাহীমের জন্ম হয় এবং ১৬ বা ১৭ মাস বয়সে দশম হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

৩) সূক্ষ্মভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৭ নভেম্বর তারিখে ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ঘটেছিল।

৪) এই তারিখ ধরে হিসেব করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ১২ এপ্রিল তারিখে রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ শুরু হয়েছিল।

৫) জন্মদিনের তারিখ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে বটে, তবে এই মতবিরোধ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যেই অধিকাংশ বিশুদ্ধ মতামত সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে ৯ তারিখ ব্যতীত অন্য কোনো তারিখে সোমবার নেই।

সুতরাং উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে নিশ্চিভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে আল্লাহ'র রাসুল (স) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাতে কারো দ্বিমত নেই। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কী তাঁর জন্মদিনের খুশীতে আনন্দ-উল্লাস করবো না কি তাঁর মৃত্যুবরণের শোকযাপন করবো এবং তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ তাঁর জন্মদিনে কী আমল করেছিলেন তা বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দুধমাগণ

আল্লহ'র রাসুল (স) একাধিক মহীয়সী নারীর দুধ পান করেছেন। তাঁর মায়ের পর সর্বপ্রথম তাঁকে দুধ পান করান তাঁর চাচা আবু লাহাবের মুক্তদাসী সুওয়াইবাহ[১], যাঁকে আবু লাহাব মুক্ত করেছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন আরবরীতি অনুসারে মক্কানগরীর বাইরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা হয়। বনী সাআদ গোত্রের হালীমা বিন্‌তে আবী যুআইব দুগ্ধপানের দায়িত্ব পেয়ে ধন্য হয়েছেন[২]।

সীরাতবিদগণের ঐকমত্যের বর্ণনায় স্বীকৃত যে, বনু সাআদ অঞ্চল তখন অনাবৃষ্টির কারণে শুষ্কতার মুখোমুখি হয় এবং ক্ষেত-খামার অনুর্বর ও নিষ্ফলার রূপধারণ করে। অতঃপর বৃক্ষহীনতার কারণে দুগ্ধপ্রাণীর স্তনে দুধ শুকিয়ে যায়। যখনই শিশু নবী মুহাম্মদ (স) হালীমার কোলে স্থান নিলেন তখন থেকে বনু সাআদ অঞ্চলে ফিরে আসলো

১) সহীহ বুখারী [৫১০১ ও ৫৩৭২] ও সহীহ মুসলিম [১৪৪৯]।

২) সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত: পৃ-৪৪।

শ্যামলতা, হালীমার চারপাশের পশুচারণভূমি সবুজ তৃণলতায় ভরে উঠলো এবং তাঁর মেষপাল পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধভরা স্তনে ঘরে ফিরতে শুরু করে[১]।

শিশু নবী মুহাম্মদ (স) বনু সাআদ অঞ্চলে অবস্থানকালে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ঘটে। আনাস (র)'র বর্ণনায় ঘটনাটি নিম্নরূপ:{ عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرجه، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه- مرضعته- ينادون: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ممتقع اللون} [আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, শিশু নবী মুহাম্মদ (স) বনী সাআদ অঞ্চলে শিশুদের সাথে খেলা করেছিলেন। জিবরীলে আমীন (আ) তাঁর কাছে আসলেন, তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয় বের করলেন। অতঃপর হৃদয় থেকে একটি রক্তপিন্ড বের করে বললেন: এটি শয়তানের অংশ, তারপর স্বর্ণের পাত্রে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই ঘটনা দেখে শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে বলল যে, মুহাম্মদকে (স) হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা (হালীমার পরিবার) দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বিবর্ণ অবস্থায় পেয়েছিলেন। আনাস (র) বলেন: আমি তাঁর বক্ষে সেই সেলাই'র চিহ্ন দেখেছি][২]।

তারপর তাঁকে মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি পাঁচ বছর পূর্ণ করেন। যখন শিশু মুহাম্মদ (স) ছয় বছরে পৌঁছেন তখন তাঁর মমতাময়ী মা আমীনা পরপারে পাড়ি দেন। অতঃপর শিশু মুহাম্মদ (স)'র লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ওপর ন্যাস্ত হয় এবং যখন শিশু মুহাম্মদ (স) আট বছরে পৌঁছেন তখন তাঁর দাদা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্দুল মুত্তালিব মারা যান। অতঃপর শিশু মুহাম্মদ (স)'র চাচা আবু তালিব তাঁর তত্ত্বধায়করূপে আবির্ভূত হন এবং তিনি আমৃত্যু ভাতিজা মুহাম্মদ (স)'র তত্ত্বধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। অনেক প্রতিকূল সময়েও তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা শৈতিল্য প্রদর্শন করেননি[৩]। উপরিউক্ত আলোচিত সীরাতে নাবভী থেকে বেশ কিছু উপদেশ ও শিক্ষা সহজেই প্রতীয়মান হয়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) মহানবী (স)'র বংশ পরম্পরা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানবজাতির ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন এবং কুরাইশ গোত্রকে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ওপরে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন; যা ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয় এবং এই বিষয়ে আরো প্রচুর বিশুদ্ধ হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে যা ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে তিরমিযী শরীফে বর্ণনা করেছেন: "মহানবী (স) মিম্বরে দাড়ালেন অতঃপর বললেন: আমি কে? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তরে বললেন: আপনি আল্লাহ'র রাসুল, আপনার

---

১) আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৪৬-৪৭। সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিক্হুস সিরাহ, প্রাগুক্ত: পৃ-৪৪।

২) সহীহ মুসলিম [২৩৬]।

৩) সহীহ বুখারী [৩৮৮৩] ও সহীহ মুসলিম [২০৯]।

ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর মহানবী (স) বললেন: আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ'র পুত্র মুহাম্মদ (স)। মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে দুভাগ করলেন। অতঃপর আমাকে সর্বোত্তমভাগে নির্ণয় করলেন,তারপর তাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোত্র হিসেবে নির্ণয় করেন। অতঃপর আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে নির্ধারণ করেন, তারপর তাদেরকে বংশ-পরিবার হিসেবে নির্নয় করেন। অতঃপর আমাকে সর্বোত্তম বংশে নির্ধারণ করে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে নির্ধারণ করেন[১]। সুতরাং মহানবী (স)'র প্রতি ভালোবাসা কুরাইশ বংশ তথা সমগ্র আরবজাতির প্রতি ভালোবাসার দাবি রাখে।

খ) যেহেতু মহানবী (স) আরবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কুরাইশবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দাদা কুরাইশদের নেতা ছিলেন। আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানো ও আপ্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; যা আরবদের নিকট অতি সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর পারিবারিক নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটালেন। ইসলামের শত্রুরা যেন সেই সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে সেই কারণেই হয়তো মহান রাব্বুল আলামীন মহানবী (স)কে অনাথ হিসেবে লালন-পালন করার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তিনি মা-বাবার স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত পরিবার থেকে অনেক দূরে বনী সাআদ গোত্রে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। দাদার মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির দশ বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন; অথচ তাঁর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন তাতে তাঁর চাচা ও অনেক দিনের তত্ত্বাবধায়ক আবু তালিবের প্রেরণা বা অবদান কোনটাই ছিল না। এটি কোনো পারিবারিক নেতৃত্ব ও বংশমর্যাদা সম্পৃক্ত বিষয় নয়। সম্ভবত নুবুওয়্যতের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও পৃথিবীর পদমর্যাদা এবং নুবুওয়্যতের দায়িত্বের পার্থক্য সৃষ্টির জন্য মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মহানবী (স) কে অনাথ হিসেবে লালন-পালন করার ব্যবস্থা করেন।

গ) সীরাতবিদগণের ঐকমত্যের বর্ণনায় স্বীকৃত যে, শিশু নবী মুহাম্মদ (স) হালীমার কোলে স্থান নেয়ার পর বনী সাআদ প্রান্তরে সুষ্কতা, অনুর্বরতা ও নিস্ফলা থাকার পর শ্যামলতা, সবুজ তৃণলতায় ভরে উঠে এবং তাঁর মেষপাল পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধভরা স্তনে ঘরে ফেরে, যা প্রমাণ করে যে, এই শিশু অন্য শিশুদের ন্যায় সাধারণ কোনো শিশু নয়। মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট এই শিশুর পদমর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি যা হালীমা সাদিয়া মহানবীকে (স) কোলে নেয়ার পর থেকেই উপলব্ধি করতে লাগলেন। অনুর্বর, সুষ্ক ও নিস্ফলাভূমি শ্যামলতা ও উর্বরভূমিতে পরিণত হওয়াসহ পৃথিবীর সকল পরিবর্তন আল্লাহ'র নির্দেশেই হয়ে থাকে বলে মুসলিমদের আক্বীদাহ ও বিশ্বাস। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাধারণত উপলক্ষ ছাড়া কোনো কিছু করেন না এবং এখানে মহানবী (স) একমাত্র উপলক্ষ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনাবৃষ্টির কারণে শস্যক্ষেতের

[১]) জামে তিরমিযী [৩৬০৭] ও বায্যার [১৩১৬]। শায়খ আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ক্ষতি সাধিত হলে জীবিত মহৎ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বৃষ্টি-বর্ষণের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা ফিরিয়ে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করা ইসলাম সমর্থিত[১]।

ঘ) মহানবী মুহাম্মদ (স) বনী সাআদ প্রান্তরে অবস্থানকালে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা নুবুওয়্যতের বিশেষ প্রমাণ্য দলিল হিসেবে ধারণা করা হয় যা হাদীস-গ্রন্থকারগণ বিশুদ্ধরূপে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণিত যে, বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই ঘটনার প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য বা মাহাত্ম্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। তবে উপরিউক্ত ঘটনাটি ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীস[২] থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মহানবী মুহাম্মদ (স) মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণের কারণে সাধারণত মানবিক দুর্বলতা থেকেও মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুলকে বক্ষ বিদীর্ণের মাধ্যমে পবিত্র করে নিলেন যেন রিসালতের দায়িত্ব পালনে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো ক্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে। পাশাপাশি এই অলৌকিক ঘটনাও পরবর্তী সময়ে তাঁর নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির প্রমাণ্য দালিল হিসেবে জনগণ বিশ্বাস করে[৩]।

সিরিয়া ভ্রমনে আবু তালিবের সফরসঙ্গী

মহানবী (স) বারো বছর বয়সে তাঁর চাচা ও অভিভাবক আবু তালিবের বণিক দলের সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়া ভ্রমন করেন এবং মহানবী (স) চাচার সফরসঙ্গী হন। বণিক দল বুসরা নামক স্থানে অবস্থানকালে স্থানীয় গীর্জার খৃষ্টান পাদ্রীর (বুহাইরা) সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি ছিলেন ইঞ্জীলের অভিজ্ঞ ও খৃষ্টধর্মের জ্ঞানী। তিনি মহানবী (স) কে দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন; কারণ তিনি ইঞ্জীলের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে অবগত ছিলেন বিধায় মহানবী (স)'র সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে আবু তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, এই বালকের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? আবু তালিব বললেন: আমার পুত্র (আবু তালিব মহানবী (স) কে স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে পুত্র হিসেবে সম্মোধন করতেন)। অতঃপর বুহাইরা পাদ্রী বললেন: সে আপনার পুত্র নয় এবং এই বালকের পিতা জীবিত থাকার কথা নয়। তখন আবু তালিব বললেন সে আমার ভাতিজা। বুহাইরা পাদ্রী বললেন: তাঁর পিতার কী হলো? আবু তালিব বললেন: যখন এই বালক তাঁর মায়ের গর্ভে তখন তিনি মারা যান। বুহাইরা পাদ্রী বললেন: সত্য বলছেন। আপনি তাঁকে নিয়ে আপনার দেশে ফিরে যান এবং তাঁর ব্যাপারে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ'র নামে শপথ করে বলছি তারা যদি তাঁকে এখানে দেখতে পায় অবশ্যই তারা তাঁর ক্ষতি সাধন করবে। কারণ আপনার এই ভাতিজার বিশাল মর্যাদা হবে। অতঃপর আবু তালিব তাঁকে নিয়ে দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দিলেন[৪]।

---

[১]) সৎ ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আরোগ্য কামনা ও বৃষ্টিবর্ষণের প্রার্থনা করা অধিকাংশ ইমামগণের মতে উক্ত হাদীসের আলোকে স্বীকৃত। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ২/৩৩৯, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত:২/৭, সুবুলুস সালাম, প্রাগুক্ত:২/১৩৪ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ।

[২]) সহীহ মুসলিম [২৩৬]।

[৩]) সাঈদ রমাদ্বান বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত: পৃ-৪৭।

[৪]) ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে নেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/১৮০, তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/২৮৬, ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে এবং আবু নুআইম হিলয়াতে

উল্লেখ্য বুহাইরা পাদ্রীর ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসটি সকল সীরাত লেখকগণ বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণনায় ভিন্নতা প্রতীয়মান হলেও অর্থ অভিন্ন এবং ইমাম তিরমিযী বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আশআরী'র বরাতে দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লেখিত মহানবী (স)'র আগমন, তাঁর শারিরিক গঠন ও চারিত্রিক আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়) ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিল। শুধু তাই নয় ইহুদীরা মহানবী (স)'র আগমনের পূর্বে মদীনার আদিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে রাসুল (স)'র মাধ্যমে পরাজিত করার ভয় দেখাত এবং তারা বলত যে, খুব শীঘ্রই শেষ নবীর আগমন ঘটবে, আমরা তাঁর অনুসারী হবো এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে আদ-সমুদ জাতির মতো হত্যা করবো। অতঃপর মহানবী (স)'র আগমনের পর যখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো তখন কুরআন করীমে তাদের প্রতারণার কথা অবতীর্ণ করা হলো:{ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ}[যখন তাদের কাছে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে কাফিরদেরকে পরাজিত করার ভয় দেখাত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছলো যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসলো। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ'র অভিশাপ][১]।

অনুরূপভাবে ইমাম কুরতুবীসহ বিভিন্ন মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেন, যখন কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত{ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে][২] অবতীর্ণ হলো উমর (র) আবদুল্লাহ বিন সালামকে (র) [ইহুদীদের প্রসিদ্ধ আলিম পরে ইসলাম গ্রহণ করেন] জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কী মহানবী (স) কে আপনার সন্তানের মতো চিনতেন? উত্তরে তিনি বলেন হ্যাঁ, এর চেয়েও বেশী চিনতাম। অতঃপর উমর (র) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: তা কীভাবে? তিনি উত্তরে বললেন: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাওরাত-ইঞ্জীলসহ অধিকাংশ আসমানী গ্রন্থে তাঁর গুণাবলীসহ বর্ণনা এসেছে এবং আল্লাহ'র আসমানী গ্রন্থসমূহ ও নবী-রাসুলগণের সংবাদ প্রদান অসত্য হতে পারে না বিধায় আমি তাঁকে সত্যনবী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারি। তবে আমার সন্তান

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনায় হাদীসবিদগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। প্রখ্যাত সীরাহ বিশ্লেষক মুহাম্মদ আল-গাযালী'র মতে এই ঘটনার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ শায়খ আল-বানী বলেন: মুহাম্মদ আল-গাযালীর ফিক্হুস সীরাহ'র বর্ণনা বিশুদ্ধ হিসেবে অধিকাংশ হাদীসবিদগণের মতে স্বীকৃত। অর্থাৎ বুহাইরা পাদ্রীর সাথে সংঘটিত ঘটনার মৌলিক ভিত্তি নেই। কারণ এই ঘটনা যদি সত্য হতো তাহলে তাঁর নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির দাবির প্রেক্ষিতে কুরাইশদের মাঝে বিষয়টি স্থান পেত। অথচ ইতিহাসের কোথাও এর উল্লেখ নেই। মুহাম্মদ আল-গাযালীর ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:৬৫-৬৬।

[১]) সূরাহ আল-বাকারাহ: ৮৯।

[২]) সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৪৬।

সম্পর্কে তা পারি না; কারণ শুধুমাত্র একজন মহিলার (স্ত্রী) সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করেই আমি আমার সন্তানের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমি জানি না সেই মহিলা কোথায় কী ঘটিয়েছে?[১] আবদুল্লাহ বিন সালাম (র)'র বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করে তার গর্ভের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে যৌক্তিক কারণে কোনো সমস্যা হয় না; অথচ অসংখ্য নবী-রাসুলগণের সাক্ষ্য গ্রহণে যারা সন্দিহান তারা কখনো অদৃশ্যে বিশ্বাসী হতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সালমান ফার্সী (র)'র ইসলাম গ্রহণও ইঞ্জীল, পাদ্রি ও আহলে কিতাবের উলামা'র কাছে প্রাপ্ত মহানবীর আগমনের সংবাদ ও গুনাবলী শুনার কারণেই ঘটেছে।

অতঃপর মহানবী (স) যৌবনে পদার্পন করে মেষ চরানোর মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণের প্রচেষ্টা করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে , আপনি কী মেষ চরানোর দায়িত্ব পালন করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন: প্রত্যেক নবী মেষ চরিয়েছেন[২]। মহানবী (স) নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দেন যে, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম[৩]। বাজে খেলা-ধূলা তথা বিভিন্ন রকমের দুষ্টুমিসহ যুবসমাজের যাবতীয় বদভ্যাস থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে সংরক্ষিত রাখেন এবং মহানবী (স) আরো বর্ণনা দেন যে, যুব সমাজ অন্ধকার যুগে সাধারণত যা নিয়ে মেতে থাকতো তা আমার অন্তরকে রিসালাত প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্মানিত হওয়ার পূর্বেও কখনো নাড়া দেয়নি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: যে বালক আমার সাথে মক্কার উপকণ্ঠে মেষ চরাতো একরাত্রে তাকে আমি বললাম যে, তুমি যদি আমার মেষপাল দেখা-শুনা করতে তাহলে আমি মক্কাহ প্রবেশ করে যুবকদের মতো রাত্রে গল্প শুনতাম; সুতরাং সে বললো ঠিক আছে। অতঃপর আমি বের হয়ে মক্কার প্রথম বাড়ীর সীমানায় পৌঁছালে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলাম কী হচ্ছে? তারা বললো: বিয়ে অনুষ্ঠান। তারপর আমি বাদ্যযন্ত্র শুনার জন্য বসে পড়লাম। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার কান বন্ধ করে রাখলেন এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সূর্যের তাপে আমার ঘুম ভাঙলো। অতঃপর আমি আমার রাখাল সাথীর কাছে ফিরে আসলাম, সে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিগত রাতের ঘটনা জানালাম। তারপর তাকে আরো এক রাতে ঐরাতের মতো বলে মক্কাহ প্রবেশ করলে পূর্বের ঘটনার পূনরাবৃতি ঘটে। এরপর থেকে আমি আর কখনো ঐরকম চেষ্টা করেনি[৪]।

মেষ চরানোর মাধ্যমে মহানবীর জীবিকা অন্বেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে অবশ্যই সুরুচি ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধি সহকারে সৃষ্টি করেছেন বিধায় তাঁর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে পিতার অভাব পরিলক্ষিত না হলেও তিনি নিজের জীবিকা অর্জনে সক্ষম এবং তাঁর রুচিবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত করেছিলেন। পাশাপাশি কারো করুণা বা দয়ার পরিবর্তে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং দায়িত্ব

[১]) আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী, আসবাবু আন-নুযুল, সম্পদনা ও পর্যালোচনা: কামাল বাসুয়ুনী যাগলুল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,১৯৯১, পৃ:৪৭।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৪০৬] ও সহীহ মুসলিম [২০৫০]।

[৩]) সহীহ বুখারী [২২৬২] ও সুনান ইবন মাজাহ [২১৪৯]।

[৪])সহীহ ইবন হিব্বান [৬২৭২] ও সুনান বায়হাকী [১৩৬৩] গ্রন্থদ্বয়ে আলী (র) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

পালেনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা যা ভবিষ্যতে রিসালতের গুরু দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

খদীজাহহ (র)'র ব্যবসায় আত্মনিয়োগ ও বিবাহবন্ধন

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসীর ও প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে খদীজাহহ অভিজাত বংশের ধনী রমণী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় নিজ ব্যবসায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুরুষদের নিয়োগ করতেন। তাঁর কাছে মুহাম্মদ (স)'র সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের সংবাদ পৌঁছানোর পর তিনি মুহাম্মদ (স)'র নিকট ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের প্রস্তাব পাঠান এবং এই কাজে পূর্বে নিয়োজিত লোকদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান তাঁকে প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা দেন। তদুপরি তার দাস মায়সারাহকেও সেবা যত্নের জন্য সাথে দেয়া হবে বলে জানান। মুহাম্মদ (স) তার প্রস্তাব গ্রহণ করে মায়সারাহসহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ভ্রমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সফরে অন্যান্য সফর অপেক্ষা অধিকতর সফলতা অর্জন হওয়ায় ব্যবসায়ী খদীজাহহ (র) খুবই খুশী হন এবং তার দাস মায়সারাহর মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)'র সততা, একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের পরিচয় পান। পাশাপাশি সফরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাঁর মধ্যে অসাধারণ কিছু বিদ্যমান প্রতীয়মান হওয়ায় তার বান্ধবী নাফিসাহ বিন্‌তে মনিয়্যাহ'র মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)'র নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি সম্মতি প্রদান করে তাঁর চাচাদের সাথে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর মুহাম্মদ (স)'র চাচাগণ খদীজাহহ'র চাচা আমর বিন আসাদের নিকট তাঁদের ভাতিজার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং উভয় পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় মুহাম্মদ (স) পঁচিশ বছরের যুবক এবং খদীজাহ চল্লিশ বছরের বিধবা ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি উতাইক বিন আযীয আল-তামিমী এবং আবু হালাহ আল-তামিমী ওরফে হিন্দ বিন যুরারাহ'র সাথে বৈবাহিক সূত্রে সংসার করে বৈধব্য জীবন-যাপন করেছিলেন[১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঁচিশ বছরের যুবকের বিবাহিত দুইজন স্বামীর সংসারকৃত বিধবা স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমাদের সমাজে দৃষ্টিকটু প্রতীয়মান হলেও সাধারণত আরব সমাজে তা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গৃহীত। তাছাড়া খদীজাহহ (র) বিধবা হলেও তাঁর বংশমর্যদা ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে অভিজাত কুরাইশদের একাধিক যুবক তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেও তিনি সম্মত হননি। অতঃপর মুহাম্মদ (স)'র সততা, একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্র এবং বিভিন্ন অলৌকিক গুনাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাঁর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

অন্যদিকে মা খদীজাহহ (র) কে মহানবী (স) পৃথিবীর চার শ্রেষ্ঠ রমণীদের অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করেছেন[২]। মা আয়েশাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: খদীজাহহ (র) ব্যতীত মহানবী (স)'র স্ত্রীদের কারো প্রতি আমি কখনো ঈর্শান্বিত হইনি। আমি তাঁকে পাইনি,

[১]) হাফিয ইব্‌ন হাজর আসকালানী ঘটনাটি তাঁর বিখ্যাত "আল-ইসাবাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাকও ঘটনাটি বর্ণনা করেছে।

[২]) জামে তিরমিযী [৩৮৭৮], সহীহ ইবন হিব্বান [৭০০৩] ও মুসনাদ আহমদ [১২৪১৪]।

আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সংসারে আসার পূর্বেই তিনি গত হয়েছেন; কিন্তু মহানবী (স) খদিজাহ (র)'র প্রশংসা ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না। কোনো একদিন তিনি খদীজাহহ (র)'র স্মরণ করলে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। অতঃপর আমি বললাম: তিনি তো বুড়ীই ছিলেন। পরিবর্তে আল্লাহ আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম প্রদান করেছেন। অতঃপর মহানবী (স) রাগান্বীত হয়ে বলেন: আল্লাহ'র শপথ তাঁর চেয়ে উত্তম আল্লাহ আমাকে প্রদান করেননি; সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করলো, সে আমাকে সত্যায়িত করলো যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিলো, সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে সাহায্য করলো যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করলো এবং আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভেই সন্তান দান করলেন আমার অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভে নয়[১]।

মহানবী (স)'র খদীজাহহ (র)'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিছক কোনো ঘটনা নয়। এর পিছনে রয়েছে আল্লাহ'র অনেক বড় হিকমাহ বা তাৎপর্য। সাধারণত এই বিয়ে থেকে সহজেই অনুমেয় যে, জৈবিক চাহিদা বা যৌন স্পৃহার প্রতি মহানবী (স)'র বিশেষ গুরুত্ব প্রদান না করা সহজেই অনুমেয়। যদি তাঁর নিকট অন্য দশ যুবকের মতো জৈবিক চাহিদা বা যৌন স্পৃহার আকর্ষণ ও গুরুত্ব প্রাধান্য পেত অবশ্যই তিনি তাঁর চেয়ে কম বয়সী অথবা ন্যূনতম নিজের চেয়ে বেশী বয়সী নারীকে বিয়ে করতেন না। সুতরাং উক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স)'র কাছে খদীজাহহ (র) আকর্ষণীয় হয়েছেন তাঁর মানবীয় গুণাবলী, নারী সমাজে তাঁর বংশমর্যদা ও আভিজাত্যের কারণেই অন্য কোনো কারণে নয়। তিনি যাহেলী যুগে সত্বী ও পবিত্র রমণী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এই বিয়ে পঁচিশ বছর বিদ্যমান ছিল। ৬৫ বছর বয়সে যখন খদীজাহহ (র) মৃত্যু বরণ করেন তখন মহানবী (স)'র বয়স ছিল ৫০ বছর। এই পঁচিশ বছর জীবনে কখনো তিনি অন্য নারী বা যুবতীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চিন্তা-ভাবনাও করেননি। পুরুষের ক্ষেত্রে বিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মাঝামাঝি বয়সই জৈবিক চাহিদা পূরণ বা যৌন উত্তাপের উপযুক্ত সময়। অথচ মহানবী (স) স্বীয় জীবনের এই অমূল্য সময় অতিবাহিত করেছেন তাঁর চেয়ে অধিক বয়সী এক রমণীর সান্নিধ্যে যেখানে অন্য কোনো স্ত্রী বা বৈধ দাসীর সাথে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। একাধিক বিয়ে অথবা দাসীর সাথে জৈবিক চাহিদা নিবারণ করা সেই যুগে পরিচিত এবং দোষের কিছু ছিল না।

খদীজাহহ (র)'র মৃত্যুর পরই তিনি অল্প বয়সী আয়েশাসহ অন্য বিধবা নারীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং প্রতিটি বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কারণ বা হিকমাহ ছিল। যাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ও রাসুল (স) বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (স)কে কামুক পুরুষের রূপ দিতে অপপ্রয়াস চালিয়েছে যা আজো অব্যাহত রয়েছে।

কাবাহ নির্মাণে নবী (স)'র অংশগ্রহণ

কাবাহ পৃথিবীতে আল্লাহ'র নামে আল্লাহ'র ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ভবন। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَـارَكًا وَهُـدًى لِلْعَـالَمِينَ} [নিঃসন্দেহে

---

১) সহীহ বুখারী [৩৮২১], সহীহ মুসলিম [২৪৩৭]ও মুসনাদ আহমদ [২৪৮৬৪]।

সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়][১]। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে এই প্রবিত্র গৃহের একাধিকবার নির্মাণ ইতিহাসে স্বীকৃত[২]। তবে কুরআন করীমে শুধুমাত্র ইবরাহীম (আ)'র নির্মাণের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে:{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}[স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাহগৃহের ভিত্তি ও দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তারা দোয়া করেছিলঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ][৩]।

আরবদের মাঝে পবিত্র কাবাহ'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বিষয়টি ইবরাহীম (আ)'র শরীয়াহ'র অংশ বিশেষ। কাবাহ অতি প্রাচীনকালে নির্মিত গৃহ হওয়ার কারণে অনেক দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া মহানবী (স) নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির সামান্য পূর্বে মক্কাহ নগরীতে অতি বৃষ্টির কারণে যে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল তার কারণে কাবাহগৃহের ভিত্তি আরো দুর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং দেওয়ালে ফাটল দেখা দেওয়ার ফলে কুরাইশদের সামনে কাবাহগৃহের পুনঃনির্মাণ ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা ছিল না। কিন্তু কাবাহ'র প্রতি তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে তারা কাজটি সম্পন্ন করতে অনেকটা দ্বীধা-দ্বন্ধে পড়ে যায়। পরে সর্বসম্মতিক্রমে কাবাহগৃহের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করলে মহানবী (স) তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনে বিরোধের সমাধান

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ'র ঘরের (বায়তুল্লাহর) প্রতি সমগ্র আরবজাতির আকর্ষণ অনেকটা তাঁদের সামাজিক মর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অংশের রূপ ধারণ করার কারণে কাবাহগৃহ নির্মাণে আবাল-বৃদ্ধ সকলেই নিজের সামর্থানুযায়ী অর্থ ও শ্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। তদুপরি হাজরে আসওয়াদের (কালো পাথর) মর্যাদা অপরিসীম বিধায় তা প্রতিস্থাপনে বিভিন্ন আরব গোত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ পরিলক্ষিত হয়; কেন না প্রতিটি গোত্র বা গোষ্ঠীর ধারণা এই পুণ্যময় পাথর যে গোত্র বা গোষ্ঠীর হাতে স্বস্থানে প্রতিস্থাপিত হবে তাঁরা হবেন সৌভাগ্যবান গোত্র এবং সমগ্র আরবাঞ্চলে তাঁদের মর্যাদা হবে সবার ওপরে বিধায় কোনো গোত্রই এই সম্মানবোধ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্ম থেকে নিজেরা বঞ্চিত হোক তা মানতে সম্মত না হওয়ার কারণে সমগ্র আরবাঞ্চলের গোত্রসমূহে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের বিজ্ঞজন আবু উমাইয়্যাহ বিন আল-মুগীরাহ রক্তপাত এড়াতে বলেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:৯৬।

[২]) নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে দশবার বায়তুল্লাহ'র নির্মাণের তথ্য পরিলক্ষিত হয়: ১ম-ফেরেস্তাদের নির্মাণ, ২য়-আদম (আ)'র নির্মাণ,৩য়- শীশ (আ)'র নির্মাণ, ৪র্থ- ইবরাহীম (আ)'র নির্মাণ, ৫ম-আমালিকা সম্প্রদায়ের নির্মাণ, ৬ষ্ঠ-জুরহুম গোত্রের নির্মাণ,৭ম-কুসাই বিন কিলাবের নির্মাণ, ৮ম-কুরাইশদের নির্মাণ, ৯ম-আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (র)'র নির্মাণ, ১০ম- হজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণ। পরবর্তী পর্যায়ে ১১তম- তুর্কি সুলতান মুরাদের নির্মাণকে বলা যায়।

[৩]) সূরাহ আল-বাকারাহ:১২৭।

তোমাদের বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানের জন্য একটি প্রস্তাব দিচ্ছি তোমরা তা ভেবে দেখতে পারো এবং তা হলো: তোমাদের মাঝে কাল প্রত্যুষে হারাম শরীফে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবেন তাঁকে তোমরা বিচারক হিসেবে গ্রহণ করো, তিনি উপরিউক্ত বিষয়ে সমাধান দিবেন। উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ছিলেন প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি এবং তাঁকে দেখে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন: ইনি তো আল-আমীন (বিশ্বস্ত) আমরা তাঁকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করলাম। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি একটি কাপড় নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর কাপড় নিয়ে আসা হলে তিনি কাপড়টি মাটিতে বিছিয়ে নিয়ে পাথরটি নিজ হাতে কাপড়ের ওপর রাখলেন এবং প্রতিটি গোত্রকে কাপড়ের এক এক কোণা ধরে পাথরের স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে বললেন। অতঃপর তারা পাথরসহ কাপড়টি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেলে তিনি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেন[১]। মহানবী (স) উদ্ভূত সমস্যার একটি প্রজ্ঞাময়, সুন্দর ও সর্বজন গৃহীত সমাধান প্রদান করে একদিকে যেমন আরব গোত্রসমূহকে রক্তাক্তয়ী সংঘর্ষ ও অহেতুক রক্তপাত থেকে রক্ষা করলেন; অন্যদিকে নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বেই আরবাঞ্চলে তাঁর প্রজ্ঞার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব গোত্রসমূহে তাঁর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

[১]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, সীরাতে ইব্ন হিশামসহ সকল সীরাত গ্রন্থে উক্ত ঘটনা বিশদভাবে বর্ণীত হয়েছে। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখা যেতে পারে; আলী আল-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত: ৬০-৬১।

হেরা গুহায় তাঁর একাকিত্ববাস

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বয়স চল্লিশের দিকে ঘনিয়ে আসলে তাঁর মধ্যে লোকালয় থেকে নির্জনে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি মক্কাহ'র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হেরা গুহায় একাকিত্ববাস গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেখানে মাঝে-মধ্যে নির্জনে থাকতেন এবং কিছু কিছু রাত্রি ইবাদত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। কখনো তা বিশ দিন আবার কখনো বিশ দিনের বেশী প্রায় একমাস পর্যন্ত কাটিয়ে দিতেন; তারপর ঘরে ফিরে বেশীক্ষণ ঘরে অবস্থান করতেন না বরং পরবর্তী একাকিত্ববাসের নতুনভাবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় হেরা গুহায় ফিরে যেতেন। এভাবে চলতে চলতে কোনো এক দিন হেরা গুহায় তাঁর একাকিত্ব সময়ে অহীর আগমন ঘটে[১]।

নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র একাকিত্ববাস গ্রহণের মধ্যে মুসলিম জাতি বিশেষ করে যারা দ্বীনের কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১) নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র একাকিত্ববাস গ্রহণ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম ইবাদত ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজের জীবনকে যতই সাজিয়ে নিক; যতক্ষণ না জীবনের কোনো একটি সময়ে একাকিত্বভাবে নিজের জবাবদিহী না করে, আল্লাহ'র সান্নিধ্যে না আসে এবং মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তামগ্ন না হয় ততক্ষণ তাঁর ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক কিছু দুর্বলতা আছে; যেমন: অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লৌকিকতা ও পার্থিব ভালোবাসা, এগুলো সর্বদা মানবীয় চিন্তা-চেতনায় ঘুরতে থাকে এবং নিজের অবচেতনে কোনো এক সময় অন্তরে তার অবস্থান দৃঢ় হয়ে যায়। অতঃপর যতক্ষণ না মানবসন্তান একাকিত্বে বসে নিজের জাবাবদিহী না করবে তার দুর্বলতাগুলো নিজের কাছে ধরা পড়বে না। সুতরাং মাঝে-মধ্যে একাকিত্বে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন সে নিজের দুর্বলতা ও অপরিপূর্ণতাগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা সংশোধনের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে এবং তা যেন সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হয়।

২) হৃদয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসার প্রশিক্ষণ প্রদান করা মুসলিমদের জন্য অতীব জরুরী। বিশেষ করে যারা আল্লাহ'র রাস্তায় ও দ্বীনের কাজে নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা আরো বেশী; কারণ আল্লাহ'র সান্নিধ্যলাভ ও তাঁর পথে জিহাদ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করা দাওয়াতে ইসলামীর বিশেষ লক্ষ্য। মহান রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসা শুধুমাত্র যৌক্তিক ঈমানের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, যৌক্তিক ঈমান বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগকে প্রভাবিত করলেও তা সাময়িক, যদি তা না হতো তাহলে যৌক্তিক ঈমান দ্বারা মেধা ও আবেগে প্রভাবিত হয়ে প্রাচ্যবিদরাই মুসলিমদের প্রথম সারিতে থাকতো এবং তারা যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ'র সান্নিধ্য লাভে অগ্রগামী হতো।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩] ও সহীহ মুসলিম [১৬]।

ঈমানের পর আল্লাহ'র ভালোবাসা ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের প্রধান মাধ্যম হলো আল্লাহ'র নেয়ামত ও নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা। অতঃপর হৃদয় ও মুখে বেশী করে আল্লাহ'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্মরণ করা এবং মাঝে-মধ্যে একাকিত্ব ও নির্জন স্থানে অবস্থান করে পৃথিবীর চাকচিক্য এবং পার্থিব বিষয়াদি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করা। কারণ হৃদয়ে আল্লাহ'র শাস্তির ভয়-ভীতি ও তাঁর পুরস্কার লাভের আশা এবং ভালোবাসার মাধ্যমে সৃষ্ট গভীরতা উপলব্ধি ও ভাবাবেগ মাঝে-মধ্যে এমন কাজ করতে সক্ষম হয় যা কখনো যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব হয় না । উক্ত বিষয়ে ইমাম শাতেবী যথার্থই বলেছেন:

"একজন মুসলিমের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির ওপর দৃঢ়তা ও ইসলামের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে প্রাথামিক স্তর শুরু হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে আল্লাহ'র শাস্তির ভয়-ভিতি ও তাঁর পুরস্কার লাভের আশা এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়; যেখানে ভয়-ভীতি অনেকটা শাস্তি প্রদানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও আশা-আকাঙ্খা বিচক্ষণ পথপ্রদর্শকের মতো কাজ করে এবং ভালোবাসা হৃদয়ে প্রেরণা যোগায়। অতঃপর ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়, দূরত্ব কমতে থাকে এবং পরিশেষে স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়"[১]। সুতরাং হৃদয়ে সেই আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তসম্মত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা অবশ্যই করণীয় যাকে ইসলামী গবেষকদের কেউ কেউ তাসাউফ বা সূফীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, আবার কারো কাছে তা ইহসান নামে পরিচিত, আবার অনেকেই তাকে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

[১]) ইমাম শাতেবী, আল-মুওয়াফিকাত, প্রাগুক্ত: ২/১৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অহীর আগমন ও রাসুল (স) হিসেবে প্রেরণ
ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসার
সংলাপের রাজনীতি ও রাসুল (স)'র দৃঢ় অবস্থান
হিজরতের অনুমোদন
আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তায়েফ অভিযাত্রা
ইস্‌রা ও মিরাজ অনন্য মুজিযা
মদীনায় হিজরতের অনুমোদন

অহীর আগমন ও রাসুল (স) হিসেবে প্রেরণ

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট সর্বপ্রথম অহীর আগমন সম্পর্কে সহীহ বুখারীসহ সকল হাদীস গ্রন্থে মা আয়েশা'র বরাতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

{أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، فقال اقرأ قال :ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ :أو مخرجي هم قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي}.

[ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট অহী আগমনের সূচনা হয়। অতঃপর তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকাল বেলার আলোর ন্যায় প্রতিফলিত হতো। তারপর তাঁর নিকট একাকিত্ব ভালো লাগে এবং হেরা গুহায় বেশ কিছু রাত একা কাটিয়ে ঘরে ফিরে আবার সেখানে রাত কাটানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন; তারপর খদীজাহহ (র)'র নিকট ফিরে এসে পুনরায় আগের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। এভাবে হেরা গুহায় কোনো এক সময়ে তাঁর কাছে সত্যের আগমন ঘটে। ফেরেস্তা এসে তাঁকে বলেন: পড়ুন, প্রতিউত্তরে তিনি বলেন: আমি পাঠকারী নই, তিনি বলেন: আমাকে ফেরেস্তা জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চাপ দেন যে, আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন: পড়ুন, প্রতিউত্তরে তিনি বলেন: আমি পাঠকারী নই, আবারো তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চাপ দেন এবং পড়তে বলেন, তৃতীয়বারে তিনি বলেন: [পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা

দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না][১]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তা নিয়ে ফিরে আসেন, তাঁর হৃদয় কাঁপতে থাকে এবং তিনি খদীজাহহ (র)'র কাছে এসে বলেন: আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। অতঃপর তাঁকে কম্বল জড়ানো হয় এবং ভয় কেটে গেলে তিনি খদীজাহ (র) কে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেন এবং তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কা করলে খদীজাহ বলেন: কখনো নয়। আল্লাহ'র কসম আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। নিশ্চই আপনি আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করেন, অসহায় ও অনাথদের বোঝা বহন করেন, অতিথির আপ্যায়ন করেন এবং সামাজিক সমস্যায় সত্যের পক্ষে সহযোগিতা করেন। অতঃপর খদীজাহ (র) তাঁকে তার চাচাতো ভাই অরকাহ বিন নাওফলের কাছে নিয়ে যান। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বিধায় হিব্রু ভাষায় ইঞ্জীল কিতাব লিপিবদ্ধ করতেন[২]। তিনি ছিলেন খুবই বৃদ্ধ এবং তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর খদীজাহ (র) তাঁকে বললেন: হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। অতঃপর অরকাহ বিন নাওফল বললেন: হে ভাতিজা তুমি কী দেখেছ? অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) যা দেখেছেন তার পূর্ণ বর্ণনা দেন। অতঃপর অরকাহ বিন নাওফল বললেন: সেই সত্তা (ফেরেস্তা বা অহী) যা নবী মুসা (আ)'র নিকট অবতরণ করেছিল। হায়! আমি যদি এখন শক্তিশালী যুবক হতাম, যদি আমি তখন জীবিত থাকতাম যখন তোমাকে তোমার জাতি বহিষ্কার করে দিবে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তারা আমাকে বহিষ্কার করবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আপনি যা নিয়ে আবির্ভূত হতে চলেছেন তা নিয়ে যে ব্যক্তিই আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আপনার সেই দিন যদি আমার সাক্ষাত হয় অবশ্যই আমি আপনাকে সুদৃঢ় সহযোগিতা করবো। তারপর অরকাহ বিন নাওফল আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না এবং অহী (কিছু দিনের জন্য) স্থগিত হয়ে যায়][৩]।

অহী স্থগিত থাকার সময়-কাল নিয়ে হাদীসবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন: তিন বছর, কারো মতে দুই বছর ছয় মাস, আবার কারো মতে তার চেয়েও কম অর্থাৎ সপ্তাহ দুয়েক। তবে বিশুদ্ধ মত হলো যা ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তা হলো ছয় মাস[৪]। ইমাম বুখারী বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র)'র বরাতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) অহী স্থগিত হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: আমি হাটতে ছিলাম হঠাৎ আমি আকাশ থেকে একটি ধ্বনী শুনতে পেলাম। অতঃপর আমি ওপরের দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম সেই ফেরেস্তাকে যিনি আমার কাছে হেরা গুহায় আগমন করেছিলেন তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যাই। অতঃপর ঘরে ফিরে বললাম: আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও[৫]। অতঃপর মহান রাব্বুল আলামীন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণ করলেন: { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ

---

১) সূরাহ আল-আলাক:১-৫।

২) সহীহ বুখারী [৩] ও সহীহ মুসলিম [১৬]।

৩) সহীহ বুখারী [৪, ৪৯৫৬ ও ৬৯৮২] ও মুসলিম [১৬১] সহ সকল হাদীস গ্রন্থে অহীর অধ্যায়ে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

৪) ইব্ন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:১/২১।

৫) সহীহ বুখারী [৩২৩৮]।

{فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ*}[হে চাদরাবৃত, উঠুন, এবং সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন][১]। অতঃপর অহীর ধারা অব্যাহত থাকে[২]।

অহী আগমনের প্রথম ঘটনা থেকে প্রমাণীত হয় যে, মূলত দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি আক্বীদাহ ও শরয়ী বিধান সব কিছুর মূল ভিত্তি অহী। অহী অনুধাবন করা এবং তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহ'র রাসুল (স) মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অদৃশ্য বিষয়াদির (যা পঞ্চ ইন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা জ্ঞাতব্য নয়) সংবাদসহ বিভিন্ন নির্দেশনা ও বিধি-নিষেধ যা নিয়ে তিনি আর্বিভূত হয়েছেন সব কিছু বিধান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা। পাশাপশি অহীর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, মানবসন্তান নিজের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা যা প্রণয়ন করে থাকে এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণী (কোনো রকম পরিবর্তন বা সংযোজন অথবা বিয়োজন ব্যতীত) দুটো বিষয় এক নয়। অহী আগমনের শুরু থেকে নিয়ে নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পর যারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আধুনিক যুগের প্রাচ্যবিদরাসহ সকলেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিল (যা এখনো অব্যাহত রয়েছে) যে, কোনো রকম সন্দেহ সৃষ্টি করে অহীকে কলুষিত করা যায় কিনা। যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত সকল ধর্মের মূল ভিত্তি অহী, তাকে যদি কোনোভাবে সন্দেহের আওতায় নিয়ে আসা যায় তাহলে পুরো দ্বীনই এক রকম সন্দেহের মধ্যে চলে আসে। এটি সহজেই অনুমেয় যে, কখনো সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কোনো দ্বীনের আবির্ভাব ঘটেনি এবং তা প্রতিষ্ঠা করাও অবান্তর।

তা সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুরা কখনো অহীকে কলুষিত করতে পারেনি এবং পারবেও না। অহী স্থগিত হওয়ার পর পুনরায় অহীর অবতরণ অব্যাহত থাকা প্রমাণ করে যে, অহীর আগমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইচ্ছের ওপর নয়; বরং তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বিধায় অন্তত অহীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। নিম্নে এর কেয়েকটি যৌক্তিক কারণ বর্ণনা করা হলো:

১) কুরআন করীম ও হাদীসে রাসুল (স)'র পার্থক্য সুস্পষ্ট; কারণ অহীর আগমন কখনো অগ্রীম সংবাদ দিয়ে হয় না বা নবী-রাসুল ইচ্ছে করলেই অহীর আগমন হয় না। তাছাড়া অহীর বর্ণ,শব্দ ও বাক্যবিন্যাস সবটাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জিবরীলে আমীনের মাধ্যমে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষে তাতে কোনো রকম পরিবর্তন ও সংযোজন অথবা বিয়োজন করার অনুমোদন নেই। যদিও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীসও এক প্রকার অহী। এর বিষয়বস্তু ও ভাব আল্লাহ'র পক্ষ থেকে; তবে এর বর্ণ, শব্দ, ভাষা ও বাক্যবিন্যাস আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিজের। সুতরাং কুরআন করীমের সাথে হাদীসে রাসুল (স)'র সংমিশ্রণের ভয়ে অহী অবতরণের প্রথমার্ধে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন; যা ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

২) অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) কে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতেন না; কখনো তিনি দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন যতক্ষণ না সেই বিষয়ে

[১]) সূরাহ আল-মুদ্দাসসির:১-৫।

[২]) সহীহ বুখারী [৪ ও ৪৯২৬] ও সহীহ মুসলিম [১৬১]।

কুরআন করীম অবতরণ হয়। অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীর সন্ধান করতেন এবং প্রশ্নকৃত বিষয়ে সদ্য অবতীর্ণ অহী বা প্রত্যাদেশ পাঠ করে শুনাতেন।

৩)আল্লাহ’র রাসুল (স) নিরক্ষর ছিলেন বিধায় কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর রহস্য উন্মোচণ কখনো সম্ভব নয়। যেমন ইউসুফ (আ)’র ঘটনাপ্রবাহ, মুসা (আ)’র মা সদ্য প্রসূত সন্তানকে ফিরাউনের ভয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করার ঘটনাসহ অসংখ্য ঘটনা যা কুরআন করীমে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। অহী বা প্রত্যাদেশ না হলে উপরিউক্ত ঘটনাসমূহ কখনো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয় যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } [তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লিখোনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতো][১]।

৪) একজন ব্যক্তি তাঁর স্বজাতির মধ্যে চল্লিশ বছর সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি সত্যবাদী হিসেবে তাঁর জাতির কাছে দাবি করা স্বাভাবিক বিধায় তিনি নুবুওয়্যত প্রাপ্তির পর প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে কখনো দ্বীধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন না যেমনটি কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে{ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }[সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোনো সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকো যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি; তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমার রব এর নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কষ্মিনকালেও সন্দেহকারীদের অন্তর্গত হয়ো না][২]। আল্লাহ’র রাসুল (স) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: সূরাহ ইউনুসের উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর আমার কোনো প্রকার সন্দেহ ছিল না এবং কোনো প্রকার প্রশ্নও ছিল না[৩]।

প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনে দাওয়াত প্রচার

নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পর আল্লাহ’র রাসুল (স) মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে সাড়া দিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার প্রতি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। আল্লাহ’র তাওহীদের দাওয়াত স্বাভাবিকভাবেই মুর্তি পূজার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা। পাশাপাশি কুরাইশ যেহেতু নিজেদের পৌত্তলিকতার বিষয়ে খুবই কট্টর এবং বিষয়টি খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর বিধায় আল্লাহ’র রাসুল (স) প্রাথমিক পর্যায়ে কুরাইশদের সাধারণ লোকালয়ের পরিবর্তে যাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা ও আন্তরিকতা খুবই নীবিড় তাদেরকে আল্লাহ’র দ্বীন গ্রহণে আহ্বান জানান এবং একদল সৌভাগ্যবান নর-নারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে প্রথম প্রবেশকারীর মর্যাদা লাভ করেন। তারা হলেন: তাঁর স্ত্রী খদীজাহ বিনতে খুআয়লিদ (র), তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইব্‌ন আবী তালিব (র), তাঁর মুক্তদাস ও পালক সন্তান যায়দ বিন হারিছাহ (র), তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকর বিন আবী কুহাফাহ (র), তাঁর জামাতা ওসমান বিন আফ্‌ফান (র), আবদুর রহমান বিন আউফ (র), তাঁর ফুফাতো ভাই যুবাইর

---

১) সূরাহ আল-আনকাবুত: ৪৮।

২) সূরাহ ইউনুস: ৯৪।

৩) সুনান আবী দাউদ [৫১১০]।

বিন আল-আওয়াম (র) ও সাআদ বিন আবী অক্কাস (র), যাঁদের সকলেই যায়দ বিন হারিছাহ ব্যতীত কুরাইশদের মধ্যে ভদ্র ও অভিজাত গোত্রের সন্তান হিসেবে সুপরিচিত[১]।

ইসলামে দীক্ষিত মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে গোপনে মিলিত হতেন এবং তাঁরা কোনো ইবাদত চর্চা করার ইচ্ছা পোষণ করলে কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে মক্কার উপত্যকায় চলে যেতেন। অতঃপর ইসলামে প্রবেশকারীর সংখ্যা ত্রিশের অধিকে উন্নীত হলে বিশিষ্ট সাহাবী আরকম (র)'র বাড়ীকে ইবাদত ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সাক্ষাতের জন্য নির্বাচন করা হয়[২]। তবে নও মুসলিমগণের সংখ্যা বাড়তে থাকলে দেখা যায় যে, কুরাইশগণ ব্যতীত অধিকাংশই দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত, কুরাইশদের নিকট যাঁদের তেমন কোনো মূল্য নেই।

স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পৃথিবীতে প্রচলিত একমাত্র দ্বীন এবং এর প্রথমদিকের অনুসারীগণ সমাজের অতি দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর। এরাই মূলত একদিন নতুন একটি রাষ্ট্রের কর্ণধারে পরিণত হবেন। দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর সদস্যদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করার রহস্য বা তাৎপর্য কী?

এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এর রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাছাড়া পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ সকলেই প্রতিটি যুগে সমাজের অভিজাত পরিবার বা গোত্রের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রাথমিক দল সমাজের মূল্যহীন অতি দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন কুরআন করীমে নূহ (আ)'র প্রথমদিকের অনুসারীগণ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে:{ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ }[তখন তার কওমের কাফের প্রধানরা বললো: আমরা তো আপনাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর আপনাদের কোনো প্রাধান্য দেখি না; বরং আপনাদেরকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি][৩]।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমে সালেহ (আ)'র প্রথমদিকের অনুসারীগণ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, এরশাদ হচ্ছে:{ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ }[তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দুর্বল ও দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, সালেহ তাঁর পালনকর্তা পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বললো: নিশ্চয় আমরা তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। দাম্ভিকরা বললো: তোমরা যে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অবিশ্বাসী][৪]।

---

[১]) সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ সকল হাদীস গ্রন্থ ও সীরাত গ্রন্থে পূর্ণ বিবরণসহ বর্ণীত হয়েছে।

[২]) সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/২৪৯-২৬১।

[৩]) সূরাহ হুদ:২৭।

[৪]) সূরাহ আল-আরাফ:৭৫-৭৬।

দরিদ্র ও নিপীড়িতদের হাতে আল্লাহ'র দ্বীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পনের মূল রহস্য হলো, পৃথিবীতে মানুষের রাজত্ব বাতিল করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা; যাতে করে পৃথিবীতে আল্লাহ'র উপাস্যরূপ কখনো কলুষিত না হয়। তা সম্ভব একমাত্র দরিদ্র ও নিপীড়িতদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে; কারণ অভিজাতদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলে তারা মনে করতো এটি তো তাদেরই প্রাপ্য এবং তারা নিজেদের যোগ্যতা বলে ক্ষমতার মূল উৎসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলে তারা সর্বদা স্মরণ করবে যে, এটি তাঁর অধিকার নয় বরং অর্পিত দায়িত্ব, যতক্ষণ ক্ষমতার মূল মালিক (মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন) তাঁর দয়ার মাধ্যমে এই অর্পিত দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা পোষণ করবেন ততক্ষণ তিনি এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন। আর যখন তিনি অন্যত্র দায়িত্ব প্রদান করবেন তখন তিনি সানন্দে তা ফিরিয়ে দিবেন। যেমন কাদসিয়্যাহ'র যুদ্ধে মুসলিম সেনা রাবয়ী বিন আমের আল-জুনদী ও ইরানী সেনাপতি রুস্তমের মধ্যকার সংলাপ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়[১]।

প্রকাশ্যে দাওয়াতের প্রচার-প্রসার

প্রাথমিক পর্যায়ের গোপনে দাওয়াতের স্তর অতিক্রম করার পর মুসলিমগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলে বিষয়টি মক্কাহ নগরীতে আর গোপন থাকলো না। কানে কানে সকলের কাছে ইসলামের সংবাদ পৌঁছে যায় এবং তিন বছরের মধ্যে এটিই মক্কা নগরীর সকলের কাছে একমাত্র আলোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (Talk of the town) পরিণত হয় এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি এত দিন তিনি যা গোপনে প্রচার করেছিলেন তা প্রকাশ্যে প্রচার-প্রসারের নির্দেশ আসে। অতঃপর কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ}[অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের কে এড়িয়ে যান][২] এবং আরো অবতীর্ণ হয় যে, দাওয়াতের কাজ আপনি নিজের নিকটাত্মীয়দের দিয়ে শুরু করুন:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন][৩]।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণের পর আল্লাহ'র রাসুল (স) মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশানুসারে সাফা পাহাড়ে চড়ে হে ফিহ্র গোত্র, হে আদী গোত্র বলে নাম নিয়ে বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠীকে সম্মোধন করে ডাক দিলে তারা উপস্থিত হন এবং যারা উপস্থিত হতে পারেননি তারাও বিষয়টি কী তা ভালোভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমি যদি তোমাদের সংবাদ দিই যে, এক দল যোদ্ধা এই পর্বতের পেছন থেকে আকস্মিক আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। তোমরা কী আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই উত্তর দিলো: আমরা কখনো

[১]) বিস্তারিত দেখুন: মহাম্মদ আল-খাযরী রচিত "ইতমামুল অফা ফী সীরাতিল খুলাফা" প্রাগুক্ত,পৃ: ৯৮-১০১।

[২]) সূরাহ আল-হিজ্‌র:৯৪।

[৩]) সূরাহ আশ-শুআরা:২১৪-২১৫।

আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তাহলে তোমরা শুনো: আমি তোমাদের এক ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সতর্ক করছি। অতঃপর আবু লাহাব বললো: হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও ... এই জন্যে তুমি আমাদের সমাবেত করেছ? আবু লাহাবের এই দম্ভোক্তির পর তার ধ্বংসের বার্তা নিয়ে একটি পূর্ণ সূরাহ অবতীর্ণ হয়:{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}[আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহানযুক্ত অগ্নিতে। এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে][১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) সাফা পাহাড় থেকে নেমে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশানুসারে তাঁর নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সম্মোধন করে বললেন: হে বনী কাআব! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী মুর্‌রাহ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আব্দে শাম্‌স! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আব্দ মনাফ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে ফাতিমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদের সতর্ক করা ব্যতীত কিছুই করতে পারবো না[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রকাশ্যে দাওয়াতের পর কুরইশদের প্রতিক্রিয়া খুবই স্পষ্ট ছিল। যারা এতদিন তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসেবে মেনেছে তারা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে এই বলে অস্বীকৃতি জানালো যে, তারা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে যে ধর্মের অনুসরণ করে আসছে তা ত্যাগ করতে পারবে না। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদেরকে পুরানো রীতিনীতি ও আনুগত্যের পরিবর্তে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন এবং সুস্পষ্টভাবে বুঝালেন যে, তারা যেই প্রতিমা বা মুর্তিগুলোর সম্মানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলো তাদের কোনো প্রকার লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। বাপ-দাদারা করেছেন বিধায় কোনো যৌক্তিক করাণ ছাড়া তা আকড়িয়ে থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যেমন কুরআন করীমে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে চিত্রায়ন করা হয়েছে:{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}[যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ'র অবতীর্ণ বিধান ও রাসুলের দিকে এসো। তখন তারা বলে যে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোনো জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে?][৩]।

---

১) সূরাহ আল-মাসাদ বা লাহাব।

২) সহীহ বুখারী [২৭৫৩] ও মুসলিম [২০৪]।

৩) সূরাহ আল-মায়িদাহ: ১০৪।

অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স) যখন তাদের প্রতিমা পূজার অসারতার বিষয়ে বলতে লাগলেন এবং যৌক্তিক করাণ ছাড়া পূর্বপুরুষদের রীতি আকড়িয়ে ধরা নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে আখ্যা দিতে থাকলেন তখন তারা বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে গেল। তবে তাঁর চাচা আবু তালিব খুবই উৎকণ্ঠিত হলেন এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসলেন।

আল্লাহ’র রাসুল (স)’র দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন অযৌক্তিক সামাজিক রীতিনীতি ও অন্ধানুগত্যের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ ঘোষণা করে আসছে এবং ইসলামের যুগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে তা অবশ্যই যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়; যেমন আল্লাহ’র রাসুল (স) কুরাইশদের মুর্তি বা প্রতিমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেলেন।

অতঃপর কুরাইশ আল্লাহ’র রাসুল (স)’র বিরুদ্ধে শক্তভাবে অবস্থান নেয় এবং তাঁকে ও তাঁর দুর্বল অনুসারীদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে দেয়। তবে আল্লাহ’র রাসুল (স) ও তাঁর সহাবীগণ তাদের সাথে সংঘর্ষে উপনীত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করে যান। আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাহাবীদের সান্ত্বনা প্রদান করে কুরআন অবতীর্ণ হয়, এরশাদ হচ্ছে{الـم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}[আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে][১]।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপরিবর্তীত রীতি অনুযায়ী সকল নবী-রসুলগণ বিভিন্ন নিপীড়ন, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন বিধায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)’র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাহাবীগণের ওপর নির্যাতনের মাত্রা সীমা অতিক্রম করেছে। আবু তালিব উপত্যকায় আল্লাহ’র রাসুল (স)ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসকে হার মানিয়েছিল। শুধু তাই নয় মুসলিমদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করার উপক্রম হয়েছিল, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}[তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে,অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে রাসুল ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ’র সাহায্য? তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ’র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী][২]।

---

[১]) সূরাহ আল-আনকাবুত: ১-৩।

[২]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২১৪।

তাছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবী খাব্বাব কর্তৃক বর্ণিত: বেলাল, ইয়াসীর ও সুমাইয়্যাহ এবং তাঁদের ছেলে আম্মারসহ বিভিন্ন সাহাবীগণের ব্যক্তিগত পর্যায়ের নির্যাতনের ব্যাপারে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট অভিযোগ করে মুসলিমদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার আবেদন করা হলে এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বলেন: আল্লাহ'র রাস্তায় তোমরা বিভিন্ন রকম নিপীড়ন, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এটি আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ওপর সর্বযুগে হয়ে আসছে এবং এতে নিরাশ ও আল্লাহ'র ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার কোনো অবকাশ নেই; বরং এই নিপীড়ন, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্যেই নিহীত রয়েছে আল্লাহ'র পথে চলার সুন্দর পাথেয় এবং বিজয়ের নিকটতম পন্থা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং এমন নিরাপত্তা ইসলামের আলোকে সাধীত হবে যে, মানুষ সানা থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত নির্ভয়-নিরাপদে চলা-ফেরা করবে (আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না) কোনো বিপত্তি ঘটবে না[১]।

সংলাপের রাজনীতি

কুরাইশরা আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে সামান্যতম নমনীয়তাও প্রত্যক্ষ করতে না পেরে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সংলাপে বসার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় কুরাইশদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়, বিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তি উৎবাহ বিন রাবীআহ কুরাইশদের সমাবেশে প্রস্তাব করেন যে, আমি কি মুহাম্মদ (স)'র নিকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলবো? সম্ভবত এর কোনো একটি তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তিনি তাঁর নতুন মিশন থেকে ফিরে আসবেন। তারা সকলেই এক বাক্যে বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই হে আবুল অলীদ! আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন এবং তাঁকে তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখুন। অতঃপর উৎবাহ বিন রাবীআহ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমন করে তাঁর পাশে বসলেন এবং বললেন: হে ভাতিজা! তুমি নিজে অবগত যে, তুমি আমাদের মধ্যে অভিজাত গোত্রের সন্তান, সমাজে তোমার ও তোমার গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তুমি তোমার জাতির নিকট বিশাল এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছ যার মাধ্যমে তুমি তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছ এবং তাদের বুদ্ধিজীবিদের বোকা বানিয়ে অপমান করেছ... আমি তোমার সামনে কিছু প্রস্তাব দিতে চাই সেগুলো তুমি বিবেচনা করো এবং সম্ভবত এর কোনোটা তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হে আবুল অলীদ আপনি বলুন আমি শুনছি।

উৎবাহ বিন রাবীআহ বললেন: হে ভাতিজা! তুমি যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছ তার মাধ্যমে যদি সম্পদ উপার্জনের ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা আমাদের সম্পদের একটি অংশ দিয়ে তোমাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করবো। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও আমরা তোমাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করে নিব, তোমাকে ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না। আর যদি তুমি রাজা হতে চাও আমারা তোমাকে আমাদের রাজা হিসেবে মেনে নিব। আর যদি কোনো অসুস্থতার কারণে তোমার এই

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৬১২ ও ৩৮৫২]।

পরিণতি ঘটেছে যা তুমি বুঝতে পারছ না তাহলে আমরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তোমার ভালো চিকিৎসা করাব যতক্ষণ না তুমি আরোগ্য লাভ করো[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) উৎবাহ বিন রাবীআহ'র প্রস্তাব ধৈর্যসহকারে শুনলেন এবং বললেন: হে আবুল অলীদ আপনার কথা শেষ হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, .. আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমার কাছ থেকে শুনুন। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরআন করীমের সূরাহ ফুচ্চিলাতের শুরু থেকে পাঠ শুরু করেন{ حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ * قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ}[হা মীম, এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, অতীব দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। তারা বলে আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্নে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি অহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই দৃঢ়ভাবে থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ][২]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) পাঠ অব্যাহত রাখলেন এবং উৎবাহ শ্রবন করে যাচ্ছিলেন, যখন আল্লাহ'র রাসুল (স){ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}[অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মতো][৩] এই আয়াতে পৌঁছালে উৎবাহ নবী করীম (স)'র মুখ চেপে ধরলো এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাঁকে পাঠ থেকে বিরত রাখলো। আয়াতে ভয়াবহ আযাবের যে বর্ণনা উচ্চারিত হচ্ছে তার ভয়ে ভীত হয়ে তা করলো।

তারপর উৎবাহ কুরাইশদের মাঝে ফিরে আসলে তারা বললো: কী দেখলেন হে আবুল অলীদ? সে বললো: আমি কিছু কথা শুনলাম যার মতো ইতিপূর্বে কখনো শ্রবন করিনি। আল্লাহ'র শপথ! তা কাব্য নয়, যাদুও নয় এবং নয় কোনো গণকের মন্ত্র-পাঠ। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা শুনো এবং এই লোককে তোমরা তাঁর অবস্থানে ছেড়ে দাও এবং তোমরা তাঁকে বিরক্ত করো না। আল্লাহ'র শপথ! আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তার মধ্যে মহান কিছু অবশ্যই রয়েছে। আরবজাতি যদি তাকে পরাভূত করতে পারে তাহলে তোমরা তাঁর থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, আর যদি তিনি আরবদের পরাভূত করেন তাঁর রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তাঁর সম্মান তোমাদেরই সম্মান। তখন তারা সকলেই বললো: হে আবুল অলীদ তোমাকে কথার যাদু দিয়ে যাদু করেছে। সে বললো:

---

[১]) সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৩। সাঈদ রমাদ্বান বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত: পৃ-৮০-৮২।

[২]) সূরাহ ফুচ্চিলত বা হামীম সিজ্‌দাহ:১-৬।

[৩]) সূরাহ ফুচ্চিলত বা হামীম সিজ্‌দাহ:১৩।

এটি তাঁর ব্যাপারে আমার অভিমত। অতঃপর তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা তা করতে পারো[১]।

ইতিহাসবিদ ইব্ন জরীর তাবারী ও ইব্ন কসীরের ভিন্ন এক বর্ণনামতে আল-অলীদ বিন মুগীরাহ'র নেতৃত্বে কুরাইশদের একদল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে সম্পদশালী ও সুন্দরী রমণীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাদের মুর্তি বা প্রতিমাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে বললে উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে যে দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা চালিয়ে যাওয়ার প্রতি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অতঃপর তারা বলল: একদিন তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোর উপসনা করো এবং আমরাও একদিন তোমার উপাস্যের উপসনা করবো। আল্লাহ'র রাসুল (স) দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যখান করলেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরাহ আল-কাফিরুন অবতীর্ণ হয়:{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }[বলুন, হে কাফেরকুল! আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত করো। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা করো। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্যে এবং আমার দ্বীন আমার জন্যে][২]।

তারপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উৎবাহ'র প্রস্তাব নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট পুনরায় ফিরে আসলে তিনি উত্তরে বলেন:"তোমরা যা বলেছো তাতে আমার এতটুকু লোভ নেই। আমি যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি তা সম্পদ, মর্যাদা ও রাজত্বের জন্য নয়; বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে তোমাদের নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার নিকট একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে নিদের্শ প্রদান করেছেন যে, আমি যেন সুসংবাদ প্রদান করি এবং সতর্ক করি। অতঃপর আমি আমার পালনকর্তার বার্তাসমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ প্রদান করেছি এবং সতর্ক করেছি। যদি তা আমার কাছ থেকে তোমরা গ্রহণ করো ইহকাল ও পরকালে তোমাদের কল্যাণ বয়ে আনবে। আর যদি তোমরা তা বর্জন করো আমি আল্লাহ'র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবো যতক্ষণ না তোমাদের এবং আমার মাঝে ফয়সালা হয়ে যায়"[৩]।

অতঃপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললো: যদি আমাদের কোনো প্রস্তাব তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, ঠিক আছে তাহলে তুমি তো জ্ঞাত যে, আমাদের শহর সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ। আমাদের পানির খুবই অভাব এবং আমরা খুবই কঠিন অবস্থায় জীবন-যাপন করছি। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আবেদন করো না যিনি তোমাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন; তিনি যেন এই পর্বতমালা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেন, যেগুলো আমাদেরকে সংকোচিত করে রেখেছে এবং ইরাক ও সিরিয়া'র মতো

---

[১]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক ও সীরাতে ইব্ন হিশামসহ অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সীরাহ,প্রাগুক্ত: ৮০-৮২।

[২]) সূরাহ আল-কাফিরুন:১-৬।

[৩]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক ও সীরাতে ইব্ন হিশামসহ অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে ঘটনাটি বর্ণীত হয়েছে।

আমাদের জন্য ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা গত হয়েছেন তাদেরকে পুর্নজীবিত করুন, বিশেষ করে তাদের মধ্যে কুসাই বিন কিলাবের মতো সত্যবাদী নেতৃবৃন্দ থাকবে, যাতে আমরা তাদেরকে তোমার মিশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, তা সত্য না মিথ্যা, এবং তোমার জন্য স্বর্ণ-রূপার খনি ও সুন্দর বাগান সমৃদ্ধ প্রাসাদ থাকবে যাতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে, তোমার মিশনের পিছনে কোনো স্বার্থ নেই.... আমরা যা চাইলাম তা যদি তুমি করতে পারো তবে আমরা তোমার কথা সত্য বলে মেনে নিব এবং আল্লাহ'র নিকট তোমার সম্মান ও মর্যাদা বুঝতে পারবো যেমন তুমি বলতেছ যে, তোমাকে তিনি প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের এই অবান্তর প্রস্তাবের উত্তরে বললেন: আমি তা করতে পারবো না এবং না আমি আল্লাহ'র কাছে তা চাইবো। অতঃপর তারা (দীর্ঘ তর্ক ও সংলাপের পর) বললো: আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ইয়ামামাহ'র সেই লোক তোমাকে তা শিক্ষা দিয়েছে, যাকে রাহমান বলা হয়। আল্লাহ'র শপথ আমরা কখনো রাহমানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না। হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে সাফ জানিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ'র শপথ! আমরা তোমাকে আমাদের ধ্বংস করতে ছেড়ে দিব না। অতঃপর তারা চলে যায়[1]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আনুগত্যের শর্ত হিসেবে কুরাইশদের এই অবান্তর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} [এবং তারা বলে: আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিন। অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে। অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। অথবা আপনার কোনো সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করবো। বলুনঃ আমি আমার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি তো একজন মানব, একজন রসূল বৈ কেউ নই?][2]।

কুরাইশদের দাবির পক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইতিবাচক সাড়া প্রদান না করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) কে কুরআন করীম ব্যতীত অন্য কোনো মুজিযা বা অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয়নি; বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয় জ্ঞাত যে, তাদের এই সকল দাবী অস্বীকার ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে ঠাট্টা-বিদ্রোপ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, যা তাদের দাবি থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে যদি

[1]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৮২-৮২।

[2]) সূরাহ বনী ইসরাঈল: ৯০-৯৩।

তাদের দাবি সত্যিই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আনুগত্য করার জন্য করা হতো অবশ্যই তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা বাস্তবায়ন করতেন। যেমন কুরআন করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে:{ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ } [যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে। তবুও ওরা একথাই বলবে যে, অবশ্যই আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি][১]।

সুতরাং দুপক্ষের সংলাপ ফলপ্রসু না হওয়ায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যা করতে ঐকমত্য পোষণ করে বনী হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যখান করে দেন।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমানবিক ও ধ্বংসাত্মক অবরোধ

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব দৃঢ়তার সাথে কুরাইশদের দাবি প্রত্যাখান করার কারণে তারা (কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রদ্বয়) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব থেকে যাঁরা তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে তাঁদের সাথে বয়কট করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করে যে, তাঁদের সাথে কেউ বিয়ে-শাদী করবে না, বেচা-কেনা করবে না, জীবিকা অর্জনের কোনো পন্থা তাঁদের সামনে খোলা রাখা হবে না, তাঁদের কোনো সন্ধি গ্রহণ করা হবে না এবং তাঁদের প্রতি কোনো রকম দয়া প্রদর্শন করা হবে না; যতক্ষণ না বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার জন্য তাদের কাছে তুলে দেয়[২]। অতঃপর সেই চুক্তিনামা কাবাহ শরীফের ভিতরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়; যেন কুরাইশদের কেউ এই চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে না পারে এবং কুরাইশ এই চুক্তির ওপর দু'বছর অপর এক বর্ণনায় তিন বছর আবদ্ধ ছিল[৩]।

তখনকার যুগে মক্কানগরী বিভিন্ন উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল, অতঃপর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আল্লাহর রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণসহ আবী তালিব (মুত্তালিব) উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। যেখানে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিমদের পাশাপাশি কাফিরগণও আত্মীয়তার কারণে অবরুদ্ধ ছিলেন। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা আবু লাহ্‌ব (প্রকৃত নাম আব্দুল উজ্জা) বনু মুত্তালিবের পক্ষ ত্যাগ করে কুরাইশদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল[৪]।

অবরোধের দুই বা তিন বছর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা মতে মুসলিমগণ মৃত

---

১) সূরাহ আল-হিজর:১৪-১৫।

২) সহীহ বুখারী [৮৫৯] ও সহীহ মুসলিম [১৩১৪]।

৩) সহীহ বুখারী [৮৫৯] ও সহীহ মুসলিম [৩৪৪]। সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক ও সীরাতে ইব্‌ন হিশামসহ অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণীত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন: ইবন কাসীর, সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:২/৪৩-৭২।

৪) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬-৮৭।

প্রাণী ও গাছের পাতা ভক্ষণ করেছিলেন। ইতিহাসবিদ সুহাইলী বর্ণনা করেন যে, মক্কায় কোনো বনিক দল আগমন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ পরিবারের নারী-শিশুদের খাওয়ানোর জন্য তাদের কাছে কোনো খাবার ক্রয় করতে গেলে আবু লাহব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতো: হে ব্যবসায়ীরা! তোমরা মূল্য বৃদ্ধি করে দাও তাঁরা যেন কিছু ক্রয় করতে না পারে। অতঃপর তারা পণ্যের মূল্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিত এবং মুসলিমগণ খালি হাতে তাঁদের শিশুদের নিকট ফিরে আসতেন। শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটপট করতো অথচ তাঁদের ক্ষুধা নিবারণের কোনো খাবার তাঁদের হাতে থাকতো না[১]।

এই অবরোধের তিন বছরের মাথায় বনু কুসাই'র কিছু লোক অবরোধ ভঙ্গ করতে উপনীত হয়। পাশাপাশি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে উইপোকা আল্লাহ শব্দ ছাড়া পুরো চুক্তিনামা খেয়ে ফেলে এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) এই সংবাদ তাঁর চাচা আবু তালিবকে জ্ঞাত করলে তিনি বলেন: তোমার পালনকর্তা কী তোমাকে এই সংবাদ প্রদান করেছেন? আল্লাহ'র রাসুল (স) উত্তরে বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর আবু তালিব কুরাইশদের কোনো সমাবেশে উপস্থিত হয়ে এই দাবি করেন যে, তোমাদের চুক্তিনামা ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাকে আমার ভাতিজা সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে উইপোকা পুরো চুক্তিনামা খেয়ে ফেলেছে, সে আমাকে কখনো মিথ্যা বলেনি। সুতরাং এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তোমাদের উচিৎ হবে এই অমানবিক অবরোধ প্রত্যহার করে নেওয়া, এবং আমাদের শেষ সদস্যের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কখনো তাঁকে হত্যার জন্য কারো হাতে তুলে দিব না। আর যদি এই ঘটনা অসত্য প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের আপনজনকে আমরা তোমাদের হাতে তুলে দিব এবং তোমাদের যা ইচ্ছা তা তোমরা করতে পারবে। তখন তারা সকলেই এই শর্ত মেনে নেয় এবং চুক্তিনামা নিয়ে আসা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) যেমন সংবাদ দিয়েছিলেন তেমনই ঘটেছে। তখন তারা বলে উঠলো: এটা তোমার ভাতিজার যাদু![২] ... এবং তাদের শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় পাঁচ ব্যক্তি চুক্তিনামা ছিড়ে ফেলতে এগিয়ে আসেন। তারা হলো: হিশাম বিন আমর বিন হারিস, যুহাইর বিন উমাইয়্যাহ, মুতঈম বিন আদী, আবুল বুখতরী বিন হিশাম এবং যামআহ বিন আসওয়াদ। চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এগিয়ে আসেন যুহাইর বিন উমাইয়্যাহ এবং তিনি বলেন: হে মক্কাবাসী আমরা খাবো এবং পরিধান করবো আর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব অনাহারে ধ্বংস হয়ে যাবে, তাঁদের কাছে কোনো পণ্য বিক্রয় করা হবে না এবং তাঁদের কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয়ও করা হবে না? আল্লাহ'র শপথ এই অমানবিক ও ধ্বংসাত্মক চুক্তিনামা ছিড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হবো না। অতঃপর অন্য চার জনও তার কথায় সম্মতি জানায়। অতঃপর মুতঈম বিন আদী চুক্তিনামা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেলে। তারপর এই পাঁচজন কুরাইশদের এক দল নিয়ে আবু তালিব উপত্যকার দিকে রওনা হন

---

১) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন কাসীর, সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:২/৪৩-৭২।

২) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন কাসীর, সীরাহ নাবাভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:২/৪৩-৭২।

যেখানে মুসলিমগণ অবরুদ্ধ ছিলেন এবং তারা মুসলিমদের বের করে নিয়ে আসেন এবং যার যার বাড়ী ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন[১]।

অমানবিক অবরোধের উপদেশ ও শিক্ষা

দীর্ঘ তিন বছর অমানবিক ও ধ্বংসাত্মক অবরোধ থেকে মুসলিমদের জন্য বেশ কিছু উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) দীর্ঘ তিন বছর অমানবিক ও ধ্বংসাত্মক অবরোধের মধ্যে অমানবিক যন্ত্রণা সহ্য করেও বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব'র মুশরিকরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সঙ্গে ছিলেন এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হননি। তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সর্বদা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বিধায় তাঁর দাওয়াতকেও সত্য হিসেবে বিশ্বাস করেছেন। যেমন আবু তালিবের কথা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাওয়াতকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেননি।

খ) অন্যদিকে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে প্রতিকূল পরিবেশে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ইহকালের পরিবর্তে পরকালকে প্রাধান্য প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর নির্যাতন ও নিপীড়ন তুচ্ছ বিষয় হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে; কারণ মুসলিমগণ আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনকেই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

---

১) সীরাতে ইব্ন ইসহাক ও সীরাতে ইব্ন হিশামসহ অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে ঘটনাটি বর্ণীত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৮৬-৮৭।

হিজরতের অনুমোদন

দ্বীনের স্বাধীনতা রক্ষার্থে দেশ ত্যাগের অনুমোদন

দীর্ঘ পাঁচ বছর মক্কাহ নগরীতে দিবা-রাত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও কাঙ্খিত সফলতা তো দূরে থাক নিজেদের দ্বীন নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা অনেকটা অসম্ভব হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সাহাবীদের মক্কাবাসীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি সাহাবীদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করার পরামর্শ প্রদান করে বলেন: যদি তোমরা হাবশা'র দিকে বেরিয়ে পড়তে; যেখানে এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন যাঁর নিকট কেউ নির্যাতিত হয় না। যতক্ষণ না মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি প্রদান করেন।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই পরামর্শের পর নুবুয়্যতের পঞ্চম বর্ষে রজব মাসের শুরুর দিকে মুসলিমদের একটি দল নিজেদের দ্বীনের স্বাধীনতা সংরক্ষণে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন[১]। উসমান বিন মাযউন (র) এর নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন ওসমান বিন আফ্‌ফান (র) ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদ (স), আবু হুযাইফা (র) ও তাঁর স্ত্রী, যুবাইর বিন আল-আওয়াম (র), মুসআব বিন উমায়র (র), আবদুর রহমান বিন আউফ (র) এবং ওসমান বিন মাযউন (র)'র স্ত্রীসহ দশ জন পুরুষ ও চার অথবা পাঁচ জন মহিলার ১৪/১৫ জনের একটি দল[২]। এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম মুহাজির দল। কুরাইশ তাদের মাতৃভূমি ত্যাগের সংবাদ বিলম্বে জানার পর তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তাদের পিছু নেয়। কিন্তু তার পুর্বেই মাতৃভূমি ত্যাগকারী মুসলিম দল নিরাপদে হাবশায় পৌঁছে যায়। তবে মাত্র তিন মাসের মাথায় মক্কাবাসী এক বুঝাপড়ার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ জাতীয় এক অসমর্থিত সংবাদের ভিত্তিতে তারা মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছানোর পর অবগত হলেন যে, তারা ভুল সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর তাদের অনেকেই পুনরায় হাবশায় ফিরে গেলেও দুএকজন মক্কানগরীতে কারো আশ্রয়ে অথবা গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে ওসমান বিন মাযউন (র) আল-অলীদ বিন আল-মুগীরাহ'র আশ্রয়ে এবং আবু সালমাহ (র) আবু তালিব'র আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন[৩]।

হাবশার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের হিজরতটি ছিল অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে নুবুওয়্যতের দশম বর্ষের শেষের দিকে অথবা একাদশ বর্ষের শুরুর দিকে জাফর বিন আবী তালিব'র নেতৃত্বে ৮২ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলার একটি দল কুরাইশদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হন[৪]।

---

[১]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/৩২৮-৩৩০। বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/১৩০।

[২]) মুহাম্মদ আল-খাদ্বরামী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল ফাইহা, দামেস্ক, ১৪২৫ হিঃ, পৃ: ৫১।

[৩]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২।

[৪]) মুহাম্মদ আল-খাদ্বরামী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫। আরো বিস্তারিত দেখুন: মুসা বিন রাশেদ আল-আযেমী, আল-লুলু আল-মাকনূন ফী সীরাতে আন্নাবিয়্যিল মামুন, আল-মাকতাবাতুল আমেরিয়্যাহ, কুয়েত, ১৪৩২ হিঃ/২০১১ ইং, পৃ: ১/৩৭৩।

অতঃপর কুরাইশরা যখন মুসলিমদের হিজরত সম্পর্কে অবহিত হয় তখন এদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক উপঢৌকনসহ আবদুল্লাহ বিন রাবীআহ ও আমার বিন আল-আসকে হাবশা'র বাদশাহ নাজ্জাশী'র নিকট প্রেরণ করা হয়। তারা দু'জন নাজ্জাশী'র সাথে উপরিউক্ত বিষয়ে কথা বলার পর নতুন দ্বীন সম্পর্কে মুসলিমদের সাথে আলোচনা ব্যতীত তাদের হাতে মুসলিমদের কাউকে ফিরিয়ে দিতে হাবশা'র বাদশাহ নাজ্জাশী অস্বীকার করেন। অতঃপর কুরাইশদের দুই প্রতিনিধির সামনে মুসলিমদেরকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমাদের নতুন দ্বীন সম্পর্কে আমাকে বর্ণনা দাও যার কারণে তোমরা নিজের জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছ। আমার দ্বীনেও তোমরা প্রবেশ করলে না এবং অন্য কারো দ্বীনেও নয়?

অতঃপর মুসলিমদের পক্ষ থেকে জাফর বিন আবী তালিব (র) নাজ্জাশী'র প্রশ্নের উত্তরে এগিয়ে এসে বলেন: হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞ জাতি ছিলাম; মুর্তি বা প্রতীমার পূজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম, অশ্লীলতায় পড়ে থাকতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর অধিকার অবজ্ঞা করতাম। মূলত আমাদের মধ্যে শক্তিশালী দুর্বলকে গ্রাস করে চলতো; এমতাবস্থায় মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেন, যিনি বংশ মর্যাদায় অভিজাত, সৎ, বিশ্বস্ত, নিরাপরাধ ও নিষ্পাপ হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। অতঃপর তিনি আমাদেরকে আল্লাহ'র একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদত করতে আহবান করেন। আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাথর ও বিভিন্ন মুর্তির পূজা করতাম তা আমরা অন্তর থেকে ছুড়ে ফেলি। তিনি আমাদের সত্য বলা, আমানত আদায় করা ও আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং অশ্লীলতায় পড়ে থাকতে নিষেধ করেন ইত্যাদি.. আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তিনি যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার আনুগত্য করলাম। অতঃপর আমাদের জাতি আমাদের ওপর অত্যাচার করলো এবং আমাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে দেয় এবং আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে পুনরায় মুর্তি পূজার দিকে ফিরে যেতে আমাদেরকে বাধ্য করে... অতঃপর আমরা যখন নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত তখন আমরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনার দেশে আগমন করি। আপনাকে গ্রহণ করি এবং আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে চাই এবং আমাদের আশা আমরা আপনার নিকট লাঞ্ছিত হবো না[১]।

অতঃপর নাজ্জাশী জাফর বিন আবী তালিব (র) কে আল্লাহ'র রাসুল (স) আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার কিছু পাঠ করে শুনাতে বলেন। অতঃপর জাফর বিন আবী তালিব (র) সূরাহ মরয়মের প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালে নাজ্জাশী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারপর তিনি বলেন: নিশ্চয় এটি এবং ঈসা বিন মরয়ম যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুটোই একই সূতিকায় গাঁথা। তারপর তিনি কুরাইশদের প্রতিনিধিদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন: তোমরা চলে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে তোমাদের কাছে দিব না, না তারা তোমাদের সাথে যেতে সম্মত হবেন[২]।

---

[১]) মুসনাদ আহমদ [১৭৪২]। আরো বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/১৩০।

[২]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত,পৃ:৯১-৯৩। আরো বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/১৪৫।

পরে কুরাইশদের প্রতিনিধি দুজন ফিরে এসে নাজ্জাশীকে বললো: হে বাদশাহ! তারা ঈসা বিন মরয়ম সম্পর্কে বড় ধরনের আপত্তিকর কথা বলে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা ঈসা বিন মরয়ম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? অতঃপর জাফর বিন আবী তালিব বললেন: আমরা তাঁর সম্পর্কে বলি যা আমাদের মহানবী মুহাম্মদ (স) আমাদেরকে বলেছেন এবং তিনি বলেন: তিনি আল্লাহ'র বান্দা ও তাঁর সৃষ্টি করা আত্মা এবং তাঁর বাণী যা পবিত্র কুমারী মরয়মের উদরে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর নাজ্জাশী মাটির ওপর তাঁর হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং একটি লাঠি নিয়ে বলেন: আল্লাহ'র শপথ ঈসা বিন মরয়ম তুমি যা বলেছ তা ব্যতীত অন্য কিছু নন। তারপর তিনি মক্কার প্রতিনিধিদের তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলিমদের প্রতি তাঁর সুদৃষ্টি বৃদ্ধি করে দিলেন[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তাঁর সাহাবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে হাবশাকে মনোনিত করার কারণসমূহ যেমন:

১) হাবশার ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নাজ্জাসী; যার নিকট কেউ অহেতুক অবিচারের শিকার না হওয়া।

২) হাবশায় আরব গোত্রের অনুপস্থিতির কারণে কুরাইশদের প্রভাবমুক্ত থাকা।

৩) হাবশাবাসী আহলে কিতাব তথা খৃষ্টধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে মুসলিমদের প্রতি সদয় হওয়া ইত্যাদি।

উপরিউল্লেখিত কারণসমূহ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র তাঁর সাহাবীদেরকে কুরাইশ বা মক্কাবাসীর নির্যাতন থেকে সুরক্ষা প্রদানর জন্য তিনি হাবশাকে মুসলিমদের মাহজর বা হিজরতের স্থান হিসেবে মনোনীত করেননি। এর পিছনে আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে যা তখন দৃশ্যমান ছিল না। মক্কাবাসীর নির্যাতন থেকে সুরক্ষা প্রদানই যদি মৌলিক উদ্দেশ্য হতো তাহলে মুহাজিরদের মধ্যে বেলাল (র), আম্মার (র) ও সুহাইব (র)'র মতো নির্যাতিত সাহাবীদের সংখ্যা বেশি থাকতো। কিন্তু বাস্তবে মুহাজিরদের দলে ওসমান বিন আফফান (র), আবদুর রহমান বিন আউফ (র), ওসমান বিন মাযউন (র) ও যুবাইর বিন আল-আওয়াম (র)'র মতো মক্কাহ'র অভিজাত ও ব্যবসায়ীদের সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া মক্কাবাসীর নির্যাতন থেকে মুসলিমদেরকে সুরক্ষা প্রদান আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিলেও যাঁরা হাবশায় হিজরত করেছেন তাঁদেরকে বদর, বনু কায়নুকা, উহুদ, বনু নযীর, আহযাব ও বনু কুরাইযাহ'র যুদ্ধ এবং হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত মদীনায় ফিরিয়ে আনা হয়নি। যদিও বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য লোকবলের যথেষ্ট ঘাটতি ছিলো। অর্থাৎ মক্কাহ থেকে দূরে অবস্থানের কারণে মুসলিমদের কুরাইশ বা মক্কাবাসীর নির্যাতনের প্রভাবমুক্ত রাখার পাশাপাশি পূর্ব থেকে হাবশা বানিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ার কারণে মুহাজিরদের মাধ্যমে বানিজ্যিক তৎপরতা সৃষ্টি করে মুসলিমদের আর্থিক সমস্যা নিরসন করাও অন্যতম কারণ। সর্বোপরি নাজ্জাশীর সহযোগিতায় হাবশাকে মুসলিমদের বিকল্প প্রতিরক্ষা শক্তি বা অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা; যাতে করে পরবর্তীতে কোনো কারণে মদীনার পতন হলে হাবশাকে ইসলামী রাষ্ট্রের

[১]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/৩৬৭। আরো বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারী,প্রাগুক্ত: ৭/১৫৪।

প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়[১]। সুতরাং আহযাব যুদ্ধের সমাপ্তির পর বনু কুরাইযাহকে বিতাড়নের মাধ্যমে মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ার পর সপ্তম হিজরীতে আমর বিন উমাইয়াহ দ্বামরীকে পাঠিয়ে হাবশায় অবস্থানরত মুসলিম মহাজিরগণকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হয়[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি প্রথম প্রতিনিধি

মক্কায় আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ অমানবিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলেন; এমতাবস্থায় মক্কাহ'র বাহির থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য একদল প্রতিনিধি আগমন করেন। ত্রিশ জনের অধিক হাবশাহ'র খৃষ্টানদের একটি দল জাফর বিন আবী তালিব (র)'র সাথে মক্কাহ আগমন করেন। তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আসলেন এবং তাঁর সম্পর্কে অবগত হলেন। অতঃপর কুরআন করীমের তেলাওয়াত শুনে তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জাহ্ল যখন এই বিষয়ে অবগত হলো সে তাঁদের কাছে এসে বললো: তোমাদের চেয়ে বোকা কোনো প্রতিনিধিদল আমরা দেখিনি!... তোমাদের স্বজাতি তোমাদের পাঠিয়েছিল এই লোক সম্পর্কে জানতে; আর তোমরা তাঁর সাথে বসা মাত্রই তোমাদের দ্বীন ত্যাগ করে সে যা বলেছে তা বিশ্বাস করে ফেলেছ। অতঃপর তাঁরা উত্তরে আবু জাহ্লকে বললেন: তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা পরস্পরকে অজ্ঞ অনুমেয় করবো না। আমাদের দ্বীন নিয়ে আমরা থাকি এবং তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে থাকো; তবে আমরা কল্যাণ-বঞ্চিত হইনি[৩]।

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল:{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ}[কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াব ভালো দিয়ে দেয় এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে; তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে: আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম; আমরা

---

[১]) সাইয়েদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, দারুস শুরুক, ১৯৮০ ইং/১৪০০ হিঃ :১/২৯। আরো বিস্তারিত দেখুন: মুনীর আল-গাদ্ববান রচিত আল-মানহাজুল হারাকী লিস-সীরাহ, মাকতাবাহ আল-মানার, জর্ডান, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ ইং;১/৬৭-৬৮।

[২]) সুলায়মান আল-আওদাহ, আল-হিজরাহ আল-উলা; পৃ:৩৪। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: রাগিব আস-সারজানী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, পৃ:১৭২-১৭৬।

[৩]) ঘটনাটি ইব্ন ইসহাক, মুকাতিল এবং তাবারী সাঈদ ইব্ন জুবাইর'র বরাতে স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৪-৯৫।

অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না][১]।আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় উপরিউক্ত প্রতিনিধি দলের আগমনের কারণে সুস্পষ্টভাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হয়:

ক) মুসলিমগণ যখন সর্বত্র লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত অসহায় এবং প্রতিকুল অবস্থায় নিষ্পেষিত তখন ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য সুদূর হাবশা থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ত্রিশ জনের অধিক অপর বর্ণনায় চল্লিশের অধিক প্রতিনিধি দলের আগমন নতুন দ্বীনের মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি ইসলামের শত্রুদের এই বার্তা পৌঁছিয়ে দেয় যে, তোমারা মুসলিমদের যতই লাঞ্ছনা দাও, নিপীড়ন ও নির্যাতন করো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো তাঁদের রুখতে পারবে না; বরং সমগ্র পৃথিবীতে নতুন দ্বীনের প্রচার-প্রসার সকল বাধা-বিপত্তি পেছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

সম্ভবত আবু জাহ্ল এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বিধায় ভাষা প্রয়োগে অরবদের আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে বিদেশী প্রতিনিধি দলের প্রতি কটুক্তি করতে তার শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে মার্জিত ও শালীন ভাষা ব্যবহারে সক্ষম হয়নি। কারণ সে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলিমদের এই ছোট্টদলকে রুখে রাখা সম্ভব নয়।

খ) উপরিউক্ত প্রতিনিধি দলের আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের প্রতি ঈমানের ঘোষণা প্রদান থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা নিজেদের দ্বীন ত্যাগ করে নতুন কোনো দ্বীন গ্রহণ করেননি; বরং ঈসা (আ) তাঁদের প্রতি যেই দ্বীন ও আসমানী বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তারই পুর্ন:সংস্কার তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ঈসা (আ) যেই পথ প্রদর্শকের গুনাবলী ও বৈশিষ্টসহকারে ইঞ্জীল নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই মুহাম্মদ (স)'র প্রতিই তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং এটি ছিল পরিপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত। যার বর্ণনা কুরআন করীমে এভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে:{ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ}[যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম][২]।

সুতরাং ইসলাম পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে বিশ্বাসীদের প্রতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল যে, তাঁরা যেন তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমুহে (তাওরাত ও ইঞ্জীল) নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়ন করে; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হয়েছে:{ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}[বলে দিন; হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবর্তীণ হয়েছে তা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা না করো][৩]। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন শুধুমাত্র

---

১) সূরাহ আল-কাসাস:৫২-৫৫।

২) সূরাহ আল-কাসাস:৫৩

৩) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৬৮।

ইসলাম; তবে এর বিধান ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে যা যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে বিধায় পূর্ববর্তী শরীয়াহ (বিধান) পরবর্তী শরীয়াহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

শোকবর্ষ

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির দশম বছরকে সীরাতবিদগণ শোকবর্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ এই বর্ষে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রিয় স্ত্রী খদীজাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বিপদে-আপদে সহয়তা প্রদানকারী মমতাময় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু হয়। দুটো শোকাবহ ঘটনা এক মাস পাঁচ দিনের ব্যবধানে ঘটেছে[১]; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষে সহ্য করা অনেক কঠিন ছিল এবং তাঁকে খুবই ব্যথিত করে।

সীরাতবিদ ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে খদীজাহ ছিলেন ইসলামের সত্যায়নের প্রথম প্রতিক যাঁর নিকট আল্লাহ'র রাসুল (স) দাওয়াতী কাজে বিভিন্ন অসহায়ত্বের অভিযোগ করলে ভালোবাসা ও সান্ত্বনা পেতেন। আর আবু তালিব ছিলেন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাওয়াতী কাজে সাহায্যকারী ও রক্ষাকবচ এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক[২]। সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে অসদাচরণের সুযোগ পেয়ে যায়, আবু তালিবের জীবদ্দশায় যা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন কি কুরাইশদের এক নির্বোধ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর এক মেয়ে কান্নারত অবস্থায় তা ধুয়ে দিচ্ছেলেন; তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছিলেন: মা কেঁদো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার বাবাকে রক্ষা করবেন[৩]।

এক মাসের ব্যবধানে দুইটি শোকাবহ ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনে প্রচন্ড নাড়া দেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই কঠিন সময়ে ঘরে সান্ত্বনা প্রদানকারী স্ত্রী ও বাহিরে শত্রুর আক্রমণ ও অসদাচরণের হাত থেকে রক্ষাকারী চাচার মৃত্যুর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক) আল্লাহর রাসুল (স)'র চাচা আবু তালিব যদি ভাতিজাকে মুশরিকদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জীবিত থাকতো তখন কারো মনে এই সন্দেহ আসতে পারতো যে, চাচা তাঁর ভাতিজার দ্বীনের অংশীদার না হলেও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় চাচার কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে এবং সর্বদা চাচা ভাতিজাকে প্রতিরক্ষা দিয়ে আসছিল বলে ধারণা করা হতো। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মহান রাব্বুল আলামীন চাচার মৃত্যুর মাধ্যমে সেই সন্দেহের নিরসন করলেন।

খ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে আরো শিক্ষা দিলেন যে, বিজয়, সহযোগিতা ও সমর্থন কোনোটাই কোনো মানুষের পক্ষ থেকে হয় না; বরং তা সম্পূর্ণ আল্লাহ'র পক্ষ থেকেই আসে বিধায় তাঁর রাসুল (স) কে মুশরিক ও শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হয়েছে:{ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন][৪] বিধায় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এরশাদ হচ্ছে:{ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ

---

[১]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:১/১৮৭।

[২]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/১৬৪।

[৩]) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত: ১/২৪৮। আরো বিস্তারিত দেখুন: তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/৫৪৪।

[৪]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৬৭।

الْمُشْرِكِينَ*إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ{[অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন; যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট][১] এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন:} وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ{[আমি নিশ্চিত জানি যে, তাদের কথাবার্তায় আপনার বক্ষ সঙ্কোচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি রব এর প্রসংশাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন ও সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হোন এবং আপনার রব এর ইবাদত করতে থাকুন; যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) না আসে][২]।

আল্লাহ প্রদত্ত সেই অঙ্গীকার সত্ত্বেও পদে পদে আল্লাহ'র রাসুল (স) যথেষ্ট পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) যদি কোনো পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ ব্যতীত তাঁর দাওয়াতে সফলকাম হতেন তাহলে তাঁর সাহাবীগণ ও পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম জাতি দাওয়াতী কাজে কোনো রকম নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতো না। পাশাপাশি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে আরো শিক্ষা দিলেন যে, দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি নতুন কোনো বিষয় নয়; সুতরাং মন খারাপ করার কিছু নেই বরং ইতিপূর্বে সকল নবী-রাসুলগণ নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কুরআন করীমে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে:} قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ{[আমরা নিশ্চিত জানি যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং জালিমরা আল্লাহ'র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। আপনার পূর্ববর্তী অনেক রাসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাঁরা এতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ'র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে রাসুলগণের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়; তবে আপনি যদি ভূতলে কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোনো সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। অতঃপর তাদের কাছে কোনো একটি নিদর্শন; তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না][৩]।

---

[১]) সূরাহ আল-হিজ্‌র:৯৪-৯৫।

[২]) সূরাহ আল-হিজ্‌র:৯৭-৯৯।

[৩]) সূরাহ আল-আনআম:৩৩-৩৫।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তায়েফ অভিযাত্রা

আবু তালিব উপত্যকায় প্রায় দীর্ঘ তিন বছর অমানবিক অবরোধ, খদীজাহ (র) ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কাবাসীর লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও নিপীড়নে অনেকটা অতিষ্ট হয়ে কুরাইশদের পর সবচেয়ে বীর, যোদ্ধা ও সম্পদশালী আরবগোত্র বনু সাকীফ ও বনু হাওয়াযিনের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স) অতি গোপনে নিজ মুক্তদাস যায়দ বিন হারিছাহ'কে নিয়ে তায়েফ অভিমুখী যাত্রা করেন। কুরাইশদের সাথে তায়েফবাসীর সুসম্পর্কের কারণে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাওয়াত সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল বিধায় তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আহবানে সাড়া তো দেয়নি; বরং তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি অসদাচারণ করলো। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদেরকে তাঁর তায়েফ আগমনের কথা মক্কাবাসীর নিকট গোপন করার অনুরোধ করেছিলেন; যেন মক্কাবাসী দাওয়াত সম্পর্কে ঠাট্টা আরো বৃদ্ধি না করে। তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুরোধ তো রাখলই না বরং তারা উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কিশোর ও দাসদের দিয়ে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিয়েছে। যায়দ বিন হারিছাহ নিজের শরীর দ্বারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)ও রক্তাক্ত হন[১]।

তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সঙ্গীকে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করতে থাকে। শেষ পর্যান্ত তাঁরা দুজন উৎবাহ বিন রাবীআহ ও শায়বাহ বিন রাবীআহ'র বাগানের প্রাচীরের পাশে পৌঁছান। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার কারণে আল্লাহ'র রাসুল (স) উৎবাহ ও শায়বাহ'র বাগানে আশ্রয় নেয়া ভালো মনে করলেন না। অতঃপর পার্শ্ববর্তী একটি বৃক্ষের নীচে শান্ত হয়ে বসে মাথা উচু করে উপরের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করেন:{ اللّٰهُمَّ إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وأصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخظك، لك العتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا بك}[হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আমার দুর্বলতা ও কৌশলের ব্যপারে এবং মানুষের কাছে আমার অবমূল্যায়নের অভিযোগ করছি, হে মহা দয়াময় প্রভু আপনি আমার এবং অসহায়দের প্রভু, কার ওপর আমার নির্ভরতা ছেড়ে দিব? যদি আমার ওপর আপনার রাগ না থাকে তাহলে তা নিয়ে আমার খুব একটা ভাবনা নেই। আমার প্রতি আপনার ক্ষমা প্রদর্শন অনেক বেশি প্রসস্ত। আমি আপনার ঐ চেহেরার আলো যার দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত হয়ে আলোর উদ্ভব ঘটে তার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; যার ওপর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। যেন ক্রোধ ও শাস্তি আমাকে স্পর্শ না করে। আপনার প্রতিই আমার আবেদন যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হোন আর আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থলও নেই কোনো শক্তিও নেই][২]।

---

[১]) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:১/১৯৬।

[২]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১০০-১০২। আরো বিস্তারিত দেখুন: আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ আস-সহীহাহ, প্রাগুক্ত:১/১৮৬।

রাবীআহ'র দুই ছেলে উৎবাহ ও শায়বাহ নিজেদের বাগান থেকে উপরিউক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের অন্তরে মায়া-মমতাবোধ জেগে উঠে। তারা আদ্দাস নামক তাদের এক খৃষ্টান দাসকে একটি পাত্রে কিছু আঙ্গুর দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট পাঠায়। অতঃপর আদ্দাস আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে আঙ্গুরের পাত্র রেখে তাঁকে খেতে বললে আল্লাহ'র রাসুল (স) বিসমিল্লাহ বলে খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালে আদ্দাস আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বলে: আল্লাহ'র শপথ এই অঞ্চলের লোক তো এই কথা বলেন না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে জিজ্ঞাসা করে বলেন: তুমি কোথাকার লোক? তোমার দ্বীন কী? উত্তরে সে বললো: আমি খৃষ্টান, আমি নিনাওয়া (ইরাকের মোসলের পার্শ্ববর্তী) অঞ্চলের। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে বলেন: তুমি ইউনুস বিন মাত্তা (আ)'র অঞ্চলের লোক। অতঃপর আদ্দাস বললো: আপনি ইউনুস বিন মাত্তা (আ) সম্পর্কে কী জানেন? অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী...অতঃপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দিকে ঝুকে মাথা, হাত ও পদচুম্বন করলো[১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) যায়দ বিন হারিছাহ'কে নিয়ে ফিরে এসে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছে পোষণ করলে যায়দ বিন হারিছাহ বলেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি কীভাবে তাদের কাছে যাবেন; তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন হে যায়দ! তুমি দেখবে আল্লাহ কোনো একটি পন্থা বের করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স) কে বিজয়ী করবেন ও তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করবেন। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রথমে আল-আখনাস বিন শারীকের নিকট আশ্রয় প্রদানের সংবাদ পাঠালেন। উত্তরে সে বললো: আমি কুরাইশের মিত্র। মিত্র মিত্রের বিরুদ্ধে আশ্রয় প্রদান করে না। অতঃপর সুহাইল বিন আমরের নিকট আশ্রয় প্রদানের সংবাদ পাঠালেন। উত্তরে সে বললো: বনু আমের বনু কাআবের বিরুদ্ধে আশ্রয় প্রদান করে না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) খুযাআহ গোত্রের এক লোককে মুতঈম বিন আদী (বনু নাওফাল বিন আবদে মনাফ গোত্রের নেতা)'র নিকট প্রেরণ করে তাঁর আশ্রয়ে মক্কাহ প্রবেশের ইচ্ছে পোষণ করার কথা জানালে মুতঈম সম্মত হন এবং তিনি তাঁর পুত্র ও তাঁর গ্রোত্রের লোকদের অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বায়তুল্লাহ'র চারপার্শ্বে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন: আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করেছি। অতঃপর মুহাম্মদ (স) ও যায়দ বিন হারিছাহ মক্কাহ নগরীতে প্রবেশ করে মসজিদে উপস্থিত হলে মুতঈম বিন আদী অশ্বারোহী অবস্থায় দাড়িয়ে ঘোষণা দেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করেছি; সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) রুকনে ইয়ামনীতে এসে দুই রাকআত নামায আদায় করে কুরাইশদের নাকের ডগায় নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। মুতঈম ও তাঁর পুত্ররা স্বশস্ত্র পাহারায় দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুতঈম বিন আদী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৪২০।

অতি বিচক্ষণতার সাথে একটি অসম্মানজনক ঐতিহাসিক ঘটনার পুনারাবৃত্তি রুখে দিলেন[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এ পদক্ষেপের কারণে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়; কুরাইশদের ধারণা ছিল, তায়েফের ঘটনার পর অপদস্থ, অপমানিত ও অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু কুরাইশদেরই একজন নেতা রীতিমতো গার্ড অব অনার দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মক্কায় নিয়ে আসেন। গোপনে নয়, কুরাইশদের নাকের ডগায় নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এ দুটি নির্বাচনে (খুযাআহ গোত্রের একজনকে দূত নির্বাচন ও নিরাপত্তাদানের জন্য মুতঈম বিন আদীকে নির্বাচন) বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ও গভীর কূটনৈতিক দক্ষতার। কারণ নাওফাল (বনু নাওফাল বিন আবদ মনাফ গোত্রর অধ:স্তনপুরুষ মুতঈম বিন আদী তখন যার নেতৃত্ব দিচ্ছে) জাহেলী যুগে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাদা আবদুল মুত্তালিবের প্রতিপক্ষ ছিল। অতঃপর সে আবদুল মুত্তালিবের কিছু অনাবাদি ভূমি জবর দখলে নিয়ে নিলে আবদুল মুত্তালিব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তিনি তাঁর গোত্রকে নাওফলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন;কিন্তু তাদের কোনো বড় নেতাই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। অতঃপর তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার বংশের তাঁর মামাদের উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা রচনা করে তাঁদের সাহায্য কামনা করেন। বনু নাজ্জারের লোকজন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কাবার আঙিনায় উটারোহীদের দল নিয়ে বড় ধরনের সমাবেশ জমায়। এক সঙ্গে এত লোকের ভিড় দেখে নাওফল ভয় পেয়ে যায় এবং এখানে তাদের ভিড় জমানোর কারণ জিজ্ঞাসা করে তাদের আগমনের কারণ জেনে আবদুল মুত্তালিবের ভূমি ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে খাযরাজ গোত্রকে আবদুল মুত্তালিবের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখে খুযাআহ গোত্র -যারা ছিল খুবই শক্তিশালী ও বলবান-বললো: আল্লাহ'র শপথ! আমরা এই উপত্যকায় এই লোকটির চেয়ে সুন্দর চেহারা, চারিত্রিক সুষমায় অনন্য ও সহনশীল ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। খাযরাজ গোত্রের তাঁর মামারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসলো। তিনি খাযরাজ গোত্রের মতো আমাদেরও আত্মীয়। কারণ তাঁর দাদা আবদ মোনাফ খুযাআহ গোত্রের নেতা হালীল বিন হাবশিয়াহ'র মেয়ে হুব্বার পুত্র। আমরা যদি তাঁকে সহযোগিতা করি এবং তাঁর সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হই, আমরা তাঁর এবং তাঁর গোত্র দ্বারা উপকৃত হবো এবং তিনিও আমাদের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

অতঃপর তারা তাঁর কাছে এসে বললো: হে হারিসের পিতা (আবদুল মুত্তালিবের উপনাম)! বনু নাজ্জারের মতো আমরাও আপনার পূর্বপুরুষ এবং আমরা একই অঞ্চলের প্রতিবেশী। কুরাইশদের সম্পর্কে আমাদের কারো কারো মনে যা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল তা যুগের বিবর্তনে মুছে গেছে। আসুন আমরা একে অপরের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হই। তাদের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব পেয়ে আবদুল মুত্তালিব যেন হাতে আকাশের চাঁদ

---

[১]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৩৮১। আরো বিস্তারিত দেখুন: আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২০৩-২০৪।

পেয়ে যান; সুতরাং বিলম্ব না করে প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। কিন্তু এই মিত্রতার বন্ধনে আবদ শামস ও নাওফাল গোত্রের কেউ উপস্থিত হয়নি[১]।

উপরিউক্ত বিষয়টি কুরাইশ ও খুযাআহ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার ঐতিহাসিক বিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন কুরাইশদের অবিসংবাদী নেতা কুসাই বিন কিলাব বিক্ষিপ্ত কুরাইশদের একত্রিত করে তাদের নিয়ে যুদ্ধ করে খুযাআহ গোত্রকে বায়তুল্লাহ'র তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করে পবিত্র মক্কাহ নগরীকে কুরাইশদের মধ্যে অঞ্চল ভিত্তিক বন্টন করে দেয়। তখন থেকে কুরাইশদের সাথে খুযাআহ গোত্রের শত্রুতার সূচনা হয়। এর পর যখন কুরাইশ আবদুল মুত্তালিবের বিপদে সাড়া দিল না, তখন সুযোগটা কাজে লাগিয়ে খুযাআহ গোত্র সহযোগিতার নামে এগিয়ে আসে এবং আবদুল মুত্তালিবের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবদুল মুত্তালিবের সাথে মিত্রতা স্থাপন ছিল তাদের মুখোশ। মূল উদ্দেশ্য হলো কুরাইশদের ধীরে ধীরে দুর্বল করে পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। খুযাআহ'র দাবী "কুরাইশদের সম্পর্কে তাদের কারো কারো মনে যা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল তা যুগের বিবর্তনে মুছে গেছে" তা সত্য নয়; বরং তা এখনো বিদ্যমান। এই মিত্রতার বন্ধনে আবদ শামস ও নাওফল গোত্রের অনুপস্থিতি থেকে তা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স) মুতঈম বিন আদী'র নিকট খুযাআহ গোত্রের লোক দূত হিসেবে পাঠিয়ে পূর্বের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রয়োজনে তিনিও তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মতো খাযরাজ গোত্রের কাছে সাহয্যের আবেদন করবেন অথবা খুযাআহ গোত্রের সাথে মৈত্রীবদ্ধ হবেন। নাওফল গোত্রের নেতা মুতঈম বিন আদী তা বুঝতে পেরে দ্রুত তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তার স্বসস্ত্র পুত্রদের পাহারায় আল্লাহ'র রাসুল (স) বীরের ন্যায় কুরাইশদের নাকের ডগায় মক্কাহ প্রবেশ করেন। কুরাইশ মুতঈম বিন আদির স্বসস্ত্র পুত্রদের ভয়ে নয়, খুযাআহ'র অস্ত্র ও খাযরাজের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে চুপসে যায়[২]।

মুতঈম বিন আদী'র এই ভূমিকা ও কুরাইশদের আরোপিত আল্লাহ'র রাসুল (স) সহ মুসলিমদের আবু তালিব উপত্যকার অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ'র রাসুল (স) তা ভুলে যাননি। বরং তিনি বদর যুদ্ধে ৭০ জন যুদ্ধবন্দির মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে বলেছিলেন: আজ যদি মুতঈম বিন আদী জীবিত থাকতো এবং এই আবর্জনার ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতো আমি অবশ্যই তার সৌজন্যে এদেরকে মুক্তি দিতাম[৩]।

তায়েফ অভিযাত্রার শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তায়েফ অভিযাত্রা এবং উক্ত সফরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মুখোমুখী হওয়া ও পুনরায় মক্কাহ ফিরে আসার মতো

---

১) বলাযুরী, আনসাবু আল-আশরাফ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, দারুল মাআরিফ, মিশর (প্রকাশনা তারিখ ব্যতীত):১/৭১।

২) আবদুল কাদির হামীদ আত্তাজানী, উসুলুল ফিকরিস সিয়াসী ফীল কুরআনিল মক্কী, দারুল বশীর, আম্মান, জর্ডান, প্রথম প্রকাশ:১৪১৬ হিঃ/১৯৯৫ ইং, পৃ:১৮০।

৩) সহীহ বুখারী [৪০২৪]।

ঘটনাপ্রবাহে মুসলিম জাতি বিশেষ করে যারা দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) আল্লাহ'র রাসুল (স) তায়েফ অভিযাত্রায় যে অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মুখোমুখী হয়েছিলেন তা অবশ্যই দাওয়াতের একটি অংশ বিশেষ। তিনি আমাদের যেমন সৃষ্টিজগত ও স্রষ্টা সম্পর্কে আক্বীদাহ-বিশ্বাস, ইবাদত, চারিত্রারিক বৈশিষ্ট ও পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন; তেমনি তায়েফ অভিযাত্রায় সংঘটিত ঘটনাসমূহের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যধারণের শিক্ষা প্রদান করেন। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং ধর্যধারণে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে তাকওয়া করতে থাকো; যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফল হতে পারো][1]। অর্থাৎ তিনি সমগ্র মুসলিম জাতি তথা দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত লোকদের ধৈর্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যে, যেমন তোমরা আমার কাছ থেকে নামাযের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছ{صلوا كما رأيتموني أصلي}[তোমরা নামাজ আদায় করো যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছ] এবং {خذوا عني مناسككم}[তোমারা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্বের রীতিনীতি গ্রহণ করো] অনুরূপভাবে উপরিউক্ত ঘটনার মাধ্যমে তিনি যেন বলেছেন:{اصبروا كما رأيتموني أصبر}[তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যেমন প্রতিকূল অবস্থায় আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে দেখেছ]।

খ) রাবীআহ'র পুত্রদ্বয় উৎবাহ ও শায়বাহ'র বাগানের নিকটে পৌঁছে আল্লাহ'র রাসুল (স) যে প্রার্থনা করেছিলেন তা থেকে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) অসহায় ও অধৈর্য হয়ে আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন; কিন্তু বাস্তবে তা নয় বরং তিনি সেই অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন এবং ধৈর্যসহকারে তা সহ্য করেছিলেন বিধায় বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াযিনের উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কিশোর ও দাসদের অসদাচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিবরীলে আমীনের পাহাড়চাপা দিয়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তাবকে এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, ..আমি আশা রাখি আল্লাহ যেন তাদের ঔরষজাত সন্তানদের মধ্যে এমন একটি দল আবির্ভূত করেন যারা এক আল্লাহ'র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না[2]।

গ) প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কখনো এমন সান্ত্বনার আবির্ভাব ঘটে যা মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। যেমন রাবীআহ তনয়দ্বয় উৎবাহ ও শায়বাহ ইসলামের কঠিন শত্রু অভিজাত কুরাইশ, তারা এক সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে নিশ্বেষ করে দিতে আবু তালিবের কাছে গিয়েছিল। তাদের হৃদয়ের হিংস্রতা মানবতায় রূপান্ত্রিত হলো এবং তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জন্য আঙ্গুর পাঠিয়েছিল; যা অবিশ্বাস্য। পাশাপাশি আল্লাহ'র রাসুল (স) যেখানে স্বজাতি কর্তৃক নুবুওয়্যতের দাবির কারণে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত

---

[1]) সূরাহ আলে ইমরান:২০০।

[2]) সহীহ বুখারী [৩২৩১]।

হয়েছেন; সেখানে বহিরাগত খৃষ্টান আদ্দাস আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নবী পরিচিতির পর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তাঁর পদচুম্বনে ঝুকে পড়ে।

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট মিশরীয় লেখক মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী বর্ণনা করেন যে, কী আল্লাহ'র রহস্য! নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কত দ্রুত কল্যাণ ও মর্যাদা আলিঙ্গন করেছে। রাবীআহ তনয়দ্বয়ের আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের ভবিষ্যত উচ্ছৃঙ্খলতার নয়, চিন্তা-চেতনার। বহিরাগত খৃষ্টান আদ্দাস কর্তৃক আল্লাহর রাসুল (স)'র পদচুম্বন থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ইসলামের প্রতি খৃষ্টধর্মের আনুগত্যের মাধ্যমে প্রমাণিত একটি আসমানী দ্বীনের সমর্থনে অন্য আসমানী ধর্ম ভাতৃত্বের বন্ধনের মতো এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত। পার্থক্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি রক্তের আর দ্বীনের ভিত্তি বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে[১]।

ঘ) যায়দ বিন হারিছাহ নিজের মাথা ফাটিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য দাওয়াতী ময়দানের নেতৃত্বের প্রতিরক্ষার পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সাহাবীগণ এর প্রমাণ একাধিকবার প্রদর্শন করে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

ঙ) যায়দ বিন হারিছাহ'র প্রশ্নের "হে আল্লাহর রাসুল (স)! আপনি কীভাবে তাদের কাছে যাবেন? তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে" আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উত্তর "হে যায়দ! তুমি দেখবে আল্লাহ কোনো পন্থা বের করে দিবেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স) কে বিজয়ী করবেন ও তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করবেন" থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁকে অসহায়ত্ব ও নৈরাশ্য গ্রাস করতে পারেনি; বরং তিনি কঠিন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাহাবীদের সামনে আশার আলো দেখিয়েছেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র জন্য শিক্ষা হলো প্রতিকূল অবস্থায় অসহায় ও নিরাশ না হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

---

[১]) মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী, অহয়ুল কালম, মাকতাবা মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৭,পৃ:২/৩০।

ইস্‌রা ও মিরাজ অনন্য মুজিযাহ

ইস্‌রা ও মিরাজ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাসমূহের অন্যতম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুলকে বায়তুল্লাহ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিভ্রমণ করিয়েছিলেন তাকে ইস্‌রা বলা হয়। আর মসজিদে আক্‌সা থেকে সৌরজগতসহ মানবজাতি, জ্বিনজাতি, ফেরেস্তাসহ সকল সৃষ্টির জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বজগতে সশরীরে পৌঁছানোর নাম মিরাজ এবং তা সবই ঘটেছে একটি মাত্র রাতে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তারিখ নিয়ে মতোবিরোধ রয়েছে। তবে নুবুওয়্যত প্রাপ্তির দশম বা একাদশ বর্ষে বিশেষ করে খদীজাহহ (র) ও আবু তালিব এর মৃত্যুর পর সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

ইস্‌রা ও মিরাজের বিবরণ

বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালিক (র) থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের বর্ণনার আলোকে তা নিম্নরূপঃ [আল্লাহ'র রাসুল (স) মিরাজের রাত্রে মসজিদে হারামে (হাতীমে অথবা হিজরে) ঘুমিয়েছিলেন। ফেরেস্তাগণ তাঁকে উঠিয়ে যমযম কূপের নিকটে নিয়ে আসলেন। অতঃপর জিবরীল আমীন তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃদয় বের করে স্বর্ণের একটি পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে ঈমান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করলেন। অতঃপর আমার কাছে বুরাক নিয়ে আসা হলো; যেটি গাধা অপেক্ষা উচু এবং খচ্চর অপেক্ষা নীচু দীর্ঘাঙ্গী সাদা দ্রুতগামী প্রাণী, যার চলার গতি এক পা এখানে তো অন্য পা দৃষ্টির শেষপ্রান্তে পড়ে। অতঃপর তাতে আরোহী হয়ে দ্রুতগতিতে বায়তুল মাকদিস পৌঁছালাম। অতঃপর বাহনটি সেই আংটায় বাঁধলাম যেখানে পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁদের বাহন বাঁধতেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম, সেখানে দু'রাকআত নামায আদায় করলাম[১]। তারপর মসজিদে আকসা থেকে বের হলাম। অতঃপর জিবরীল আমীন আমার জন্য এক পাত্রে মদ ও অন্য পাত্রে দুধ নিয়ে আসলেন; আমি দুধ গ্রহণ করলাম। অতঃপর জিবরীল আমীন বললেনঃ আপনি স্বভাবজাতবস্তু গ্রহণ করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে উর্ধ্বাকাশে রওনা হলেন। অতঃপর জিবরীল আমীন প্রথম আসমানের দরজা খোলার আবেদন জানালে জিজ্ঞাসা করা হয়; আপনি কে? তিনি বললেন জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলোঃ তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কি বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেনঃ তাঁকে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলোঃ শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [আসমানবাসী তাঁকে নিয়ে আনন্দিত হলো অথচ পৃথিবীতে আল্লাহ'র ইচ্ছা সম্পর্কে আসমানবাসী জানেন না; যথক্ষণ না তাদেরকে জানানো হয়][২]। অতঃপর পৃথিবীর আসমানে আদম (আ) কে পান। [অতঃপর জিবরীল আমীন বললেনঃ ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন। অতঃপর তাঁকে সালাম প্রদান করা হলো এবং আদম (আ) সালামের উত্তর প্রদান

---

১) অন্য বর্ণনায় সেখানে আমার সম্মানে পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণকে সমবেত করা হয়েছিলো। অতঃপর জিবরীল আমীন আমাকে এগিয়ে দিলেন এবং তাঁদের নিয়ে নামায আদায় করলাম। সুনান নাসায়ী [৪৫০] ও মুসনাদ আহমদ [২৩২৪]। ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বললেও বিশিষ্ট হাদীসবিদ ও মুসনাদ আহমদের সম্পদনাকারী শুআইব আরনাউত হাদীসটি দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২) সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এই অংশটি নেই।

করলেন এবং বললেন: স্বাগতম হে আমার বৎস, উত্তম ছেলে আপনি][১]। [অতঃপর পৃথিবীর আকাশে প্রবাহমান দুটি নদী দেখে জিবরীল আমীন কে জিজ্ঞাসা করলেন: এ দুটি কোন নদী? তিনি বললেন: নীল ও ফুরাত'র উৎসস্থল। তারপর জিবরীল আমীন তাঁকে নিয়ে আসমানে যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি আরো একটি নদী পেলেন পাশেই রয়েছে মণি-মুক্তার নির্মিত প্রাসাদ। অতঃপর তিনি তাঁর হাতে আঘাত করলে সেটি মিসক আযফারে পরিণত হলো। তিনি বললেন: হে জিবরীল! এটা কী? এটি আল-কাউসর যেটি আপনার রব আপনার জন্য গোপনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন][২]। তারপর আমাদের নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে ঊর্ধ্বগমন হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কি বার্তা পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন: তাঁকে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [সেখানে দুই খালাতো ভাই ঈসা বিন মরয়ম (আ) ও ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়্য (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তাঁরা দুজনে আমাকে স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন][৩]। তারপর আমাদের নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে ঊর্ধ্বগমন হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁর কাছে কি বার্তা পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [সেখানে ইউসুফ (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাঁকে যেন সকল সৌন্দর্যের অর্ধেক প্রদান করা হয়েছে। তিনি স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন][৪]। তারপর আমাদের নিয়ে চতুর্থ আসমানের দিকে ঊর্ধ্বগমন হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁর কাছে কি বার্তা পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [সেখানে ইদ্রীস (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন। তাঁর সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণীত হয়েছে: আমি তাকে উচ্চস্থানে উন্নীত করেছিলাম][৫]। তারপর আমাদের নিয়ে পঞ্চম আসমানের দিকে ঊর্ধ্বগমন

---

১) সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এই অংশটি নেই। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এই অংশটি আছে [৭৫১৭]।

২) সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এই অংশটি নেই। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এই অংশটি আছে [৭৫১৭]। তবে সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহায় চারটি প্রবাহমান নদীর বিবরণ এসেছে; যার মধ্যে দুটি দৃশ্যমান (নীল ও ফুরাত) অন্য দুটি অদৃশ্যমান নদী সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে উপরিউক্ত বর্ণনায় বিস্তারিত উল্লেখ নেই। তবে সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় [২৮৩৯ ও ৭১৬১] সায়হান ও জায়হান নামে জান্নাতের দুটি নদীর বিবরণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নাভভী বিশিষ্ট তাবেয়ী মুকাতিল'র বরাতে জান্নাতের অদৃশ্যমান দুই নদীর নাম সালসাবীল ও কাউসার বলে উল্লেখ করেছেন।

৩) সহীহ বুখারীর [৭৫১৭] বর্ণনায় ঈসা (আ) ও ইয়াহিয়া (আ)'র অংশটি নেই।

৪) সহীহ বুখারীর [৭৫১৭] বর্ণনায় ইউসুফ (আ)'র অংশটি নেই।

৫) সহীহ বুখারীর [৭৫১৭] বর্ণনায় ইদ্রীস (আ)'র অংশটি নেই।

হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [সেখানে হারুন (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন][১]। তারপর আমাদের নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে উর্ধ্বগমন হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সেখানে মুসা (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে সপ্তম আসমানের দিকে উর্ধ্বগমন হয়। সেখানে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণ তাঁকে বললেন; যা প্রথম আসমানে বলা হয়েছিল। আপনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো এবং বলা হলো: শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। [সেখানে ইবরাহীম (আ)'র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বায়তুল মামুরের দিকে পৃষ্ঠদেশ ঠেক লাগিয়েছিলেন। যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা প্রবেশ করেন যাঁরা কখনো সেখানে ফিরে আসেন না। তিনি স্বাগত জানালেন এবং কল্যাণ কামনা করলেন][২]। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় (বৃক্ষের কাছে) নিয়ে আসা হয়। তার পাতা হাতীর কানের মতো এবং ফল মটকার মতো। আল্লাহ'র নিদের্শে যেন বৃক্ষকে যে আবরণে আবৃত করার তা আবৃত করে এবং পরিবর্তিত হয়ে যায়। আল্লাহ'র সৃষ্টির কেউ এর সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে সক্ষম নয়। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন এবং আমার ওপর দিবারাত্রি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। তারপর আমি মুসা (আ)'র প্রতি অবতরণ করি। অতঃপর তিনি বললেন: আপনার রব আপনার উম্মাহ'র ওপর কী ফরয করেছেন? আমি বললাম: পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন: ফিরে যান আপনার রবের কাছে আরো লাঘবকরণের (সহজকরণের) আবেদন করুন। আপনার উম্মাহ এতটা আদায়ে সামর্থবান হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং উত্তমরূপে জেনেছি। অতঃপর আমি আমার রব এর কাছে ফিরে গিয়ে সহজকরণের আবেন করি এবং তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। অতঃপর মুসা (আ)'র কাছে ফিরে আসি এবং বললাম: তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন: ফিরে যান আরো লাঘবকরণের (সহজকরণের) আবেদন করুন। আপনার উম্মাহ এতটা আদায়ে সামর্থবান হবে না। এভাবে আমি আমার রব এবং মুসা (আ)'র কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকি

---

১) সহীহ বুখারীর [৭৫১৭] বর্ণনায় হারুন (আ)'র অংশটি নেই।

২) সহীহ বুখারীর [৭৫১৭] বর্ণনায় ইবরাহীম (আ)'র অংশটি নেই। তবে বিভিন্ন আসমানে নবী-রাসুলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিষয়টি সহীহ বুখারীর বর্ণনায় সহীহ মুসলিমের মতো ধারাবাহিকভাবে আসেনি।

শেষপর্যায়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত হলো এবং আল্লাহ বললেন: হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মাহ'র ওপর দিবারাত্রী এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে; তবে প্রতি ওয়াক্তের প্রতিদান দশগুণ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের প্রতিদান প্রদান করা হবে। কেউ ভালো কিছুর ইচ্ছে করলো; অথচ সেটি করেনি তবে সে একটি সাওয়াব পাবে। আর ভালো কাজটি যদি করে তাহলে দশটি সাওয়াব পাবে। আর কেউ কোনো মন্দকাজের ইচ্ছে করলো এবং তা করলো না তাকে কোনো গুনাহ প্রদান করা হবে না। আর মন্দকাজ করলে একটি মাত্র গুনাহ প্রদান করা হবে। অতঃপর আমি মুসা (আ)'র কাছে আসি এবং তাঁকে বিষয়টি জানাই। তিনি বললেন: ফিরে যান আরো লাঘবকরণের (সহজকরণের) আবেদন করুন। অতঃপর আমি বললাম: আমার রব এর কাছে বারবার গিয়ে সহজ করে নিয়েছি এখন আবার তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর আল্লাহ'র নামে তিনি ফিরে এসে নিজ বিছানায় শুয়ে পড়েন। তারপর তিনি মসজিদে হারামে ঘুম থেকে জেগে উঠেন][১]।

ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া

পরের দিন সকালে আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের কোনো এক বৈঠকে মুতঈম বিন আদী, আমর বিন হিশাম (আবু জাহল) এবং অলীদ বিন মুগীরাহ'র উপস্থিতিতে ইস্‌রা ও মিরাজের প্রত্যক্ষ করা ঘটনাসমূহের যখন বর্ণনা দেন যে, আমি রাতে এই মসজিদে ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেছি এবং মাঝখানের সময়ে বায়তুল মাকদিস গিয়েছিলাম, সেখানে আমার জন্য পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের একটি দল সমবেত হয়েছিল; যাঁদের মধ্যে ইবরাহীম (আ), মুসা (আ) এবং ঈসা (আ) ছিলেন। তখন আবু জাহল ঠাট্টাচ্ছলে বলে উঠে যে, তাঁদের বর্ণনা দাও। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: ঈসা মাঝারি গড়নের, দীর্ঘাঙ্গী নয়, প্রসস্তবক্ষ, কোকড়ানো চুল, লালচে রঙের , যেন দেখতে উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী'র মতো। মুসা বাদামী রঙের মোটা ও দীর্ঘাঙ্গী, দেখতে কিছুটা আবদ শানুআহ'র গোত্রের লোকদের মতো। আর ইবরাহীম আল্লাহ'র শপথ! চারিত্রিক ও শারীরিকভাবে আমার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে চ্যালেঞ্জ করে মসজিদে আক্‌সা'র বর্ণনা দিতে বলে; যেহেতু তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রথমে বায়তুল্লাহ থেকে মসজিদে আক্‌সা গিয়েছেন এবং সেখানে নবী-রাসুলগণের সাথে নামায আদায় করেছেন ও ইমামত করেছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন মসজিদে আক্‌সা'র ভ্রমণে ছিলেন তখন তার আশপাশ, দরজা-জানালা বা স্তম্বগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে কখনো তাঁর হৃদয়ে ধারণা আলোড়িত হয়নি এবং সাধারণত তাই হয়ে থাকে; কারণ মানুষ কখনো কোনো স্থানে বেড়াতে গেলে ভবনের দরজা-জানালা ও স্তম্ব গণনা করে না। এখন কুরাইশদের এমন প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) কী বর্ণনা দিবেন? অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিবরীল আমীনের মাধ্যমে রাসুল (স)'র সামনে পুরো মসজিদে আক্‌সা তুলে ধরলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) দেখে দেখে তাদের প্রশ্নমতো তার বর্ণনা দিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: যখন কুরাইশ আমাকে বিশ্বাস করলো না তখন আমি হাজরে আসওয়াদের কাছে দাড়ালাম।

---

১) সহীহ মুসলিম [১৬২, ২৫৯ ও ৪১১] এবং সহীহ বুখারী [৭৫১৭]।

অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার সামনে পুরো মসজিদে আকসা তুলে ধরলেন এবং আমি তাদেরকে দেখে দেখে তার বর্ণনা দিতে লাগলাম[১]।

তারপর তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বিভিন্ন অভিযাত্রীদল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। অতঃপর তিনি উত্তরে বললেন: আমি রাওহায় অমুক অভিযাত্রীদলের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম যারা তাদের একটি উট হারিয়েছিল। অতঃপর তারা এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো, আমি যখন তাদের তাবুতে পৌঁছালাম তখন সেখানে তাদের কাউকে পাইনি। সেখানে একটি পানির পাত্র পেলাম; অতঃপর আমি সেখান থেকে পানি পান করলাম। তারপর আমি তানঈমে অমুক অভিযাত্রীদলকে অতিক্রম করেছি, এখনই হয়তো এই অভিযাত্রীদল তোমাদের কাছে দৃশ্যমান হবে। অতঃপর অলীদ বিন মুগীরাহ বললো: যাদুকর। তারপর কুরাইশরা ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য লোক পাঠালো এবং তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) যা যা বর্ণনা দিয়েছেন তা যথার্থই পেয়ে যায়, তারপরও তারা বললো: অলীদ বিন মুগীরাহ সঠিক বলেছে[২]।

অন্যদিকে মুশরিকেদের কেউ আবু বকর (র) কে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঠাট্টাচ্ছলে এই আশায় বলে যে, তিনি এই অবাস্তব ঘটনা বিশ্বাস করবেন না। অতঃপর তিনি বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) যদি তা বর্ণনা করে থাকেন তাহলে তিনি সত্য বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁকে এর চেয়ে আরো বিরল ঘটনা বর্ণনায়ও বিশ্বাস করি[৩]।

উপরিউক্ত পবিত্র ভ্রমণ সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল বিধায় এই ভ্রমণকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অন্যতম মুজিযাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ স্বপ্নে সংঘটিত ভ্রমণ সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো সম্পৃক্ততা সাধারণত থাকে না বিধায় তা কখনো মুজিযাহ হতে পারে না। অতি পরিতাপের বিষয় যে, প্রাচ্যবিদদের মতো কিছু মুসলিম গবেষকও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইস্‌রা ও মিরাজকে স্বপ্নভ্রমণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অভিমতের উত্তরে শুধু এতটুকু বলবো যে, কোনো স্বপ্নভ্রমণে মানুষ আশ্চর্য হয় না এবং অবিশ্বাস করে না। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইস্‌রা ও মিরাজ যদি স্বপ্নভ্রমণ হতো তাহলে কুরাইশ ও মক্কাবাসীর ভ্রমণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ ছিল না যা সহজেই অনুমেয়; কারণ কারো স্বপ্নভ্রমণ নিয়ে কেউ সাধারণত সন্দেহ পোষণ করে না এবং প্রশ্ন উত্থাপন করে না।

যেহেতু মিরাজে মুসলিমদের ওপর দিবা-রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে তাই ইস্‌রা ও মিরাজ রজনীর পরবর্তী সকালে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে নামাযের সময় ও রীতি-নীতি নিয়ে জিবরীল আমীন (আ) আগমন করে তাঁকে নামাজের প্রকৃতি-ধরণ ও সময় শিক্ষা দিলেন[৪]। তবে ইতিপূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) সকাল-সন্ধ্যা দু রাকআত করে নামায আদায় করতেন যেমন ইবরাহীম (আ) নামায আদায় করতেন।

---

১) সহীহ বুখারী [৩৮৮৬] ও সহীহ মুসলিম [১৭০]।

২) সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/১১, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, প্রাগুক্ত:৪/২০১-২০৪ এবং মাজমাউয যাওয়ায়িদ, প্রাগুক্ত: ১/৭৫-৭৬।

৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর শর্তে আল-মুসতাদরাক [৪৪৬৩]।

৪) সুনান নাসায়ী [৫১২]।

ইস্‌রা ও মিরাজের শিক্ষা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ইস্‌রা ও মিরাজ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাসমূহের অন্যতম। প্রিয়তমা স্ত্রী ও দুঃসময়ের কান্ডারী চাচার মৃত্যুর পর এমনিতেই আল্লাহ'র রাসুল (স) খুবই শোকাহত। তার ওপর আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশের লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর তিনি স্বজাতির কাছে থেকে বিতাড়িত হয়ে অনেক আশা নিয়ে তায়েফ গমন করেছিলেন এবং তায়েফবাসীর নিকটও অপ্রত্যাশিতভাবে একই অসদাচরণের সম্মুখীন হলেন; তখন অনেকটা নিজের অবচেতন মনে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে হতাশা নেমে আসে। অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে সান্ত্বনা প্রদানের লক্ষ্যে এবং তিনি তাঁর বার্তাবাহককে তা প্রত্যক্ষ করানোর উদ্দেশ্যে সশরীরে এই ভ্রমণ করিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরো উৎসাহ ও দৃঢ়তা প্রদান করেন।

যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ভ্রমণ অনেকটা অসম্ভব বিধায় অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এই ভ্রমণের সত্যতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সততা নিয়ে যাঁদের মনে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আবু বকর (র)'র মতো তাঁদের মনে এই ভ্রমণের সত্যতা নিয়েও কোনো রকম দ্বিধা থাকার কথা নয়। কারণ এর চেয়ে আরো অধিক আশ্চর্যবোধক সংবাদ বিশ্বাস করে তাঁর ওপর অবতীর্ণ অহী শতভাগ সত্য হিসেবে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেছেন বিধায় আবু বকর (র) কুরাইশদের মুখে এই ভ্রমণের বিবরণ শুনে বিনা দ্বিধায় বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) যদি তা বর্ণনা করে থাকেন তাহলে তিনি সত্যই বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁকে এর চেয়ে আরো অসম্ভব ঘটনা বর্ণনায়ও বিশ্বাস করি। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনার মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে বেশ কিছু উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) মুজিযাহ আরবী শব্দ। যার শব্দার্থ অক্ষমকারী বা অপারগকারী। অর্থাৎ সাধারণ রীতিনীতি অনুযায়ী যে কাজ মানবসন্তান করতে অক্ষম তা কারো কাছ থেকে সংঘটিত হওয়াকে মুজিযাহ বলে। দেখতে অনেকটা দুর্বোধ্যও চোখ ধাঁধানো যাদুর মতো হলেও মুজিযাহ ও যাদুর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে:

ক) মুজিযা সাধারণত নবী-রাসুলগণের দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্য কারো মাধ্যমে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে তাকে সাধারণত কারামাত বলা হয়।

খ) যাদুর প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে যাদুকর অবগত থাকে, তবে মুজিযাহ'র প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নবী বা রাসুলকে অবহিত করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নবী-রাসুলগণ অবগত থাকেন না। যেমন মুসা (আ) কে বলা হলো: হে মুসা! তোমার লাঠি ফেলে দাও। অতঃপর লাঠি সাপে পরিণত হলো। তখন মুসা (আ) ভয় পেয়ে গেলে বলা হয়: হে মুসা ভয় পেয়ো না। তোমার লাঠি ধরো। আমি তাকে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে মুসা (আ) যদি জানতেন সাপ পুনরায় লাঠির আকৃতি ধারণ করবে তাহলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

গ) যাদুর কখন প্রকাশ ঘটবে এবং কতক্ষণ স্থায়িত্ব থাকবে সে সম্পর্কে যাদুকর অবগত থাকলেও মুজিযা প্রকাশপ্রাপ্ত নবী-রাসুল তা সম্পর্কে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নবী বা রাসুলকে অবহিত করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অবগত থাকেন না। অর্থাৎ যাদুর প্রকাশ ও স্থায়িত্ব

যাদুকরের ইচ্ছায় ও নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু মুজিযা সংশ্লিষ্ট নবী-রাসুলের ইচ্ছায় ও নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; বরং মহান রাব্বুল আলামীন'র ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয় এবং তার স্থায়িত্ব থাকে।
ঘ) মুজিযাহ ও কারামতের মধ্যকার পার্থক্য হলো মুজিযাহ'র মতো কারামতও মহান রাব্বুল আলামীন'র ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয় বা প্রকাশ পায়। মুজিযাহ সংশ্লিষ্ট নবী-রাসুলের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তা সংঘটিত হওয়ার দাবি তাঁরা করতে পারেন; তবে কারামাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তা দাবি করতে পারেন না। বরং আল্লাহ'র অশেষ মেহেরবানীতে কখনো তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাছ থেকে তা প্রকাশিত হয়।
২) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবদ্দশায় অসংখ্য মুজিযাহ বা অলৌকিক ঘটনা তাঁর হাতে প্রকাশ পেয়েছে যা আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য সূত্রে এসেছে বিধায় অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা যা ইমাম বুখারী অযুর অধ্যায়ে[১], ইমাম মুসলিম ফাদ্বায়েল অধ্যায়ে[২] এবং ইমাম মালিক পবিত্রতার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এমন কি কোনো কোনো গবেষক আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে দাবি করে বলেন যে, একাধিকবার সংঘটিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন[৩]।

অনুরূপভাবে মুশরিকদের দাবির মুখে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণের ঘটনাও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল, যা ইমাম বুখারী আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম কিয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন[৪]।

এই রকম অসংখ্য মুজিযাহ বা অলৌকিক ঘটনার অন্যতম ইস্‌রা ও মিরাজ; যা আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য সূত্রে এসেছে বিধায় এটিও অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই এবং মুসলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে।
৩) উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনায় মসজিদে আকসায় পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণসহ দুরাকআত নামায আদায় ও বিভিন্ন আসমানে একাধিক নবী-রাসুলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁদের সাথে কথোপকথনের বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু প্রশ্ন আসে যে, তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের মধ্যে ঈসা বিন মরয়ম (আ) ব্যতীত সকলের মৃত্যু ঘটেছে। পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ কী তাঁর সাথে নামায আদায়ের জন্য কবর থেকে উঠে এসেছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁদের কবর থেকে বিভিন্ন আসমানে চলে গেছেন। অথচ পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ সম্পর্কে সহীহ হদীসে বর্ণনা এসেছে যে, নবী-রাসুলগণের শরীর কবরের মাটি স্পর্শ করতে পারবে না তাঁরা সশরীরে নিজ নিজ কবরে অবস্থান করছেন[৫]।
এই প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দিসগণ ও ইসলামী গবেষকগণের অভিমত হলোঃ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মিরাজের ঘটনা যদিও সশরীরে সংঘটিত হয়েছে; তবে কিছু কিছু বিষয় সেখানে সশরীরে নয়, কিছু আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে, যেমনঃ

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৫৭২ ও ৫৬৩৯]।
[২]) সহীহ মুসলিম [২২৭৯ ও ৩০১৩]।
[৩]) আল-যুরকানী, মুআত্তা'র ব্যখ্যাকারী, প্রাগুক্ত:১/৬৫।
[৪]) সহীহ বুখারী [৪৮৬৭] ও সহীহ মুসলিম [২৮০৮]।
[৫]) মুসনাদ আহমদ [১৬১৬২] আবু দাউদ [১০৪৭ ও ১৫৩১] ইবন খুযাইমাহ [১৭৩৩ ও ১৭৩৪]।

ক) মসজিদে আকসায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সম্মানে পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণকে সমবেত করা এবং তাঁদের নিয়ে দুরাকআত নামায আদায় ও বিভিন্ন আসমানে একাধিক নবী-রাসুলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁদের সাথে কথোপকথনের বিষয়টি শারীরিকভাবে নয়; বরং আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ [ঈসা (আ) ব্যতীত [কারণ তাঁকে সশরীরে উর্ধ্বে উঠানো হয়েছে] শারীরিকভাবে নিজ নিজ কবরে থেকে তাঁদের আত্মাকে শারীরিক রূপ দিয়ে ফেরেস্তাদের মতো করে মুহূর্তের মধ্যে মসজিদে আকসায় উপস্থিত হওয়া এবং নামায শেষে বিভিন্ন আসমানে তাঁদের সাথে সাক্ষাত ও কথোপকথনের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[১]।

খ) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জান্নাত-জাহান্নামের পরিদর্শন এবং জান্নাতে বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎ ও জাহান্নামে বিভিন্ন অপরাধীর শাস্তির বিবরণের বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ কুরআন করীমের বর্ণনার আলোকে জান্নাত বা জাহান্নামে মানুষের অবস্থান বিচারদিনের বিচারের পরে হবে, এর পূর্বে নয়।

গ) বিভিন্ন আসমানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সুনির্দিষ্ট নবী-রাসুলগণের সাক্ষাতের বিবরণে ভিন্নতা থাকলেও সহীহ মুসলিমের আনাস (র) থেকে সাবিত আল-বুনানী'র বর্ণনা মতে নিম্নরূপ: প্রথম আসমানে আদম (আ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ), তৃতীয় আসমানে ইফসুফ (আ), চতুর্থ আসমানে ইদ্রীস (আ), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ), ষষ্ঠ আসমানে মুসা (আ) ও সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আ)[২]। তবে লক্ষাধিক নবী-রাসুলগণের মধ্যে শুধুমাত্র সাতজনের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে দুজনের মধ্যে কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্যতা থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথমে আদম (আ) জান্নাতের বাসিন্দা ছিলেন, জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসার পর পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টায় ছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পবিত্র মক্কানগরীর বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও আদম (আ)'র ন্যায় নিজস্থান (মক্কাহ) থেকে খুব শীঘ্রই বিতাড়িত হবেন এবং এর জন্য দুঃখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে পুনরায় বিজয়ী করে মক্কাহ ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (অ) ও ঈসা (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাঁরা দুজন যেমন ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন অনুরূপভাবে তিনিও হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হবেন। তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ইফসুফ (আ) যেমন নিজ আপনজন (সৎভাইদের) দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের শিকার হয়েছিলেন তিনিও নিজ আপনজন (স্বগোত্র কুরাইশ) দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের শিকার হবেন। তবে ইউসুফ (আ) যেমন শেষ পর্যায়ে নিজ সৎভাইদের ওপর কতৃত্বলাভের পর { لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ }[আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই] বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও মক্কাবিজয়ের পর {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ}[আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই] বলে স্বগোত্র কুরাইশদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন। চতুর্থ আসমানে ইদ্রীস (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, মহান রাব্বুল

১) ইবন হাজর আল-অসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/২৩৮-২৪৩। ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া সংকলন, প্রাগুক্ত:৪/৩২৮।

১) সহীহ মুসলিম [২৮০৮]।

আলামীনের নিকটে ইদ্রীস (আ)'র সুউচ্চ মর্যাদার মতো তাঁকেও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হবে। পঞ্চম আসমানে হারুন (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, হারুন (আ) কে যেমন স্বজাতি ইহুদীরা গরুর বাচুর বানিয়ে পূজা করে অপদস্ত করার পর শেষ পর্যায়ে পুনরায় তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিল অনুরূপভাবে তিনিও স্বজাতি কুরাইশদের নিকট প্রথমার্ধে অপদস্ত হলেও শেষ পর্যায়ে ভালোবাসা ও সম্মানপ্রাপ্ত হবেন। ষষ্ঠ আসমানে মুসা (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, মুসা (আ) যেমন তাঁর স্বজাতি দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে নিপীড়ন-লাঞ্ছনার শিকার হয়েও ধর্য্য ধারণ করেছিলেন অনুরূপভাবে তিনিও স্বজাতি কুরাইশদের দ্বারা নিপীড়ন-লাঞ্ছনার মুখোমুখী হলে ধর্য্য ধারণ করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আ)'র সাক্ষাত ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ইবরাহীম (আ) যেমন বায়তুল মামুর'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন অনুরূপভাবে তিনি শেষ জীবনে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন[১]।

৪) উপরিউক্ত হাদীসে প্রথম আসমানে প্রবাহমান দুটি নদীর বিবরণ এসেছে। তবে মালিক বিন সা'সাআ'র বর্ণিত হাদীসে সিদরাতুল মুনতাহায় প্রবাহমান চারটি নদীর বিবরণ এসেছে; দুটি দৃশ্যমান (নীল ও ফুরাত) এবং দুটি অদৃশ্যমান। মুহাদ্দিসীনগণ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, দৃশ্যমান নদীগুলোর মূল উৎস সিদরাতুল মুনতাহা'র নীচ থেকে হলেও নদীগুলোর অবস্থানস্থল পৃথিবীর আসমান বা প্রথম আসমানে এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো নীলনদ পৃথিবীতে দুটি শাখানদ দিয়ে প্রবাহিত ও বহমান হয়েছে:{النيل الأبيض} [শুভ্রনীল] এটি তার সবচেয়ে দীর্ঘ শাখানদ; যেটি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত থেকে এবং :{النيل الأزرق}[শুর্মানীল] ইথিওপিয়ার তানালেক থেকে প্রবাহিত হয়ে সুদান অতঃপর মিশর হয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে এবং এর দৈর্ঘ ৬.৮৫৩ কিমি। অন্যদিকে ফুরাতনদী তুরস্ক থেকে প্রবাহিত হয়ে সিরিয়া অতিক্রম করে ইরাকে এসে দিজলানদীর সমন্বয়ে আরবোপসাগরে শেষ হয়েছে এবং এর দৈর্ঘ ২.৭৮১ কিমি।

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত দুটি দৃশ্যমান নদীর পৃথিবীর আসমান (প্রথম আসমান) অথবা সিদরাতুল মুনতাহা থেকে প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি মূলত নদীগুলোর অববাহিকার অঞ্চলসমূহ চিত্রায়ন করে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করেছেন যে, আপনি মক্কাহ বা তায়েফে তাদের অধিবাসী দ্বারা নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হলেও খুব শীঘ্রই আপনার উম্মাহ দৃশ্যমান নদীগুলোর অববাহিকার অঞ্চলসমূহ নিজেদের অধীনস্থ করে নিবে। যেমনি মসজিদে আকসায় তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের ইমামতের মাধ্যমে তাঁর রাসুল (স) কে ইঙ্গিত দিলেন যে, আপনার দায়িত্ব পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের মতো জাতিভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক নয় বরং আপনি সকল জাতি ও সকল অঞ্চলের জন্য

[১]) ইবন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/২৪০-২৪১। তবে এই ব্যাখ্যা সরাসরি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় এর যর্থাথতা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন থেকে যায়।

বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার আগমনের মাধ্যমে আসমানী দ্বীনের পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের শরীয়াহ রহিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবী থেকে তাঁর রাসুল (স)'র বিদায় গ্রহণের পূর্বেই {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পুর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম] উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর শরীয়াহকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন।

হজ্ব মৌসুমে ইসলামের প্রচার-প্রসার

আল্লাহ’র রাসুল (স) হজ্ব মৌসুমে বায়তুল্লাহ’র উদ্দেশ্যে প্রতি বছর মক্কাহ আগমনকারী বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হতেন। তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দিতেন; তবে কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। যেমন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইব্‌ন সাআদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ’র রাসুল (স) প্রতি বছর হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কাহ আগমনকারী বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠী যারা উকায, মিজান্নাহ ও যুল মাজাযে তাবু স্থাপন করে থাকে তাদের কাছে গিয়ে আল্লাহ’র বার্তা পৌঁছিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে তাঁকে সমর্থনের আহবান জানাতেন। তবে কেউ তাঁকে সহযোগিতা করতো না। তিনি বলতেন: হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা এক আল্লাহ’র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো তোমরা সফল হবে। যার মাধ্যমে তোমরা আরবদের ওপর রাজত্ব করবে এবং অনারবদের পরাভূত করবে। তোমরা যদি তা বিশ্বাস করো জান্নাতে তোমরা বাদশাহ হবে। আবু লাহব তাঁর পিছনে গিয়ে বলতো: তোমরা তাঁর অনুসরণ করো না, সে ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। অতঃপর তারা আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে অসদাচরণ করতো, অসম্মান করতো এবং তাঁকে লাঞ্ছনা দিয়ে অপমান করতো[১]।

এভাবে আল্লাহ’র রাসুল (স) প্রতি বছরের ন্যায় নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির একাদশ বছরে বিভিন্ন আরবগোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে থাকেন; এমতাবস্থায় আকাবায় (মক্কাহ ও মিনা’র মধ্যবর্তী স্থান) খাযরাজগোত্রের একটি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর তিনি তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে তাঁরা বললেন: আমরা খাযরাজগোত্রের লোক। তিনি বললেন: ইহুদীদের মিত্র? তাঁরা উত্তরে বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমরা কী একটু বসবে আমি তোমাদেরকে কিছু বলতে চাই। তাঁরা বললেন: অবশ্যই। অতঃপর তাঁরা তাঁর সাথে বসলেন এবং তিনি তাঁদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তাঁদের কাছে ইসলাম উপস্থাপন করলেন এবং কুরআন পাঠ করে শুনালেন। তাঁদের হৃদয় ইসলাম গ্রহণের উপযোগী ছিল। কারণ তাঁরা ইহুদীদের সাথে বসবাস করতেন এবং ইহুদীদের তাঁরা আহ্‌লে কিতাব হিসেবে জানতেন। ইহুদীদের সাথে যখন মাঝে-মধ্যে লড়াই হতো তখন ইহুদীরা তাঁদেরকে একজন আগত নবীর ভয় দেখাতো এবং বলতো: খুব শীঘ্রই তাঁর আগমন ঘটবে; আমরা তাঁর অনুসারী হবো এবং তোমাদের আদও সমুদ সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করবো।

অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স) যখন তাঁদের সাথে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করতে লাগলো: আল্লাহ’র শপথ ইনি সেই নবী ইহুদীরা তোমাদেরকে যেই নবীর ভয় দেখাতো। সুতরাং কেউ যেন তাঁর নিকট তোমাদের পূর্বে না পৌঁছে। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর রাসুল (স)’র ডাকে সাড়া দিয়ে বললো: আমরা আমাদের গোত্রের বড় অংশ পিছনে রেখে এসেছি। আমরা তাদেরকে আপনার বিষয়ের প্রতি আহবান জানাবো এবং যেই দ্বীনের প্রতি আমরা সাড়া দিলাম তা তাদের কাছে উপস্থাপন করবো। আল্লাহ যদি তাদেরকে আপনার বিষয়ে ঐকমত্য করেন তাহলে আপনিই আমাদের নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তারপর তাঁরা

---

[১]) তাবকাত ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত: ১/২০০-২০১। আরো বিস্তারিত দেখুন: সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/৪২৩।

পরের বছর হজ্ব মৌসুমে পুনরায় সাক্ষাতের অঙ্গীকার করে চলে গেলেন[১]। উক্ত দলে খাযরাজগোত্রের আসআদ বিন যুরারাহ, আউফ বিন আল-হারিছ, রাফি বিন মালিক, কুতবাহ বিন আমির, উকবাহ বিন আমির ও জাবির বিন আবদিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন[২]।

আকাবাহ প্রথম'র বায়আত

খাযরাজগোত্রের উক্ত দলের মাধ্যমে সেই বছরেই মদীনায় ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু হয়ে যায় এবং এর পরবর্তী বছরে আনসারদের বারো জন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সাক্ষাত করার জন্যে মক্কাহ আগমন করেন এবং আকাবায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর আল্লা'হর রাসুল (স)'র হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে আসআদ বিন যুরারাহ, রাফি বিন মালিক, উবাদাহ বিন আল-সামিত ও আবুল হায়সাম ইব্ন তাইহান উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তা আকবায়ে উলা বা আকবাহ প্রথম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উবাদাহ বিন আস-সামিত উক্ত বায়আতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: আমরা বারো জন ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাদের বললেন: তোমরা আমার সাথে অঙ্গীকার করো যে, কখনো আল্লাহ'র সাথে শির্ক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না, কোনো ভালো কাজে আমার বিরোধিতা করবে না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পরিপূর্ণ করবে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে এর ব্যতিক্রম করবে তাকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে যে এই নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ যার অপকর্ম গোপন রেখেছেন তার বিষয়টি আল্লাহ'র নিকট সংরক্ষিত থাকবে। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন। অতঃপর আমরা তাঁর হাতে অঙ্গীকার করলাম[৩]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) নারীদের বায়আত গ্রহণে যেই শব্দমালা ব্যবহার করতেন এই বায়আতে তিনি সেই শব্দমালা গ্রহণ করার কারণে বর্ণনাকরীগণ হাদীসের বর্ণনায় "নারীদের বায়আত" বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে যুদ্ধ বা জিহাদের কোনো অঙ্গীকার ছিল না। অতঃপর তাঁরা যখন ফিরে যেতে ইচ্ছে পোষণ করেন তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসআব বিন উমাইর (র) কে তাঁদের সাথে প্রেরণ করলেন এবং কুরআন পাঠ, ইসলামের শিক্ষা ও দ্বীনের প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশ দেন[৪]।

আকাবাহ প্রথম'র উপদেশ ও শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এগারো বছরের দিবা-রাত্রি পরিশ্রমের ফসল "আকাবায়ে উলা"। তাছাড়া অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্যেও আল্লাহ'র রাসুল (স) কখনো নিরাশ হননি, বরং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবিচল ছিলেন এবং দাওয়াতী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতার মুখে তিনি হজ্ব মৌসুমে মক্কাহ

---

১) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত, বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৪২৮।

২) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:১১৬।

৩) সহীহ বুখারী [১৮ ও ৭১৯৯] ও সহীহ মুসলিম [১৭০৯]।

৪) সহীহ বুখারী [৩৯২৫]।

আগমনকারী বিভিন্ন আরবজাতি-গোষ্ঠীর তাবুর সামনে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন এবং বলতেন: এমন কেউ কী আছে যে, আমাকে তার স্বজাতির কাছে নিয়ে যাবে, কুরাইশ তো আমাকে আমার পালনকর্তার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে[১]।

মক্কাহ নগরীতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এগারো বছর দাওয়াতী কাজের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সকলেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে হৃদয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন বিধায় অমানবিক নির্যাতন সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি ও মনোবল তাঁদের ছিল। তবে আকবায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে যাঁদের সাক্ষাত ঘটে তাঁরা সকলেই মক্কাহ'র বাহিরের বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের সামনে খোলা মন নিয়ে ইসলামের আলোচনা করেছেন ও তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁরা উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছেন। তাতে আল্লাহ'র রাসুল (স) আশান্বিত হয়ে পরবর্তী বছর আরো বেশী সংখ্যক মানুষ নিয়ে আসার কথা বলেন, তাঁদের ইসলাম তথা দ্বীন শিক্ষা প্রদানের জন্য নিজের প্রতিনীধি প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আকাবায়ে উলায় দাওয়াতী অভিযানে রয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) প্রথম এগারো বছরের অমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ইসলাম নিঃশ্বেষ হয়ে যায়নি; কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) একটি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। নির্যাতন-নিপীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে একটি জাতিকে নিঃশ্বেষ করা সম্ভব হলেও একটি আদর্শকে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়; কারণ আদর্শের কখনো মৃত্যু হয় না। তাছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স) একটি সামাজিক বিপ্লব সাধনের জন্য কাজ করেছেন, নিজের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়।

খ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে স্বজাতির বিরুদ্ধে বাইরের শক্তির মাধ্যমে সমর্থন ও সহযোহিতা যুগিয়েছেন; কারণ কেউ যেন ধারণা করতে না পারে যে, ইসলাম কোনো জাতিগত বিপ্লবের নাম, বরং স্বজাতির বিরোধিতার মুখে বর্হিশক্তির মাধ্যমে ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় এর সার্বজনীনতা ও বিশ্বায়ণের বিপ্লবের ডাক।

গ) আনসারদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর সর্বশেষ দ্বীনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জন্য এমন অঞ্চলকে নির্বাচন করে রেখেছেন, যেই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আগমনের দীর্ঘ অপেক্ষা ছিল এবং আসমানী দ্বীন সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন। কারণ মদীনায় আরব মুশরিকদের সাথে বিভিন্ন আরবাঞ্চল থেকে আগত একাধিক ইহুদী গোষ্ঠীর বসবাস ছিল এবং ইহুদীরা আরবদের বিভাজন করে তাদের মধ্যে সুকৌশলে যুদ্ধ-বিভেদ লাগিয়ে রেখে একেক ইহুদী গোষ্ঠী একেক আরবগোত্রকে সমর্থন দিয়ে অস্ত্র ও সুদের ব্যবসা অব্যাহত রেখেছিল। শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব (রা) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মদীনার দুই

---

[১]) সুনান আবু দাউদ [৪৭৩৪], জামে তিরমিযী [২৯২৫] সুনান ইবন মাজাহ [২০১] ও মুসনাদ আহমদ [১৫১৯২], আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইব্‌ন হাজর আল-আসকলানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/১৫৬, ইব্‌নুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/৫০ ও মুসনাদ আহমদের ব্যাখ্যা আল-ফাতহু আর-রব্বানী, প্রাগুক্ত:২০/২৬৯।

আরবগোত্র আউস ও খাযরাজের মধ্যে ইহুদীরা সুকৌশলে একশত বিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছিল যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় আগমনের মাধ্যমে নিরসন ঘটে[১]। যার বর্ণনা কুরআন করীমে এসেছে:{وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًاوَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا}[আর তোমরা সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন][২]। অতঃপর এই ইহুদীরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আবির্ভাব নিয়ে আরবদের ভয় দেখাতো এই বলে যে, সর্বশেষ নবীর আগমন হলে আমরা তাঁর অনুসারী হবো এবং তোমাদের আদ-সমুদের ন্যায় হত্যা করবো। সুতরাং মদীনাবাসী ইহুদীদের মাধ্যমে যেমন আসমানী দ্বীনের সাথে পরিচিত ছিলেন অনুরূপভাবে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। পাশাপাশি অবচেতন মনে শেষ নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাওয়াতের পর তাঁরা কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্ধ ছাড়াই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন[৩]। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদীনাকে তাঁর রাসুল (স)'র হিজরতের স্থান নির্বাচন করে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্রস্থল হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন।

ঘ) আকাবায়ে উলায় মদীনার নেতৃস্থানীয়দের এক দল ইসলাম গ্রহণ করেছেন যা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের ওপর দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তাঁদের ইসলাম শুধুমাত্র মুখে কলিমা-ই-শাহাদাত উচ্চারণের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁদের ইসলাম মুখে কলিমা-ই-শাহাদাত উচ্চারণের পাশাপাশি হৃদয়ের দৃঢ়তার সমন্বয় ছিল। অর্থাৎ শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করলে হবে না ইসলামের শিক্ষা হৃদয়াঙ্গমও করতে হবে, যা তাঁদের কাছ থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স) যেই অঙ্গীকার নিয়েছেন তা থেকে সহজেই অনুমেয়। নতুন মুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার ছিল যে, কখনো আল্লাহ'র সাথে শির্ক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না, কোনো ভালো কাজে তাঁর (নবীর) বিরোধিতা করবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পরিপূর্ণ করবে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে এর ব্যতিক্রম করবে তাকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে যে এই নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ যদি কারো অপকর্ম গোপন রাখেন তবে তার বিষয়টি আল্লাহ'র নিকট সংরক্ষিত থাকবে, ইচ্ছে করলে তিনি শাস্তি দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন। অতঃপর আমরা তাঁর হাতে অঙ্গীকার করলাম[৪]। অর্থাৎ শির্কের পাশাপাশি চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা, মিথ্যা অপবাদ ও কোনো কাজে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অবাধ্য না হওয়ার

---

[১]) মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসুল (স), প্রাগুক্ত:১২৪।

[২]) সূরাহ আলে ইমরান:১০৩।

[৩]) ইব্নুল কাইউম,যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/৫০-৫১।

[৪]) সহীহ বুখারী [১৮ ও ৭১৯৯] ও সহীহ মুসলিম [১৭০৯]।

অঙ্গীকার নিয়েছেন, যা মূলত একটি সুন্দর নিরাপদ সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের মূল ভিত্তি। শুধুমাত্র তাওহীদের ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নুবুওয়্যতের স্বীকারোক্তি, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জ্ঞান করা ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নামই ইসলাম নয়; বরং পৃথিবীতে একটি সুন্দর নিরাপদ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটানো ইসলামের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ। যেমন কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}[আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও। তারা বিভেদমান বিষয়ের ফয়সলার জন্য শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়][১]।

---

১) সূরাহ আন-নিসা:৬০।

আকাবাহ দ্বিতীয়'র বায়আত

আকাবাহ প্রথম'র বায়আতের পর নতুন মুসলিমদের কুরআন পাঠ, ইসলামের শিক্ষা ও ধর্মীয়জ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসআব বিন উমাইর (র) কে তাঁদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশমতো তাঁদেরকে কুরআনে করীমের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ইসলামের দিকে মদীনাবাসীকে দাওয়াত দেন; এর পরিপ্রেক্ষিতে বড় একটি দলকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। পরবর্তী বছর হজ্ব মৌসুমে তাঁদের নিয়ে গোপনে তাঁদের স্বগোত্রীয় মুশরিক হজ্ব আদায়করীদের সাথে মক্কাহ আগমন করেন।

প্রখ্যাত সীরাতবিদ মুহাম্মদ বিন ইসহাক কাআব বিন মালিক (র)'র বরাতে আকাবাহ দ্বিতীয়'র বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন: "আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে আকাবায় উপস্থিত থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। আমরা যখন হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেললাম সেই রাতটি ছিল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে অঙ্গীকারের রজনী। আমরা স্বগোত্রীয় দলের সাথে সেই রাত্রি আমাদের তাবুতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অঙ্গীকারের উদ্দেশ্যে খুব সতর্কভাবে অতি গোপনে তাবু থেকে বের হয়ে আকাবাহ'র নিকটবর্তী স্থানে সমবেত হলাম। আমাদের দলে সত্তর জন পুরুষ ও দুই জন মহিলা (নুসাইবাহ বিন্‌তে কাআব ও আসমা বিন্‌তে আমর বিন আদী) ছিলেন[১]।

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে: আমরা উপত্যকায় সমবেত হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অতঃপর তিনি আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে আগমন করলেন। তারপর তিনি সমবেত সবার সাথে আলোচনা করলেন এবং সমবেত সকলে বললেন: আপনি আপনার নিজের জন্যে ও আপনার পালনকর্তার জন্যে আপনার ইচ্ছেমতো অঙ্গীকার নিতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আলোচনা করলেন এবং কুরআন করীম পাঠ করে শুনালেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ'র পথে আহ্বান করে ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তারপর তিনি বলেন:"আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে প্রতিরক্ষা প্রদান করবে যেমন তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিরক্ষা প্রদান করে থাকো"[২]।

অতঃপর বারা বিন মারুর তাঁর হাত ধরে বললেন: হ্যাঁ! আমরা পূর্ব পুরুষদের উত্তাধিকার সূত্রে অস্ত্রধারী যোদ্ধাজাতি। যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ নিশ্চই আমরা আপনাকে প্রতিরক্ষা প্রদান করবো যেমন আমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা প্রদান করে থাকি, হে আল্লাহ'র রাসুল (স) আপনি আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। বারা বিন মারুরের কথার মাঝখানে আবুল হায়সাম বিন আত-তায়্যেহান বলে উঠেন: হে আল্লাহর রাসুল! (স) ইহুদীদের সাথে আমাদের যেই সন্ধি রয়েছে তা আমরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো। যদি আমরা তা করি পরবর্তীতে আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে আপনি কী আমাদের ত্যাগ করে স্বজাতির নিকট ফিরে আসবেন? আল্লাহ'র রাসুল (স) মুচকি হাসলেন এবং বললেন:"রক্তের পরিবর্তে রক্ত, ধব্বংসের পরিবর্তে ধব্বংস, আমি

---

১) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৮।
২) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৯।

তোমাদের অন্তর্ভূক্ত এবং তোমরা আমার অন্তর্ভূক্ত, তোমরা যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং তোমরা যাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে আমি তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করবো"[১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছিলেন: তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা বারো জন দলপতি নির্বাচন করো যাঁরা প্রত্যেকে স্বজাতির নেতৃত্ব দিবে। অতঃপর খাযরাজ গোত্র থেকে নয় জন ও আউসগোত্র থেকে তিন জন মোট বারো জন দলপতি নির্বাচন করা হলো। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) দলপতিদের উদ্দেশ্য করে বললেন:"তোমরা প্রত্যেকে স্বজাতির জিম্মাদার যেমন হাওয়ারীগণ (সভাসদগণ) ঈসা বিন মরয়ম'র জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি আমার জাতির জিম্মাদার"। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে প্রথম হাত রেখেছিলেন বারা বিন মারুর (র) তারপর সকলে বায়আত গ্রহণ করেন[২]।

বায়আত সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন:"তোমারা নিজেদের তাবুতে ফিরে যাও"। অতঃপর আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাফলাহ (র) বলেন:"যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের তরবারী নিয়ে আগামীকালই মিনাবাসীর ওপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো"। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন:"আমাকে এর অনুমোদন প্রদান করা হয়নি, বরং তোমরা নিজেদের তাবুতে ফিরে যাও"[৩]।

অতঃপর আমরা ফিরে আসলাম এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম। যখন সকাল হলো কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক আমাদের কাছে এসে বললো: হে বনী খাযরাজ! আমাদের নিকট সংবাদ এসেছে যে, তোমরা আমাদের সেই ব্যক্তির কাছে গিয়েছ এবং তাঁকে তোমরা আমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে যাবে। অতঃপর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর সাথে অঙ্গীকার করেছ। আল্লাহ'র শপথ! যদি তাই হয় তাহলে জেনে রাখো আমাদের কাছে কোনো আরবগোত্র তামাদের অপেক্ষা বেশি শত্রুভাবাপন্ন হবে না যাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে[৪]।

অতঃপর আমাদের স্বজাতির মুশরিকরা আল্লাহ'র শপথ করে তাদের বিশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো এবং বললো:সেই রকম কিছু ঘটলে আমরা জানতাম। তারা বিশ্বাস করলো যে, তারা জানে না। কাআব বিন মালিক বর্ণনা করেন যে: আমাদের কেউ কেউ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। লোকজন মিনা ত্যাগ করলে তারা খবরের সত্যতা সন্ধান করতে লাগলো এবং তারা খবরের সত্যতা জানতে পারলো। সুতরাং আমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অতঃপর তারা সাআদ বিন উবাদাহ ও আল-মুনযির বিন আমরকে (দু'জনই দলপতি) পেয়ে যায়; তবে আল-মুনযির তাদের পারস্ত করে পালিয়ে যেতে সক্ষম

---

[১]) সহীহ ইব্ন হিব্বান [৭১৩৭] ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল'র ফাদ্বাইলু আস-সাহাবাহ [১৭১৩]। মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাহ [১৪৯] শায়খ আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৮।

[২]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৮।

[৩]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৯।

[৪]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৯।

হলেও তারা সাআদকে হাত পিছমোড়া বেঁধে মক্কায় পিটালো এবং তাঁর সামনের চুল ধরে ঝাঁকাতে লাগলো (তাঁর প্রচুর চুল ছিল)[১]।

সাআদ বর্ণনা করেন: আল্লাহ'র শপথ! আমি তাদের হাতে টানা হিচড়ার মধ্যে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাদের একজন এগিয়ে এসে বললো: তোমার সর্বনাশ.. কুরাইশদের মধ্যে কারো সাথে তোমার নিরাপত্তার সন্ধি নেই? আমি বললাম: অবশ্যই আছে। আমি জুবাইর বিন মুতঈম ও আল-হারিস বিন উমায়্যাহকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি এবং আমাদের অঞ্চলে তাদের প্রতি যারা অসদাচরণ করেছিল তাদের কাছ থেকে রক্ষা করেছিলাম। অতঃপর সে বললো: তুমি তাদের নাম ধরে সাহায্য চাও; আমি তা করলাম। অতঃপর জুবাইর বিন মুতঈম ও আল-হারিস বিন উমায়্যাহ আসলো এবং তারা দুইজন আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলো[২]।

সীরাতবিদ ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন: আকবাহ প্রথমে আল্লাহ'র রাসুল (স) যুদ্ধের বায়আত গ্রহণ করেননি; তবে আকাবাহ দ্বিতীয়তে তিনি যুদ্ধের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। যেমন উবাদাহ বিন আস-সামিত বর্ণনা করেন যে, আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে যুদ্ধের বায়আত গ্রহণ করেছি। সুসময়ে দুঃসময়ে সর্বময় অবস্থায় আনুগত্য ও অনুসরণের বায়আত গ্রহণ করেছি এবং আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বো না, যেখানেই থাকি সদা সত্য বলবো এবং আল্লাহ'র (দ্বীন) ব্যাপারে কাউকে ভয় করবো না[৩]।

অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমোদন সংক্রান্ত কুরআন করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }[যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন; তবে (খৃষ্টান পাদ্রীদের) নির্জন গির্জাগুলো, এবাদতখানাগুলো (সাধারণ খৃষ্টানদের) উপাসনালয়গুলো (ইহুদীদের) এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ'র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী অতি শক্তিধর][৪]।

উল্লেখ্য আকাবাহ দ্বিতীয়'র বায়আতে যুদ্ধের বিবরণ থাকায় অনেক হাদীস বর্ণনাকারীগণ এটাকে "যুদ্ধের বায়আত" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; যেমন আকাবাহ

[১]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৭০।
[২]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৭০।
[৩]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/২৪৩।
[৪]) *সূরাহ আল-হজ্ব:৩৯-৪০।*

প্রথম'র বায়আতকে যুদ্ধের বর্ণনা না থাকায় "নারীদের বায়আত" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন[১]।

আকাবাহ্ দ্বিতীয়'র উপদেশ ও শিক্ষা

দুই আকাবাহ'র বায়আত গ্রহণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনেকটা অভিন্ন; অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে ইসলামে প্রবেশের স্বীকারোক্তি, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কথা শুনা ও বাধ্য থাকা। আল্লাহ'র দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের অঙ্গীকার। তা সত্ত্বেও দুই আকাবাহ'র বায়আতে দুটো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তাহলো:

ক) আকাবাহ প্রথমে বায়আত গ্রহণকারীর সংখ্যা বারো জন মদীনাবাসী পুরুষ, কিন্তু আকাবাহ দ্বিতীয়তে বায়আত গ্রহণকারীর সংখ্যা সত্তর জনের অধিক যার মধ্যে দুইজন মহিলাও ছিলেন। অর্থাৎ প্রথম বছরের সেই বারো জন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে বায়আত গ্রহণ করে তারা মদীনায় ফিরে এসে ঘরে বসে থাকেননি; বরং মুসআব বিন উমাইর'র নেতৃত্বে নারী-পুরুষ সবার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তাঁদের কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং ইসলামের রীতিনীতি'র বর্ণনা দিয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতি সেই বছরেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের প্রবেশ ঘটেছিল। ইসলাম মদীনার প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এটিই স্থান-কাল নির্বিশেষে মুসলিমগণের দ্বীনি দায়িত্ব। সুতরাং আকাবাহ প্রথম'র বায়আত সাময়িক এবং তাতে প্রতিরক্ষার কোনো বিষয় উল্লেখ না থাকায় তাকে নারীর বায়আত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

খ) আকাবাহ প্রথম'র বায়আতের জিহাদের কোনো প্রকার উল্লেখ ছিল না। তবে আকাবাহ দ্বিতীয়'র বায়আতে সুস্পষ্টভাবে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুরক্ষা প্রদান ও সম্ভবপর প্রতিটি পন্থায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করার বিষয়টি অতি গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য ছিল। যার ভিত্তিতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের বিষয়টি সামনে আসে। হিজরতের পর জিহাদের অনুমোদন আসে এবং শক্তির মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষা প্রদানের ঘোষণা আসে।

তবে আকাবাহ দ্বিতীয়'র বায়আতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিরক্ষা প্রদানের ঘোষণা থাকলেও জিহাদের প্রত্যক্ষ অনুমোদন আসেনি। যেমন আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাফলাহ'র প্রশ্নের: "যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের তরবারী দিয়ে আগামীকালই মিনাবাসীর ওপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো" উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:"আমাকে এর অনুমোদন প্রদান করা হয়নি; বরং তোমরা নিজেদের তাবুতে ফিরে যাও"[২]। অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের পর জিহাদের অনুমোদন এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকাবাহ দ্বিতীয়'র বায়আতে জিহাদের অনুমতি না আসলেও কুরাইশ তথা মক্কাহ'র মুশরিকদের নিকট বিদ্যুৎগতিতে এই সংবাদ পৌঁছে যায় এবং তাদেরকে খুবই প্রভাবিত করে বিধায় তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আরো কোণঠাসা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যায়ে কুরাইশদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

---

[১]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/২৫২। আরো বিস্তারিত দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১২২-১২৩।

[২]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/২৬৯।

মদীনায় হিজরতের অনুমোদন

সত্তর জন মদীনাবাসী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বায়আত গ্রহণ করার ঘটনায় তিনি এই ভেবে খুবই উৎসাহিত হন যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এক যোদ্ধাজাতিকে তাঁর প্রতিরক্ষা শক্তি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। মক্কাবাসী খাযরাজগোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর মক্কাহ'র মুসলিমদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। অতঃপর তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে অভিযোগ করে হিজরতের অনুমতি চাইলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:"আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং তা হলো ইয়াসরাব (মদীনার আদিনাম)। অতঃপর যে হিজরত করতে চাও তার পথে বেরিয়ে পড়া উচিত"। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরতের অনুমোদন আসলে মুসলিমগণ হিজরতের প্রস্তুতি শুরু করে দেন এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে গোপনে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু সালমাহ বিন আব্দিল আসাদ মদীনায় পৌঁছে যান। তারপর আমের বিন রাবীআহ সস্ত্রীক মদীনায় পৌঁছে যান। অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণ দলে দলে তবে গোপনে মদীনায় পৌঁছাতে থাকেন এবং আনসারগণ তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে মুহাজিরদের সসম্মানে আশ্রয় প্রদান করেন[১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের মধ্যে উমর (র) ব্যতীত সকলেই গোপনে হিজরত করেন। আলী (র) বর্ণনা করেন যে, উমর (র) যখন হিজরতের মনস্ত করলেন তখন তিনি তাঁর তরবারী ও ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নেন এবং হাতে তীর নিয়ে কাবাহ'র দিকে যান। কুরাইশদের একদল কাবা প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি ধীরে-সুস্থে শান্ত ও সাবলীলভাবে কাবাহ'র সাতবার তাওয়াফ করেন; তারপর মকামে ইবরাহীমে এসে নামায আদায় করে দাড়িয়ে বলেন:"চোখ-কান খোলা রেখে শুনো। আল্লাহ'র নির্দেশে হিজরত করা হচ্ছে। যে নিজের মায়ের কোল খালি করতে চায় অথবা নিজের সন্তানকে এতীম বানাতে চায় কিংবা নিজ স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় সে যেন নগরীর পাদদেশে আমাকে প্রতিরোধ করতে আসে"। আলী (র) আরো বর্ণনা করেন যে, কেউ তাঁর পিছু নিতে সাহস করেনি কিছু দুর্বল লোক ব্যতীত যাদেরকে তিনি পথ দেখানোর জন্য বলে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনা অভিমূখে রওনা হন[২]।

এভাবে ধীরে ধীরে সকল মুসলিমগণ দ্বীন পালনের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি দেন। মক্কাহ শুধুমাত্র আল্লাহ'র রাসুল (স), আবু বকর (র) ও আলী (র) অথবা যাদেরকে নির্যাতন করে আট্‌কে রাখা হয়েছে অথবা অসুস্থ কিংবা হিজরত করতে অক্ষম; তাঁরা ব্যতীত আর তেমন কোনো মুসলিম অবশিষ্ট ছিল না।

মূলত মক্কাহ নগরীতে মুসলিমদের প্রথম পরীক্ষা ছিল মুশরিকদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করা। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন তাঁরা ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও মাতৃভূমি ত্যাগের পরীক্ষায়ও উপনীত হন। তাঁরা আল্লাহ'র দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন বিধায় উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

---

[১]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:১/২১০-২১১ ও তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:১/৩৬৭।

[২]) ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, উস্‌দুল গাবাহ, প্রাগুক্ত:৪/৫৮।

আল্লাহ'র দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বল সব মক্কায় ছেড়ে এক কাপড়ে মদীনায় হিজরত করেন। দ্বীনের বিষয়ে ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও মাতৃভূমির মায়া তাঁদেরকে আটকাতে পারেনি। এটি ছিল সত্যিকার মুসলিমের প্রাণবন্ত আদর্শ।

অন্যদিকে মদীনার আনসারগণ তাঁদের মুহাজির ভাইদের সাহায্য-সহযোগিতায় অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য আদর্শ সৃষ্টি করেন; কারণ দ্বীনের আত্মীয়তা রক্তের আত্মীয়তা অপেক্ষা অনেক দৃঢ় ও শক্তিশালী। ইসলামের প্রাথামিক যুগে দ্বীনের বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহ'র রাস্তায় হিজরতের ওপর ভিত্তি করে মীরাস তথা উত্তরাধিকারের বিধান ছিল এবং মদীনায় পরিপূর্ণভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত রক্তের বন্ধনের ওপর উত্তরাধিকারের বিধান প্রতিষ্ঠা পায়নি। কুরআন করীমে এর চিত্রায়ন এসেছে:{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا }[এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যাঁরা ঈমান এনেছেন, হিজরত করেছেন, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করেছেন এবং যাঁরা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছেন, তারা একে অপরের বন্ধু সহায়ক। আর যাঁরা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে][১]।

এই হিজরতের ঘটনায় মুসলিমদের জন্য দুইটি শরয়ী বিধানের উৎপত্তি ঘটে:

ক) মুসলিমদের জন্য দারুল হার্‌ব (যুদ্ধাঞ্চল) থেকে দারুল ইসলামে (মুসলিম অঞ্চলে) হিজরত করা আবশ্যক। ইমাম কুরতুবী শায়খ ইব্‌নুল আরবী থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবদ্দশায় এই হিজরত ফরয ছিল এবং হিজরতের ফরযী বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে{لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية}[মক্কাহ বিজয়ের পর হিজরতের বিধান নেই; কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত যথাযথ বিদ্যমান][২] হাদীসের অর্থ হলো মক্কাহ বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে উদ্দেশ্য করে হিজরত করার বিধান ছিল এবং দারুল হার্‌বে (যুদ্ধাঞ্চল) অবস্থান করার অনুমোদন ছিল না[৩]। তবে মক্কাহ বিজয়ের পর মক্কাহ, মদীনাসহ সমগ্র আরবাঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কারণে মক্কাহ বিজয়ের পূর্বের ন্যায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় হিজরত করার বিধান রহিত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দারুল হার্‌ব বলতে ঐ অঞ্চলকে বুঝানো হয় যেখানে সালাত, সিয়াম, আযান-জামাতসহ ইসলামের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা পালনে মুসলিমদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। যা কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا }[নিশ্চয় ফেরেশতারা

---

[১]) সূরাহ আল-আনফাল:৭২।

[২]) সহীহ বুখারী [১৮৩৪] ও সহীহ মুসলিম [১৩৫৩ ও ১৮৬৪]।

[৩]) তাফসীরে কুরতুবী, প্রাগুক্ত:৫/৩৫০।

যাদের প্রাণ হরণ করে এমতাবস্থায় তারা নিজেদের ওপর অত্যাচারকারী তারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহ'র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ গন্তব্যস্থল। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না][১]।

খ) দেশ-অঞ্চল ও বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিমদের মধ্যে সম্ভবপর পারস্পরিক সহযোগিতা করা অবশ্যই কর্তব্য। উলামা ও ইসলামী গবেষকগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যদি মুসলিমগণ পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে নির্যাতিত-নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মুসলিম ভাইদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েও তা না করে, তারা বড় ধরনের পাপ করলো[২]।

---

১) সূরাহ আন-নিসা:৯৭-৯৮।

২) আবু বকর ইব্নুল আরবী, আহকামুল করআন, প্রাগুক্ত:২/৮৭৬।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হিজরত

অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসগ্রন্থ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে আবু বকর (র)'র বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন মুসলিমগণ একের পর এক সকলে মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট শেষ ব্যক্তি হিসেবে হিজরতের অনুমতি নিতে আসলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁকে বলেন: তোমার ইচ্ছে। আশা করি আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হবে। আবু বকর (র) বললেন: আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর বিসর্জিত হোক। আপনি কী তা আশা করছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সুতরাং আবু বকর (র) হিজরতকালে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সঙ্গ প্রদানের লক্ষ্যে হিজরত করা থেকে বিরত থাকলেন এবং দীর্ঘ চার মাস ধরে হিজরতের জন্য দেখা-শুনা করতে থাকা উষ্ট্রীদ্বয়ের ঘাঁস প্রস্তুত করতে লাগলেন[১]।

এমতাবস্থায় কুরাইশরা বুঝতে পারলো যে, মক্কাহ'র বাইরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র একটি প্রতিরক্ষা প্রদানকারী শক্তিশালী গোষ্ঠী ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে; সুতরাং তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতকে খুবই সতর্কভাবে পর্যাবেক্ষণে রেখেছে। পাশাপাশি তাদের এই ভয়ও পেয়ে বসেছে যে, তিনি না মদীনায় গিয়ে তাঁর সহযোগী শক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করেন। অতঃপর তারা দারুন নাদওয়াতে (এটি মূলত কুরাইশদের আদিপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের নির্মিত পরামর্শসভা, ঐতীহ্যগতভাবে তারা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানেই গ্রহণ করতো) পরামর্শসভায় বসে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যপারে কী করা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর শেষ পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি গোত্র থেকে একজন শক্তিশালী যুবক নির্বাচন করা হবে এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারী প্রদান করা হবে। অতঃপর তারা সকলে একযোগে মুহাম্মদ (স)'র ওপর তরবারী নিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করবে; যেন বনু আবদে মনাফ এক সাথে মক্কাহ'র সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম না হয়। এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট হিজরতের নির্দেশ নিয়ে জিবরীল আমীন আগমন করে সেই রাতে নিজ বিছানায় শুতে নিষেধ করেন[২]।

মা আয়েশা (র)'র বরাতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমরা দুপুরে আবু বকর (র)'র বাড়ীতে বসা ছিলাম। কে যেন আবু বকর (র) কে বললো: এই যে আল্লাহ'র রাসুল (স) আসছেন। এই সময়ে সাধারণত তিনি আমাদের কাছে আসেন না। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন: আমার মাতা-পিতা তাঁর ওপর বিসর্জিত হোক; এই অসময়ে অবশ্যই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁকে নিয়ে এসেছে। মা আয়েশা (র) বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অতঃপর তাঁকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আবু বকর (র) কে বললেন: তোমার আশে-পাশে যারা আছে তাদেরকে বের করে দাও। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন: হে

---

[১]) সহীহ বুখারী [২২৯৭]।

[২]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/১৫৫। তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:১/২০২।

আল্লাহ'র রাসুল (স) তারা আপনার পরিবারের সদস্যবৃন্দ। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন: দুটি বাহনের একটি আপনি গ্রহণ করুন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হ্যাঁ, তবে বিনিময়ের মাধ্যমে[১]।

মা আয়েশা (র) বলেন: আমরা তাঁদের দুজনের হিজরতের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম এবং সফরের খাবার তৈরী করে থলেতে রাখলাম। অতঃপর আসমা বিন্তে আবী বকর (র) তাঁর ওড়না ছিড়ে থলের মুখ বেঁধে দিলে তখন থেকে ইতিহাসে তাঁর নাম পড়ে যায় "যাতুন নিতাকাইন" বা দুই বন্ধনীওয়ালা আসমা[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) আলী (র)'র কাছে গিয়ে তাঁকে মক্কায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে থাকার নিদের্শ প্রদান করলেন যেন তাঁর নিকট সংরক্ষিত আমানতগুলো মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে মক্কাবাসী তাদের গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহ তাঁর নিকট আমানত রাখতো[৩]।

আবু বকর (র) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে নিদের্শ দেন যে, সে যেন দিনের বেলা মক্কাহ অবস্থান করে মক্কাবাসী তাঁদের সম্পর্কে কী বলাবলি করছে তা শুনে সন্ধ্যায় তাঁদের জানায় এবং তাঁর মুক্তদাস আমির বিন ফুহাইরাহকে দিনের বেলায় মেষপাল চরিয়ে সন্ধ্যায় সওর গুহায় এসে তাঁদেরকে দুধ পান করায় এবং তাঁর মেয়ে আসমাকে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের উপযোগী খাবার নিয়ে আসার নিদের্শ প্রদান করেন[৪]।

ইমাম আহমদ ও প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্ন ইসহাক উভয়ে আসমা বিন্তে আবী বকর (র)'র বরাতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন তখন আবু বকর (র)ও তাঁর সঙ্গে বের হন এবং তিনি তাঁর সকল সম্পদ (মুদ্রা) সঙ্গে নিয়ে যান; যার পরিমাণ পাঁচ অথবা ছয় হাজার দিরহাম[৫]। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, আমাদের ঘরে আমার দাদা আবু কুহাফাহ প্রবেশ করেন। বার্ধক্যের কারণে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন: সে সব সম্পদ (টাকা-পয়সা) নিয়ে গিয়ে তোমাদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। আমি বললাম: না দাদু। তিনি আমাদের জন্য অনেক (টাকা-পয়সা) রেখে গেছেন। তিনি (আসমা) বলেন: আমি কিছু পাথর কুড়িয়ে আমার বাবার টাকা রাখার পাত্রে রেখে তারপর কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে তাঁর হাত ধরে বললাম: দাদু আপনার হাত এই টাকার ওপর রাখুন। তখন তিনি বললেন: যদি তোমাদের জন্য এগুলো রেখে যায় তাহলে ঠিক আছে, তোমাদের এ দিয়ে চলে যাবে। আল্লাহ'র শপথ! তিনি কিছুই রেখে যাননি। আমি শুধু ওই বুড়োকে চুপ করানোর চেষ্টা করলাম[৬]।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৯০৫]।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৯০৫]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/১৫৫ ও তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২১২।

[৩]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/১৫৭।

[৪]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/১৫৮। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩২-১৩৩।

[৫]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত: ১/৪৮৮ ও মুসনাদ আহমদ, প্রাগুক্ত:২০/২৮২।

[৬]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১২২-১২৩।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হিজরতের বিবরণ

নির্দিষ্ট রাত্রিতে মুশরিকরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ঘরের দরজায় তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাহারায় বসলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের চোখে তন্দ্রা ঢেলে দেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) আলী (র) কে তাঁর বিছানায় শুয়ে রেখে (তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না আশ্বস্ত হয়ে) তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আল্লাহ'র রাসুল (স) আবু বকর (র) কে সঙ্গ নিয়ে (বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে নুবুওয়্যত প্রাপ্তির ১৩তম বছরের রবিউল আউয়াল মাসের ২তারিখ/ ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ) সওর গুহার দিকে রওনা হন। আবু বকর (র) প্রথমে গুহায় প্রবেশ করে হিংস্র প্রাণী কিংবা সাপ-বিচ্ছু আছে কি না দেখে নেয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) তথায় প্রবেশ করেন। গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান করেন। আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (র) তাঁদের সাথে রাত্রি যাপন করে মক্কাহ'র সংবাদ জানাতেন এবং রাতের অন্ধকারে পুনরায় মক্কাহ ফিরে যেতেন; যেন মক্কাবাসী বুঝতে পারে তিনি মক্কাহ রাত্রিযাপন করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (র) চলে আসার পর তাঁর পদচিহ্ন মুছে দিতে আমের বিন ফুহাইরাহ সেই রাস্তায় ছাগলের পাল নিয়ে ঘুরে যেতেন[১]।

অন্যদিকে মুশরিকরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চলে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর সন্ধানে মদীনার পথে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান করতে থাকে; এমন কী তারা সওর গুহার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর (র) উভয়ে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। আবু বকর (র) ঘাবড়ে গিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে কানে কানে বলেন যে, তারা নীচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখতে পাবে। তার উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: হে আবু বকর (র)! সেই দুইজন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয়জন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন?[২] সে বিষয়টি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন করীমে এভাবে চিত্রায়ন করেছেন:{إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}[যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন][৩]।

মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সফর সঙ্গীর অনুসন্ধান শেষ হলে আবদুল্লাহ বিন আরকাত বা উরাইকিত আল-লাইসী তাঁদের নিকট পৌঁছে (তখনো সে মুশরিক ছিল, তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার পর গোপন পথে মদীনায় পৌঁছানোর জন্য তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় এবং তাকে উট দুটো নিয়ে গুহার কাছে আসতে বলা হয়েছিল) যায়। অতঃপর তাঁরা আবদুল্লাহ বিন আরকতের পথপ্রদর্শনে সমুদ্রতীরবর্তী পথে মদীনার দিকে যাত্রা করেন[৪]।

এদিকে মক্কাবাসী আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সফর সঙ্গীকে যে ধরে নিয়ে আসতে পারবে তাকে একশ উট পুরস্কৃত করা হবে বলে ঘোষণা দেয়। সেই দিন বনু মুদলিজের

---

[১]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ১/১৬০ ও তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২১৫।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৬৫৩] ও মুসলিম [২৩৮১]।

[৩]) সূরাহ আল-তাওবাহ:৪০।

[৪]) সহীহ বুখারী [৩৯০৫]। বিস্তারিত দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১২৪।

একদল লোক নিজেদের বাড়ীর আঙ্গিনায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যাদের মধ্যে সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম ছিল। তখন এক লোক তাদের নিকট এসে বলে যে, আমি সমুদ্রতীরবর্তী পথে কিছু লোক যেতে দেখেছি। আমার মনে হয় আমি মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সঙ্গীকে দেখেছি। সুরাকাহ বুঝতে পারলো যে, এরা অবশ্যই মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সঙ্গী। তবে সে চাইছে না সে ছাড়া অন্য কেউ এদের সন্ধানে বের হোক; সুতরাং সে বললোঃ তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা আমাদের সামনে তাদের হারানো উট খোঁজতে বের হয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ ঐ বৈঠকে অবস্থান করে কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে সেইভাবে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত রওনা দেয় এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র খুব নিকটে পৌঁছে যায়। অতঃপর সে ঘোড়া থামাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তারপর দ্বিতীয়বার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পাওয়ার দূরত্বে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) এদিক সেদিক না তাকালেও আবু বকর (র) কে বারবার পিছনের দিকে তাকাতে দেখতে পায়। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর ওপর বদদোয়া করলে সুরাকাহ'র ঘোড়ার সামনের দুটি পা মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায় এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পুনরায় চেষ্টা করে ঘোড়ার পা বের করতে চাইলে প্রচন্ড ধোঁয়ার মতো ধুলা আকাশের দিকে উঠতে দেখতে পায়; সুতরাং সুরাকাহ নিশ্চিত হলো যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অতঃপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নাম ধরে ডাক দেয় এবং বলেঃ হে মুহাম্মদ (স)! আমি যেই মুসিবতে পড়েছি সেখান থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ'র কাছে দোয়া করুন। আর আমার পেছনে আপনাদের ধাওয়া করতে যে আসবে আমি তাকে অন্ধকারে রাখবো। অতঃপর সে তাঁদের দুজনকে নিরাপত্তা প্রদান করে ডাক দেয় এবং সে তাঁদের কোনো ক্ষতি করবে না বলে অঙ্গীকার করে[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সঙ্গীগণ থেমে গেলে সুরাকাহ তাঁদের নিকট পৌঁছে দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁদের সম্পর্কে কুরাইশদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সফরে ব্যবহৃত কিছু পাথেয় উপস্থাপন করলে তাঁরা দুজনেই প্রয়োজন নেই বলে ফিরিয়ে দেন। তবে তাঁদের সংবাদ গোপন রাখতে বলেন। অতঃপর সে বললোঃ প্রয়োজন পড়বে না আপনারা নিজেরাই যথেষ্ট[২]। অতঃপর আমি তাঁকে আমাকে নিরাপত্তানামা লিখে দেয়ার আবেদন করলে তিনি আমির বি ফুহাইরাহকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর আমির বিন ফুহাইরাহ এক টুকরো চামড়ায় তা লিখে দেন। সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম আরো বলেনঃ আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে বলেনঃ তোমার কেমন লাগবে যখন তোমাকে পারস্যসম্রাট কিসরা'র মুকুট পরানো হবে? অতঃপর খলীফা উমর (র)'র যুগে যখন পারস্যসম্রাট কিসরা'র মুকূট ও জামা আনা হয় তখন সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুমকে ডাকা হয় এবং এগুলো তাকে পরানো হয়। অতঃপর খলীফা উমর (র) তাকে বলেনঃ তোমার দুহাত ওপরে তোলো। অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহু আকবার, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি এই দুটোকে (মুকূট ও জামা) কিসরা বিন হুরমুয থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, যে দাবী করেছিল "আমি মানুষের রব" এবং এগুলো বনু মুদলিজের

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৯০৬ ৩৯০৮] ও মুসলিম [২০০৯]। বিস্তারিত দেখুনঃ সহীহ বুখারী, হিজরত অধ্যায়।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৬৫২] ও মুসলিম [২০০৯]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুনঃ আলী আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫৮-২৫৯।

বেদুঈন সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুমকে পরিয়েছেন। তারপর সুরাকাহকে বাহনে চড়িয়ে মদীনার বিভিন্ন গলি-পথ ঘুরানো হয়[১]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুমকে পারস্যসম্রাট কিসরা'র মুকূট পরানোর সুসংবাদ প্রদান ও পরবর্তীতে এর বাস্তবায়ন তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাসমূহের (মুজিযাহ) অর্ন্তভূক্ত।

সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম প্রথমে পুরস্কার লাভের আশায় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বন্দী করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করলেও পরবর্তীতে তার সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার কারণে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষে কাজ শুরু করে এবং যারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সন্ধানে তার পেছনে এসেছিল তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের মদীনায় পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চত হওয়ার পর তার সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা জনসম্মুখে তুলে ধরে এবং তা মানুষের মুখে মুখে মক্কানগরীর আলোচিত ঘটনায় পরিণত হয়; যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ঘাবড়ে যায়, এটি যেন মক্কাবাসীর মধ্যে কারো ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম বনু মুদলিজ গোত্রের প্রধান ছিল; সুতরাং সাধারণ লোকজন তার কথার মূল্যায়ন করবে এই বিবেচনায় আবু জাহল বনু মুদলিজের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখে, যার সারমর্ম নিম্মরূপ:

হে বনী মুদলিজ আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের নির্বোধ সুরাকাহ মুহাম্মদকে সহযোগিতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তোদের উচিত ঐক্য ধরে রাখা; অন্যথায় সম্মান ও নেতৃত্ব থেকে তোমরা ছিটকে পড়বে।

এর উত্তরে সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম আবু জাহলকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখে, যার সারমর্ম নিম্মরূপ:

হে আবুল হাকম আল্লাহ'র শপথ! তুমি যদি আমার ঘোড়ার ঘটনাটি'র প্রত্যক্ষদর্শী হতে যখন ঘোড়ার পাগুলো মাটির মধ্যে দেবে গিয়েছিল তখন তুমি জানতে পারতে এবং কোনো প্রকার সন্দেহ করতে না যে, মুহাম্মদ (স) নিঃসন্দেহে একজন রাসুল; সুতরাং তাঁকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। অতঃপর তোমার উচিত সাধরণ জনগণকে তাঁর বিরোধিতা থেকে রুখে দাঁড়ানো। আমি মনে করি তাঁর বিষয়টি খুব শীঘ্রই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে এবং সমগ্র আরব তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে[২]।

---

[১]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফিল-কুরআনিল করীম, দারুল কালম, দামেস্ক, ১৪১৭ হি:/১৯৯৬ ইং: ১/৪৯৫।

[২]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফিল-কুরআনিল করীম, প্রগুক্ত:১/৮৯৪।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কুবায় অতঃপর মদীনায় আগমন

আল্লাহ'র রাসুল (স) কুবায় আগমন করলে সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানান এবং তিনি সেখানে কুলছুম বিন হাদ্‌মের নিকট কয়েক দিন অবস্থান করেন; যেখানে আলী (র) আল্লাহ'র রাসুল (স) কাছে রক্ষিত মক্কাবাসীর আমানত স্ব স্ব মালিকদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন। আল্লাহ'র রাসুল (স) কুবায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন; যার বর্ণনা কুরআন করীমে এসেছে:{ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}[তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার নামাযে দাঁড়াবার যোগ্য স্থান][১]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং ইতিহাসবিদ মাসউদীর বর্ণনা মতে **১২** রবিউল আউয়াল তিনি মদীনায় পৌঁছে যান[২]।

তাঁর বাহন মদীনায় পৌঁছালে আনসারগণ তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরেন এবং প্রতিজনই তাঁর বাহনের লাগাম ধরে নিজের কাছে রাখতে চাইলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: বাহনকে তোমরা ছেড়ে দাও সে নির্দেশিত স্থানে থেমে যাবে। অতঃপর বাহন মদীনার বিভিন্ন গলি-পথ ঘুরে আবু আইউব আনসারী (র)'র বাড়ীর সামনে বনু নাজ্জারের দুই অনাথ কিশোরের খেজুর শুকানোর স্থানে থেমে গেলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: ইন শা আল্লাহ এটিই মঞ্জিল। আবু আইউব আনসারী (র) এসে বাহন তাঁর বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলে বনু নাজ্জারের ছোট্ট মেয়েরা খুশিতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অগ্রভাগে এসে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে গাইতে থাকে:

نحن جوار من بني النجار * يا حبذا محمد من جار

আমরা বনু নাজ্জারের কন্যাশিশু * মুহাম্মদ (স) যার চমৎকার প্রতিবেশী

আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের বলেন: তোমরা কী আমাকে ভালোবাসো, তারা বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলেন: মহান রাব্বুল আলামীন জানেন আমার হৃদয় তোমাদের ভালোবাসে।

আবু আইউবগৃহে রাসুল (স)'র অবস্থান

আবু বকর বিন আবী শায়বাহ, ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সকলেই বিভিন্ন সনদে কাছাকাছি শব্দমালায় আবু আইউব আনসারী (র)'র বরাতে তাঁর গৃহে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অবস্থান কালের বর্ণনা প্রদান করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন আমাদের বাড়ীতে অতিথি হলেন তিনি বাড়ীর নীচ তলায় আর আমি এবং আমার স্ত্রী আইউবের মা ওপরের তলায় অবস্থান করি। তখন আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললাম: হে আল্লাহ'র নবী (স)! আমার সংকোচ হয় যে, আপনি নীচে এবং আমরা আপনার ওপরে থাকি; সুতরাং আপনি যদি দয়া করে ওপরে অবস্থান করেন তাহলে আমরা নীচে আর আপনি

[১]) সূরাহ আল-তাওবাহ:১০৮।

[২]) আল-মাসউদী: মুরুজুয যাহাব, তারিখ ব্যতীত, বৈরুত:২/২৭৯।

ওপরে অবস্থান করবেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হে আবু আইউব! আমরা ঘরের নীচ তলায় খুব ভালো অবস্থায় আছি। এটি নিয়ে সংকোচ করার কোনো প্রয়োজন নেই[১]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) নীচে আর আমরা ওপরে অবস্থান করতে থাকি। একদিন হঠাৎ পানির একটি মুশক/কলস ভেঙ্গে যায়। আমি এবং আইউবের মা একটি কাঁথায় থাকতাম। আমাদের এটি ছাড়া পানি শোষনের কোনো মোটা কাপড় জাতীয় কিছুই ছিল না। ওপর থেকে পানি পড়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে পীড়া দেয় এই ভয়ে আমি তাঁর কাছে ভয়ার্থ হয়ে এসে বারবার অনুরোধ করে তাঁকে ওপরে নিয়ে যাই।

তিনি আরো বলেন: আমরা তাঁর জন্য রাতের খাবার পাঠাতাম। তারপর তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে উচ্ছিষ্ট খাবার আমাদের ফিরিয়ে দিলে আমি এবং উম্মে আইউব পাত্রে তাঁর হাত রাখার স্থান খুঁজে বরকত মনে করে সেখান থেকে খাওয়া শুরু করতাম। একদিন তাঁর জন্য পেয়াঁজ-রসুন দিয়ে খাবার তৈরী করে পাঠালাম। অতঃপর তিনি ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু আমরা কোথাও তাঁর হাতের চিহ্ন না পেয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে বললাম: হে আল্লাহ'র রাসুল (স) আপনি খাবার ফিরিয়ে দিয়েছেন; অথচ তাতে আপনার হাতের কোনো চিহ্ন পাইনি। আমরা আপনার হাতের চিহ্ন দেখে আপনার উচ্ছিষ্ট খাবার বরকত মনে করে খাবার গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি বললেন: আমি খাবারে এই উদ্ভিদের (পেয়াঁজ-রসুন) গন্ধ পেয়েছি বিধায় খাইনি। আমি তো ফেরেস্তাদের সাথে সাক্ষাত করি তাই গন্ধময় বস্তু এড়িয়ে যেতে হয়; তবে তোমরা খেয়ে নাও। তিনি বলেন: অতঃপর আমরা খেলাম এবং এর পরে আর কখনো তাঁর খাবারে আমরা পেয়াঁজ রসুন ব্যবহার করিনি[২]।

হিজরতের উপদেশ ও শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরতের মধ্যে রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা এবং মুসলিমদের দ্বীনি ও পার্থিব জীবনে চলার পথে অসংখ্য পাথেয় রয়েছে; যার কিছু নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) হিজরতের বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে যে, হিজরতের অনুমোদন আসার পর মুসলিমগণ একে একে গোপনে সকলে চলে গেলেও আবু বকর (র) কিন্তু চলে যাননি বরং তিনি হিজরতের কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সান্নিধ্যে থাকার জন্য মক্কায় থেকে যান। সুতরাং ইসলামী গবেষকগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি আবু বকর (র)'র ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি এবং তাঁর অবর্তমানে তিনিই মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি। যার প্রতি স্বয়ং আল্লাহ'র রাসুল (স) ইঙ্গিত করেছেন তাঁর অসুস্থতার সময় নামাযের ইমামতী করার নির্দেশের মাধ্যমে, পাশপাশি আল্লাহ'র রাসুল (স) আরো বলেন:{لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا}[আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম][৩]। যার

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১২৫।

[২]) ইব্‌ন হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবাহ, প্রাগুক্ত:১/৪০৫, সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৪৭৯ ও মুসনাদ আহমদ, প্রাগুক্ত:২০/২৯২।

[৩]) সহীহ মুসলিম [২৩৮৩] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৬৮৫৬]।

প্রমাণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করার পর থেকে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পদে পদে রেখে গেছেন। হিজরতের কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তের জন্য চার মাস পূর্বে বাহন প্রস্তুত করে রাখা, নিজের সকল ধন-সম্পদ নিয়ে যাওয়া, নিজের পুত্র-কন্যা এমন কী রাখালকে পর্যন্ত হিজরতের অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সেবায় নিয়োজিত রাখা এবং গুহায় নিজে প্রথমে প্রবেশ করে আল্লাহর রাসুল (স)'র অবস্থানকে সাপ-বিচ্ছু ও হিংস্র প্রাণীমুক্ত নিশ্চিত করার মতো অসংখ্য ঘটনা তার বাস্তবসাক্ষী। এটি মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সেই স্মরণীয় বাণীর বাস্তব চিত্রায়ন, যে তিনি এরশাদ করেন:{لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين}[তোমাদের কেউ ততক্ষণ সত্যিকারের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হই][১]।

২) স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, উমর (র) যেখানে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে ঘোষণা দিয়ে হিজরত করলেন সেখানে আল্লাহ'র রাসুল (স) অতি গোপনে রাতের অন্ধকারে হিজরত করলেন কেন? উমর (র) কী দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ'র রাসুল (স) অপেক্ষা বেশি সাহসী ও দৃঢ়? এর উত্তরে বলা যায় যে, তা মোটেই নয়; তবে উমর (র) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমগণের যত পুণ্যময় কাজ আদায় করা হোক তার কোনোটাই সার্বিকভাবে ইসলামের বিধান হিসেবে স্বীকৃত হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সম্পৃক্ত সকল কথা, কর্ম, সীরাহ ও মৌনতা ইসলামী শরীয়াহ বা বিধানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত বিধায় তিনি যদি উমর (র)'র ন্যায় প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে হিজরত করতেন তাহলে তা পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হয়ে যেত এবং ভয়ার্ত ও সতর্কাবস্থায়ও গোপনে হিজরত করার বিধান থাকতো না। যেহেতু পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মে চলে অনেক ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পরিবেশ মুসলিমদের অনুকূলে না থাকলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গোপনে হিজরত করার বিধান থাকতো না; যা বাস্তবতা পরিপন্থী এবং ইসলাম বাস্তববাদী দ্বীন বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) শিক্ষা দিয়েছেন যে, সবক্ষেত্রে আবেগ দিয়ে কাজ করা যাবে না; বরং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে।

সুতরাং প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ'র রাসুল (স) বাহ্যিকভাবে পার্থিব পন্থা ব্যবহার করেছেন। ক্ষতি হবে না নিশ্চিত হয়ে আলীকে নিজ বিছানায় নিজের চাদর দিয়ে আবৃত অবস্থায় রেখে এসেছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) মুশরিকদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে নয় বরং সতর্কতার কারণে, অন্ধকার গুহায় তিন দিন অবস্থান করেছেন; কারণ তাঁর মনে যে কোনো প্রকার ভয় কাজ করেনি তা আবু বকর (র) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাণী থেকে সহজেই অনুমেয়: হে আবু বকর (র) সেই দুইজন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয়জন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন?[২]

আরো প্রতীয়মান হয় যে, সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বন্দী বা হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসলে তাঁর সফরসঙ্গী বারবার ফিরে তাকালেও তাঁর কুরআন করীমের তেলাওয়াতে কোনো প্রকার বিঘ্নতা ঘটেনি; কারণ তিনি

---

[১]) সহীহ বুখারী [১৫]।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৬৫৩] ও মুসলিম [২৩৮১]।

অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানতেন যিনি তাঁকে হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেছেন তিনি অবশ্যই তাঁকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। এমনকি যাদের ভয়ে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে পরবাসে পাড়ী দিচ্ছেন; আশ্বস্ত হওয়ার পর গোপন পথের সন্ধান প্রদানের জন্য তাদেরই এক মুশরিকের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। উক্ত ঘটনা থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অনভিজ্ঞ মুসলিমের পরিবর্তে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ অমুসলিমকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ প্রদানে ইসলামের অনুমোদন রয়েছে।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে রক্ষিত কুরাইশদের আমানত মালিকদের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আলী (র) কে রেখে আসা'র মধ্যে রয়েছে আমানতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের পাশাপাশি একটি খুবই সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা যে, কুরাইশরা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে যাদুকর ও মিথ্যুক হিসেবে আখ্যা দিলেও তাদের মূল্যবান বস্তুর আমানতের বিষয়ে তাঁকেই মক্কাবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে মনে করে তাঁর কাছে আমানত রাখতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরাইশদের আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে দাড়ানো তাঁর সততার ওপর সন্দেহের কারণে নয়; বরং তাদের নেতৃত্বের অবসানের ভয়েই ঘটেছিল।

৪) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বন্দী বা হত্যার উদ্দেশ্যে আগত যোদ্ধা সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম ও তার ঘোড়ার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাসমূহের অন্যতম; যা সুরাকাহ নিজে বুঝতে পেরে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ সকল বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণীত হয়েছে।

৫) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দরজায় পাহারারত কুরাইশ যুবকদের বেষ্টনী অতিক্রম করে ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময় তাদের কারো নজরে না পড়াও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাসমূহের একটি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বালি নিক্ষেপ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকলের চোখে-মুখে বালি পড়ে যায়। তখন তিনি কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:{ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُون}[আমি তাদের সম্মুখে বাধার সৃষ্টি করেছি এবং তাদের পেছনে বাধার সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করে ফেলেছি; সুতরাং তারা দেখতে পারে না][১]।

৬) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আগমনকে কেন্দ্র করে মদীনাবাসী অবাল-বৃদ্ধ যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ কখনো সম্ভব নয়। তাঁদের সামর্থ্য সীমিত হলেও তাঁদের ভালোবাসা খুবই দৃঢ় ও আন্তরিক এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামের জন্য তাঁদের বিসর্জনের কথা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরদিন।

[১]) সূরাহ ইয়াসীন:৮।

তৃতীয় অধ্যায়

মদীনায় নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন
মসজিদ নির্মাণ
মুহাজির-আনসারদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা
মদীনার সনদ প্রণয়ন
জিহাদের প্রসঙ্গ কথা
ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
বদর অভিমূখে অভিযান
বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান
উহুদ অভিমূখে অভিযান
বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান
যাতুর রিকাই'র অভিযান
বনু আল-মুসতালাক অভিমূখে অভিযান
ইফ্কের ঘটনা ও এর শিক্ষা
আহযাবের যুদ্ধ
বনু কুরাইযাহ'র বিরুদ্ধে অভিযান
হুদাইবিয়ার সন্ধি
খাইবার অভিমূখে অভিযান
আরব উপ-জাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান
ওমরাতুল কাযা
মূতাহ অভিমূখে অভিযান
মক্কাহ বিজয়ের অভিযান
হুনায়ন অভিমূখে অভিযান
তাবুক অভিমূখে অভিযান

নবযুগের সূচনা

মদীনায় নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্দীপনার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ'র ভিত্তিতে নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরত ছিল পৃথিবীর বুকে প্রথম দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা। সুতরাং মদীনায় আগমনের পর তিনি সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথম: মসজিদ নির্মাণ।

দ্বিতীয়: মুসলিম তথা মুহাজির-আনসার মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয়: মদীনায় অবস্থানরত অদিবাসীদের জন্য একটি সংবিধি (মদীনার সনদ নামে খ্যাত) প্রণয়ন।

মসজিদ নির্মাণ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাহন উটটি মদীনার বিভিন্ন অলি-গলি ঘুরে আসআদ বিন যুরারাহ (র)'র তত্ত্বাবধানে লালিত বনু নাজ্জারের দুই অনাথ কিশোরের খেজুর শুকানোর স্থানে পৌঁছালে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: ইন শা আল্লাহ এটিই মঞ্জিল। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের পূর্বে আসআদ বিন যুরারাহ (র) উক্ত স্থানটি ইবাদাতগাহ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে সেখানে নামায আদায় করতেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) এ স্থানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করে আসআদ বিন যুরারাহ (র)'র তত্ত্বাবধানে লালিত দুই অনাথ কিশোরদের ঐ স্থানের মূল্য জিজ্ঞাসা করলে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললো: আমরা আপনাকে হেবা (দান) করতে চাই। আল্লাহ'র রাসুল (স) হেবা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের কাছ থেকে দশ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে উক্ত জমি ক্রয় করলেন। আবু বকর (র) তাদেরকে জমির মূল্য পরিশোধ করেছিলেন[১]।

আনাস বিন মালিক (র) থেকে বর্ণিত: আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় আগমন করলেন। অতঃপর মদীনার উপরিভাগে বনু আমর বিন আওফ গোত্রে তিনি প্রায় চৌদ্দদিন অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারের লোকদের আসার জন্য সংবাদ পাঠালে তাঁরা তরবারী সজ্জিত হয়ে আসলেন। আমি বাহনে আরোহিত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং বাহনের পিছনে আবু বকর (র) বসেছিলেন। তাঁর চতুর্পার্শ্বে বনু নাজ্জার আবু আইউব আনসারীর বাড়ীর প্রাঙ্গণে নিয়ে আসলেন। তিনি যেখানে নামাযের সময় হতো সেখানেই নামায আদায় করা পছন্দ করতেন বিধায় ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায আদায় করে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বনু নাজ্জারের লোকদের ডেকে বললেন: হে বনু নাজ্জার! তোমাদের এই বাগানের মূল্য বলো। তারা বললো: না। আমরা মূল্য নিব না; বরং আল্লাহ'র নামে প্রদান করবো। আনাস (র) বললেন: সেখানে আমি তোমাদের যা বললাম মুশরিকদের কবর, টিলা ও খেজুর বৃক্ষ ছিল। অতঃপর আল্লাহ'র

---

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৪/২৫৮ ও ৭/২৮২, তাবকাতু ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/৪, যারকশী'র ইলামুস সাজিদ ফী আহকামিল মাসাজিদ, প্রাগুক্ত:পৃ-২২৩।

রাসুল (স) মুশরিকদের কবর খনন করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার, টিলাগুলো সমান করার এবং খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে তা যথাযথভাবে পালন করা হয়। খেজুর গাছগুলো দিয়ে সারীবদ্ধভাবে মসজিদের কিবলাহ তৈরী করা হয় এবং পাথর দিয়ে আরো মজবুত ও শক্ত করা হয়; তাঁরা সম্মিলিতভাবে কবিতার ছন্দে ছন্দে পাথর বহন করেছিলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)ও তাঁদের সাথে ছন্দে ছন্দে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদেরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে বলেছিলেন:

اللَّهُمَّ لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر الأنصار والمهاجرة

পরকালের কল্যাণ ব্যতীত কোনো কল্যাণ নেই

হে আল্লাহ! তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করো[১]।

মসজিদে নাবভী কোনো সংযোজন-বিয়োজন ব্যতীত আবু বকর (র)'র খিলাফতকাল পর্যন্ত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্মাণই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর খলীফা উমর (র) কিছুটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। পরবর্তীতে খলীফা উসমান (র) পাকা ইট ও নকশাযুক্ত পাথর দিয়ে মসজিদের দেওয়াল নির্মাণ ও বড় করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছিলেন[২]।

মসজিদ নির্মাণের বিধান ও শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মুসলিমদের (আনসার ও মুহাজির) নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মজবুত ও টেকসই ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপ ধারণ করে এবং এই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হলো মসজিদ নির্মাণ। মসজিদ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপদানসমূহ নিম্নরূপ:

ক) **ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মসজিদের গুরুত্ব:** এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মসজিদ নির্মাণ মজবুত ও টেকসই ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একদিকে আক্বীদাহসহ ইসলামী বিধি-বিধান পালন ও সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সমাজব্যবস্থা টেকসই হয়। অন্যদিকে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করাও ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ, এগুলোর প্রধান উৎস অবশ্যই মসজিদ। কারণ ইসলাম তার অনুসারীদের দৈনিক পাঁচবার মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে; যার মাধ্যমে মুসলিমগণ দ্বীন অনুশীলনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার সুযোগ পান এবং প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-জনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করতে পারেন। তাছাড়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সমস্যাসমূহ কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়ার কারণে দ্রুত তা সমাধানের সুযোগ পান। সুতরাং মসজিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক যত মজবুত ও টেকসই হবে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ততই এগিয়ে যাবে।

খ) মসজিদ নির্মাণের অর্থের উৎস: আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় মসজিদ নির্মাণের জমি নিজ অর্থে ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। জমির মালিক তাঁকে

---

১) সহীহ বুখারী [৪২৮] ও সহীহ মুসলিম [৫২৪]।

২) যারকশী'র ইলামুস সাজিদ ফী আহকামিল মাসাজিদ, প্রাগুক্ত,পৃ:২২৪-২২৫।

হেবার প্রস্তাব করলেও মালিক নাবালক ইয়াতিম হওয়ার কারণে তা গ্রহণ করতে অপরাগতা প্রকাশ করছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই পদক্ষেপ থেকে শিশু ও ইয়াতিমের সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}[ইয়াতিমের ধন-সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়][১]। পাশাপাশি আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজে মসজিদের জমির মূল্য পরিশোধ করে উম্মাহকে শিক্ষা দিলেন যে, মসজিদ নির্মাণ স্থানীয় মুসলিমদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মুসলিমগণের বৈধ উপার্জনের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা অপিরহার্য কর্তব্য। কুরআন করীমে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে নিদের্শনা এসেছে:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}[একান্তভাবে তারাই আল্লাহ'র মসজিদ নির্মাণ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ'র প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে][২]। উপরিউক্ত আয়াতে মসজিদ নির্মাণকারীদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তার থেকে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, পরিপূর্ণ মুমিনগণ ব্যতীত কারো পক্ষে মসজিদ নির্মাণ করা সহজ নয়। মুমিনগণ নিজের উপার্জিত বৈধ অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করবেন। সুতরাং অবৈধ অর্থ কিংবা যাকাত, ফিতরা, কাফ্ফারা ও মানতের অর্থ মসজিদ নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য নয়। শুধুমাত্র মুমিনদের হেবা ও দানের অর্থই মসজিদ নর্মিাণে ব্যবহারযোগ্য। অনুরূপভাবে সহজেই অনুমেয় যে, মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত গুনাবলী সম্বলিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদের হাতে প্রদান করা উচিত নয়।

গ) কবরস্তানে মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়: আনস (র) থেকে বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহ'র রাসুল (স) মুশরিকদের পুরানো কবর খনন করে হাঁড়-কংকাল অন্যত্র সরানোর নির্দেশ প্রদান থেকে সহজেই অনুমেয় যে, কবরস্তানে মসজিদ নির্মাণ বৈধ হলে পুরানো কবরের হাঁড় সরানোর নির্দেশ প্রদান করতেন না। পাশাপাশি জমি কবরস্তানের জন্য ওয়াক্ফ না হলে তা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা যাবে। তবে জমি কবরস্তান বা অন্য কোনো কাজের জন্য ওয়াক্ফকৃত হলে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয় বলে ইসলামী গবেষকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন[৩]।

ঘ) **মসজিদ নির্মাণে শারীরিক ও আর্থিকভাবে অংশগ্রহণের গুরুত্ব:** আল্লাহ'র রাসুল (স) মসজিদের জমির মূল্য পরিশোধ করেছেন। সাহাবাগণের সাথে মসজিদ নির্মাণের জন্য পাথর বহন করে শারীরিকভাবেও মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন যা উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি সাহাবাদের সাথে কবিতার ছন্দে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁদেরকে ভালো কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। উক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লীডারের উচিত নিজ অনুসারীদের ভালো কাজে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণা প্রদান করা; যাতে করে

---

১) সূরাহ আল-আনআম:১৫২।

২) সূরাহ আত-তাওবাহ:১৮।

৩) যারাকশী'র ইলামুস সাজিদ ফী আহকামিল মাসাজিদ, প্রাগুক্ত,পৃ:২৩৬।

অনুসারীগণ বুঝতে পারেন যে, তাদের নেতা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত একজন, যেমনটি আল্লাহ'র রাসুল (স) একাধিকবার করেছিলেন[১]।

মুহাজির-আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় আগমনের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল নিঃস্ব মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা; যাতে করে মুসলিমদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না থাকে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দপূণ্য সম্পর্ক বিরাজ করে, যার মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গঠন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ হয়। উক্ত ভ্রাতৃত প্রতিষ্ঠা শুধু দ্বীনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ছে তা নয়, বৈষয়িক ক্ষেত্রেও তা বিবেচনা করা হয়েছিল। সহীহ বুখারীর বর্ণনামতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে মুহাজিরগণ আত্মীয়তা ব্যতীত আনসারদের সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন[২]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পরবর্তীতে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল, যা নিম্মরূপ:

ক) ইসলাম অন্ধকার যুগের পারিবারিক, সামাজিক, গোত্রীয় ও ধর্মীয় মতবিরোধ নিরসনের ঘোষণা দিয়ে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ভালোবাসার বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ধনী-গরীবের পার্থক্য এবং অভিজাত্য ও কৌলণ্যের প্রাধান্য ইসলাম অনুমোদন করে না, তাকওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাফকাঠি। প্রথমে আল্লাহ'র রাসুল (স) ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাহ নগরীর শিক্ষিত-অভিজাত কুরাইশ ও সাধারণ নাগরিক এবং নিম্মশ্রেণীর দাস-দাসীদের মধ্যে দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করে উভয় শ্রেণীর মধ্যকার দূরত্ব নিরসন করেছিলেন[৩]।

খ) আনসারগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে স্ত্রী-সন্তানদের মতো প্রতিরক্ষা প্রদান করবেন এই মর্মে আকবাহ দ্বিতীয়তে অঙ্গীকার করেছিলেন। মুহাজিরগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) ও ইসলামকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-সন্তান, সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী ও মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে এক কাপড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ'র রাসুল (স) মুহাজির-আনসারদের মধ্যে এমন দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন যে, আনসারগণ সর্বোচ্চ ত্যাগ ও বিসর্জন দিয়ে নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলেন। সহায়-সম্পত্তি, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ী এমনকি নিজেদের স্ত্রীদের পর্যন্ত ভাগাভাগী করে নিয়েছিলেন যা মানব ইতিহাসে সত্যিই বিরল[৪]।

গ) কোনো রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা নাগরিকদের ঐক্য ও সহযোগিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠা পায় না। ঐক্য ও সহযোগিতা পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছাড়া টেকসই হয় না। যেহেতু

---

১) মসজিদে নাবভী'র নির্মাণ ছাড়াও আল্লাহ'র রাসুল (স) আহযাব যুদ্ধে পরিখা খননেও শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন দেখুন: সীরাতে ইবন হিশামসহ অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থের আহযাব যুদ্ধ অধ্যায়।

২) সহীহ বুখারী [৩৯২৬]।

৩) ইবন আবদিল বার'র মতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনা দুবার ঘটেছিল: প্রথমে মক্কায় ও পরবর্তীতে হিজরতের পর মদীনায়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন সাইয়্যিদুন্নাস, উয়ূনুল আসার:১/১৯৮।

৪) মুহাজির-আনসার মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয় অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৪৭-১৫০।

আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় হিজরতের পর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কর্ণধার হলো আনসার (স্থানীয়) ও মুহাজিরগণ (বহিরাগত)। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিভাজন পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ভিত নড়বড়ে করে দিতে পারে বিধায় তিনি বিচক্ষণতার সাথে তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বীজ রোপন করেছিলেন। পরবর্তীতে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্রে বনু মুসতালাক যুদ্ধে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা[১] ব্যতীত সাহাবীদের মধ্যে অন্য কোনো ইস্যুতে বিভাজন হলেও আনসার-মুহাজির (স্থানীয়-বহিরাগত) ইস্যুতে কখনো বিভাজন দৃশ্যমান হয়নি।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অপেক্ষা দ্বীনি সম্পর্কের ভীত অনেক মজবুত ও টেকসই। আত্মীয়তার সম্পর্কের ভীত বৈষয়িক স্বার্থে নড়বড়ে হলেও দ্বীনি সম্পর্কের ভীত কখনো নড়বড়ে হয় না।

মদীনার সনদ প্রণয়ন

মদীনায় অবস্থানরত অদিবাসীদের আচরণবিধি (মদীনার সনদ নামে খ্যাত) প্রণয়ন ছিল মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভিত্তি। প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইবন হিশামের বর্ণনামতে আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় আগমনের পর ইসলাম মদীনাস্থ সাধারণ আরবের দ্বীনে পরিণত হয়। আনসারদের মধ্যে আউস গোত্রের কথিপয় ব্যক্তি ব্যতীত কোনো ঘর-বাড়ী অবশিষ্ট ছিল না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি। অতঃপর তিনি মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিম (আনসার ও মুহাজির), আহলে কিতাব ও বেদুঈনদের নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা সনদ বা সংবিধি প্রণয়ন করলেন; যার মাধ্যমে সংবিধিতে স্বাক্ষরিত প্রতিটি গোত্র নিজেদের দ্বীনের পরিচর্চা, আর্থিক লেন-দেনসহ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার সুযোগ পাবে। কেউ অন্যের ধর্ম ও সম্পদের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং সম্মিলিতভাবে মদীনার বহিশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে সনদে স্বাক্ষরিত গোত্রসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।

ঐতিহাসিক মদীনার সনদ মানব ইতিহাসে রচিত ৪৭টি ধারা-উপধারা সম্বলিত প্রথম সংবিধান। ৪৭টি ধারা-উপধারাকে মৌলিক ১২টি ধারায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হলো:

১) কুরাইশদের অন্তর্ভূক্ত মুসলিম ও ইয়াসরাববাসী এবং তাদের অধীনস্থ হয়ে যারা সম্মিলিতভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে সমগ্র মানবজাতি থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র জাতি বা উম্মাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। শুধুমাত্র ইসলামই সমগ্র মুসলিম জাতির ঐক্যের মৌলিক ভিত্তি ও এক জাতিতে রূপান্তিত করেছে। ইসলামে গ্রোত্র বা গোষ্ঠীগত পার্থক্যের কোনো ভিত্তি নেই। ইহুদীদের মধ্যে যারা শান্তিপূর্ণ টেকসই সমাজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করবে তারাও মুসলিম জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।

২) গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিম জাতি নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। তাদের পারস্পরিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বের নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে। তারা নিজেদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ

[১]) উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরাহ আল-মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থ ও সীরাত গ্রন্থে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২০২-২০৪।

আদায় করবে যেন মুসলিমগণের মাঝে পারস্পরিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি বজায় থাকে। মুসলিমগণ কখনো তাদের কোনো ঋণগ্রস্ত্র ও বিপদগস্ত্র ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মুক্তিপণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো মিত্রের বিরোধিতা করবে না।

৩) নিশ্চয় খোদাভীরু মুমিনগণ তাদের মাঝে বিদ্রোহী, চরম নির্যাতনকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, মুসলিমগণের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অবস্থান করবেন। সে তাদের কারো সন্তান হলেও সম্মিলিতভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪) কাফিরকে হত্যার দায়ে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না। আর কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সে কাফিরকে সাহায্য করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা সবার জন্য সমান। নগণ্যতম ব্যক্তিও আশ্রয় প্রদানে সক্ষম। অন্য সকলের ন্যায় মুমিনগণ একে অপরের মিত্র হিসেবে গণ্য হবে। আর ইহুদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলিমদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে সে মুসলিমদের সাহায্য ও সমাধিকার লাভ করবে। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে কোনো যুলুম-নির্যাতন করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

৫) নিশ্চয় মুমিনগণের পক্ষ থেকে সম্পাদিত সন্ধি হবে এক ও অভিন্ন। আল্লাহ'র পথে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হলে কোনো মুমিন এককভাবে নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো চুক্তি করতে পারবে না যা সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। মদীনার কোনো মুশরিক কুরাইশদের কাউকে ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বা জীবনের আশ্রয় দিতে পারবে না। একইভাবে সে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলিমকে সাহায্য করতে পারবে না।

৬) কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তাকে কিসাসে হত্যা করা হবে। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ নিতে সম্মত হলে সে কথা ভিন্ন। সকল মুমিনের জন্য এই বিধান অবশ্যই পালনীয়। এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি তাদের জন্য বৈধ নয়।

৭) এই ঘোষণাপত্র মান্যকারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো মুমিন কোনো নতুন সংযোজনকারীকে সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করলে তার ওপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ'র অভিশাপ ও ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর তার কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

৮) বনু আওফ গোত্রের ইহুদীরা মুমিনগণের সাথে একই উম্মতভূক্ত বলে গণ্য হবে। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম। একই কথা এদের মিত্রদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে যে সীমালঙ্ঘন করবে এবং অপরাধ করবে সে কেবল নিজেকে এবং নিজ পরিবারকেই বিপদগ্রস্থ করবে। হ্যাঁ, নিহত ব্যক্তি অপরাধী হলে সেটা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট যে এই বিধানকে মান্য করবে।

৯) ইহুদীরা তাদের নিজেদের (যুদ্ধ) ব্যয় নিজেরা বহন করবে। মুসলিমগণ তাদের নিজেদের (যুদ্ধ) ব্যয় নিজেরাই বহন করবেন। আর যারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিপক্ষে সহযোগিতা করা চুক্তিবদ্ধ সবার জন্য আবশ্যক হবে। চুক্তিবদ্ধ দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুভকামনা ও সদুপদেশের সম্পর্ক

থাকবে। তাদের মাঝে অন্যায় ও অপরাধের পরিবর্তে উদারতা ও মহানুভবতার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে।
১০) নিশ্চয় মিত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করা হবে না। অবশ্যই নিপীড়িতকে সাহায্য করা হবে। প্রতিবেশীরা নিজেদের লোকদের মতোই নিরাপত্তা ভোগ করবে, তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করা হবে না। আর তারাও কোনো অপরাধে লিপ্ত হবে না। নগরবাসীর অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির আশ্রয় প্রদান প্রতিষ্ঠিত হবে না।
১১) এই চুক্তিপত্র কোনো অত্যাচারী বা চুক্তি লঙ্ঘনকারীর জন্য রক্ষাকবচ নয়। যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়, তার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর যে ব্যক্তি (যুদ্ধে না গিয়ে) নিষ্ক্রয় বাড়ীতে বসে থাকবে তার জন্যও রয়েছে নিরাপত্তা। তবে যে সীমালঙ্ঘন করে কিংবা চুক্তি লঙ্ঘন করে তার কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি সততা ও খোদাভীতির পথে অবিচল থাকবে আল্লাহ ও মুহাম্মদ (স) তার আশ্রয়দাতা ও সহায়ক হবেন।
১২) এই চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদের মাঝে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা দ্বন্দ্ব-কলহের ফলে কোনো নৈরাজ্য কিংবা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দিলে এর মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদ (স)'র শরণাপন্ন হতে হবে। আর যে এই চুক্তি সততার সাথে মান্য করে চলবে আল্লাহ তার সাথে রয়েছেন।

মদীনার সনদের শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল মুহাম্মদ (স) হিজরতের পর মদীনায় বসবাসকারী আনসার, মুহাজির এবং ইহুদীদের মধ্যকার সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টির জন্য সংবিধি প্রণয়ন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন; যার মাধ্যমে মদীনাবাসীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আগ্রাসন ও আক্রামণ থেকেও মদীনাকে নিরাপদ করেছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উক্ত সংবিধি প্রণয়নে রয়েছে বহুমুখী শিক্ষা ও উপদেশ যা নিম্নরূপঃ
১) মানব ইতিহাসে মদীনার সনদ শিরোনামে খ্যাত ঐতিহাসিক সংবিধি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। আল্লাহ'র রাসুল মুহাম্মদ (স) তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে এই সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে না; বরং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তিতে।
২) সংবিধির বিভিন্ন ধারা-উপধারার বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে; উক্ত সংবিধি সমাজে ইসলামী শরীয়াহ'র বিধি-বিধান বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি যা সমষ্টিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে।
৩) উক্ত সংবিধি'র মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে পরিচালিত অন্যান্য ধর্মসমূহের মতো ইসলাম কোনো নিছক ধর্মের (যার সবকিছু পরকালের সাথে সম্পৃক্ত ইহকালের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই) নাম নয়; যার সবকিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যা মানবজাতি ও তার রবের মধ্যেই সম্পৃক্ত। বরং ইসলাম মানবজাতি ও তার রবের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির পাশাপাশি মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করেছে। অর্থাৎ মানবজাতির জীবন-বিধান,

পৃথিবীতে তার জীবন পরিচালনার পরিপূর্ণ নির্দেশিকা ও বিবরণ শুধুমাত্র ইসলামেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৪) সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের দুই প্রধান চালিকা শক্তি: প্রতিরক্ষানীতি ও অর্থনীতি'র পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান মদীনার সনদে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে; যার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় বসবাসকরী ইহুদীগোত্র বনু কায়নুকাকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। অনুরূপভাবে চতুর্থ হিজরীতে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে ইহুদীগোত্র বনু নাযীরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরিশেষে পঞ্চম হিজরীতে আহযাবযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদীনায় বসবাসকারী সর্বশেষ ইহুদীগোত্র বনু কুরাইযা'হর ৬১৬ বা ৬১৮ পুরুষ যোদ্ধাকে তাদের মনোনীত সালিসকার বিশিষ্ট সাহাবী সাআদ বিন মুআয (র)'র বিচারিক ফায়সালার আওতায় হত্যা করে পবিত্র মদীনা নগরীকে ইহুদীমুক্ত করা হয়।

ইসলামে জিহাদের বিধান

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনায় হিজরতের পর মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশনার আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মক্কাবাসী বিশেষ করে অভিজাত কুরাইশ আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা ও ষড়যন্ত অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে মদীনায় ছোট্ট পরিসরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে তারা কখনো ভালো চোখে দেখছে না। আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে সিরীয়ার বানিজ্যিক সফরও তাদের সেই অপচেষ্টার অংশ। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদেরও যুদ্ধাবস্থা মেনে চলতে হয়েছে এবং সতর্কাবস্থায় থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জিহাদের প্রসঙ্গ কথা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে এক আকৃতি ও অবয়বে সৃষ্টি করলেও সাধারণত চিন্তা-চেতনায় ভিন্নরূপে আর্বিভাব ঘটেছে তাদের; তাই দু'জনের অভিমত ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দুজনের মতের মিল হওয়াটা অনেকটা সৌভাগ্য বলা যায়। মানবজাতির চিন্তা-চেতনায় ভিন্নতার কারণে স্বভাব-চরিত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক মতবিরোধের মূল উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অভিন্ন। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। কারণ সৃষ্টি জগতে দৃশ্যমান সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিই শুধুমাত্র মনের অনুভূতি ও অভিমত প্রকাশে সক্ষম (জ্বিন ও ফেরেস্তা অদৃশ্য) বিধায় প্রত্যেকে বির্তকের ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থের পক্ষে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি খন্ডন করে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে যত্নবান হয়।

যেই স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তা কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কখনো সামাজিক কারণে, আবার কখনো জাতিগতভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে ধর্মীয় মতবাদের কারণে সৃষ্ট মতবিরোধ সবচেয়ে জটিল রূপ ধারণ করে বিধায় তার নিরসন নিজের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক বিরোধ অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। কিন্তু ধর্মীয় মতবাদের কারণে সৃষ্ট মতবিরোধের নিরসন নিজেদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ছাড়া কখনো সম্ভব নয় বিধায় যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় তা বিস্তার লাভ করে থাকে। ইসলামের সাথে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতবিরোধও একই কারণে যা ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে শুরু হয়ে এখনো বিদ্যমান।

সকল আসমানী ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন

সকল আসমানী গ্রন্থের অনুসারীগণ ও ধর্মীয়গোষ্ঠী মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলেও পরবর্তী সময়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কারণে নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই বিরোধীদের সম্পর্কে বলে বেড়ায় যে, তাদের কোনো ভিত্তি নেই অথচ সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের অনুসারী। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, আসমানী ধর্মের

অনুসারীদের অধিকাংশের নেতা ইবরাহীম (আ) বিধায় আল্লাহ প্রদত্ত অধিকাংশ ধর্মীয়গোষ্ঠী তাঁকে নিজেদের ধর্মীয় প্রবক্তা হিসেবে জানে ও বিশ্বাস করে এবং তিনি আবুল আম্বিয়া বা নবীদের পিতা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত সকল ধর্মের মূল ভিত্তি অভিন্ন হওয়ার কারণেই অনেক প্রাচ্যবিদ ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে সত্যের সন্ধান পেয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে সত্যধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মীয় গোষ্ঠী ইহুদীরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)'র অনুসারী হিসেবে পরিচয় প্রদান করে। মুসা (আ) থেকে শুরু করে ঈসা (আ)'র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আহলে কিতাব বলতে যে ইহুদী সম্প্রদায়ই তা অনেকটা অনুমেয়। ঈসা (আ)ও কুরআন করীমের ভাষ্যমতে ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন বিধায় ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্পদায়ই নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থে মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আগমন সম্পর্কে অবগত। তিনি যে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা অঞ্চলের নবী হিসেবে প্রেরিত হবেন না, যেমন তাঁর পূর্বে একই সময়ে একাধিক নবী বা রাসুল অঞ্চল ভিত্তিক বা গোষ্ঠী ভিত্তিক প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির নিকট শেষ রাসুল হিসেবে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর আবির্ভাবের কারণে পূর্ববর্তী সকল দ্বীন বা শরীয়াহ রহিত হয়ে যাবে তা তারা ভালোভাবেই জ্ঞাত। সুতরাং তাওরাতের বর্ণনা মতে আবু তালিবের সাথে মহানবী (স) কে দেখামাত্র সিরিয়ার বুহাইরা রাহিব'র চিনতে কষ্ট হয়নি এবং আবু তালিবকে মহানবী (স) সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন[১]।

পাশাপাশি তারা আরো অবগত ছিল যে, তিনি মক্কাহ অঞ্চলে আবির্ভূত হবেন এবং মক্কাবাসী তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতন করবে এবং সত্য ধর্ম প্রচারে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এমন কি তাঁকে নিজ মাতৃভূমি থেকেও বিতাড়িত করা হবে। অনুরূপ মন্তব্য মহানবী মুহাম্মদ (স) প্রথম অহীপ্রাপ্তির পর অরক্বাহ বিন নাওফলের কাছে শুনে বিস্মিত হয়ে অরক্বাহ বিন নাওফলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তারা কী আমাকে বিতাড়িত করবে? অরক্বাহ বিন নাওফলের উত্তর ছিল অবশ্যই। কারণ আপনি যা নিয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তা নিয়ে যাঁরাই আপনার পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সকলেই নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন[২]।

সুতরাং মহানবী মুহাম্মদ (স) নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির সূচনাতেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনি যা নিয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তাতে বিরোধ অনিবার্য। সেই অনুভূতি সামনে রেখেই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রচারে আবির্ভূত হলেন। কুরআন করীমের নির্দেশ অনুযায়ী

---

[১]) সীরতে ইব্‌ন হিশাম,প্রাগুক্ত:১/১৮০, তারিখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/২৮৬ এবং উক্ত ঘটনাটি ইমাম বায়হাকী তাঁর "সুনান" ও আবু নুআইম "হিলয়াহ" তে বর্ণনা করেছেন। তবে বিশিষ্ট সীরাহ বিশ্লেষক মুহাম্মদ আল-গাযালী বুহাইরা রাহিবের ঘটনাটি সঠিক নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই ঘটনা যদি সত্য হতো তাহলে তাঁর নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির দাবির প্রেক্ষিতে কুরাইশদের মাঝে বিষয়টি স্থান পেত। অথচ ইতিহাসের কোথাও এর উল্লেখ নেই। মুহাম্মদ গাযালীর ফিক্‌হুস সিরাহ, প্রাগুক্ত:৬৫-৬৬।

[২]) বুখারী [৩৩৯২] ও মুসলিম [১৬০]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন হাজর আল-আসকলানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:১/২১।

নিকটাত্মীয়দের{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}[আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন][১] প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন এবং নিজ চাচাদের কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেননি বরং তিনি তিরস্কারের শিকার হলেন। তা সত্ত্বেও নিজের স্বচ্ছ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

আদর্শের যুদ্ধে পরাজয়ে মারণাস্ত্ররের আশ্রয়

আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাধারণত আদর্শকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিধায় মহানবী মুহাম্মদ (স) আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রচারে আবির্ভূত হওয়ার পর মক্কাবাসী মহানবী (স) কে কখনো কবি, কখনো যাদুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে তাঁর সাহাবীদের লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁকে স্বীয় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে তাঁকে অনুসারীগণসহ আবু তালিবের উপত্যকায় অবরূদ্ধ করে রাখা হয়। পরে তারা যুক্তি-বুদ্ধি ও আদর্শের যুদ্ধে হেরে গেলে সর্বশেষে অস্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং মহানবী (স) কে হত্যার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে সত্যের কণ্ঠস্বর চিরতরে নিঃস্তব্ধ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহ'র নির্দেশে রাতের অন্ধকারে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হন। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের নিরলস প্রচেষ্টায় ছোট্ট পরিসরে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কাবাসী তাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমোদন আসে।

আসমানী ধর্মসমূহে জিহাদের বিধান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মহাবিশ্বসহ সৃষ্টিকূলকে একমাত্র মানবজাতির সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন][২]। অতঃপর একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার লক্ষ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানবজাতি ও জ্বিনজাতি সৃষ্টি করেছি][৩]। এই মহৎ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পথে নিজ বান্দাদের পরিচালিত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে নবী বা রাসুল প্রেরণ করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত নবী-রাসুলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে যেই জাতি বিদ্রোহ করেছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন এবং বেশ কিছু ধ্বংস জনপদের বিবরণ কুরআন করীমে আলোচিত হয়েছে, যেমন এরশাদ হচ্ছে:{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ}[তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহ (আ)'র সম্প্রদায়, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, সামুদ, লুত (আ)'র সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। এদের প্রত্যেকেই রসুলগণের

---

[১]) সূরাহ আশ-শু'রা:২১৪।

[২]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২৯।

[৩]) সূরাহ আয-যারিয়াত:৫৬।

প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে][১]। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নূহ (আ)'র জাতির মধ্যে যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল তাদের ধ্বংস করেছেন, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ}[অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকাবস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করতো, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিলো অন্ধ সম্প্রদায়][২]।

অনুরূপভাবে আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ'র নবী হুদ (আ) কে অস্বীকার করেছিল তাদেরকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ}[অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমুহে মিথ্যারোপ করতো তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মুমিন ছিল না][৩] অনুরূপভাবে সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ'র নবী সালিহ (আ) কে অস্বীকার করেছিল তাদেরকেও ধ্বংস করেছেন, যেমন কুরআন করীমে বিবরণ এসেছে:{فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ}[অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলো এবং তাদের রব এর আদেশ অমান্য করলো এবং তারা বললো: হে সালিহ, নিয়ে এসো যা দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকো। অতঃপর পাকড়াও করলো তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে মৃতাবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে রইলো][৪]।

অনুরূপভাবে লূত (আ)'র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ'র নবী লূত (আ) কে অস্বীকার করে অশ্লীলতাকে বৈধ করলো এবং তাদের পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করলো তাদেরকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}[এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো:তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ করো নারীদেরকে ছেড়ে; বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোনো উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে তোমাদের শহর (অঞ্চল) থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। তারপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম কিন্তু তার স্ত্রী ব্যতীত। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল।

---

[১]) সূরাহ সোয়াদ: ১২-১৪।

[২]) সূরাহ আল-আ'রাফ:৬৪।

[৩]) সূরাহ আল-আ'রাফ:৭২।

[৪]) সূরাহ আল-আ'রাফ:৭৭-৭৮।

আমি তাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতঃপর তুমি দেখ পাপাচারীদের কী পরিণতি হয়েছিল][১]।

অনুরূপভাবে শুয়াইব (আ)'র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ'র নবী শুয়াইব (আ) কে অস্বীকার করেছিল তাদেরকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ }[আমি মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইব (আ) কে প্রেরণ করেছি। সে বললো: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ'র ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিবে না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। এটাই হলো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো। অতঃপর পাকড়াও করলো তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় তাদের গৃহের মধ্যে মৃতাবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে রইলো][২]।

উপরিউক্ত সম্প্রদায়সমূহ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নবী-রাসুলদেরকে চ্যালেঞ্জ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল এবং তারা সকলেই যার উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বিরোধিতার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ'র আযাব অবতীর্ণ হয়। আযাবের ধরন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবশ্যই অভিন্ন এবং আল্লাহ'র একত্ববাদে বিশ্বাসী ও নবী-রাসুলগণের আবেদনের কারণে তাঁদের এবং অন্যান্য মুমিনদের মানসিক ও আন্তরিক প্রশান্তির লক্ষ্যে আযাব অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধের নির্দেশ আসে। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ }[যুদ্ধ করো ওদের সাথে। আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন][৩]।

পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের জিহাদে অংশগ্রহণ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদ মহানবী (স)'র সৃষ্ট নতুন কোনো বিধান নয়। আল্লাহ প্রদত্ত সকল ধর্মের শিরোনাম ভিন্ন হলেও আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার কারণে মহানবী (স)'র পূর্বে প্রেরিত নবী-রাসুলগণও স্ব স্ব জাতির প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আল্লাহ'র নির্দেশে বিরোধী শক্তির সঙ্গে বাধ্য হয়েই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বিধায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসুলগণকে কিতাব ও যুদ্ধের সরঞ্জামসহ প্রেরণ করেছেনে। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

---

১) সূরাহ আল-আ'রাফ:৮০-৮৪।

২) সূরাহ আল-আ'রাফ:৮৫ এবং ৯১।

৩) সূরাহ আত-তাওবাহ: ১৪।

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}[নিশ্চয় আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি; যাতে মানুষেরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসুলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী][১]।

শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ বলেন:{فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد}[যে আল্লাহ'র কিতাব থেকে মূখ ফিরিয়ে নিবে তাকে লৌহদ্বারা (অস্ত্র) সোজা করা হবে][২]। অপর দিকে আল্লামা ইব্‌ন কাইউম বলেন:{ بعثه الله بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه... فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان كلاهما في نصرته أخوان شقيقان}[মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী (স) কে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সাহায্যকারী তরবারীসহ প্রেরণ করেছেন; যাতে করে পৃথিবীতে কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এক আল্লাহ'রই ইবাদত অব্যাহত থাকে এবং তরবারী ও বর্শার ছায়াতলে মানবজাতির জীবিকা নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মকে অকাট্য প্রমাণাদী এবং অজেয় তরবারী ও অন্যান্য অস্ত্রাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত উভয়ই -প্রমাণ ও তরবারী- অর্থাৎ কুরআন ও অস্ত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসেবে পরস্পর সহোদর ভাই][৩]।

অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের পার্থিব জীবন সংশোধন ও পরকালীন জীবন সুন্দর করার উদ্দেশ্যে শরীয়াহ বা বিধান প্রদান করেছেন। এই শরীয়াহ বা বিধান প্রতিষ্ঠায় যখনই প্রতিবন্ধকতা সামনে এসেছে তখনই তা সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ এসেছে। একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলেই প্রতীয়মান হয় যে, সকল নবী-রাসুল যতক্ষণ না তাঁদের দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধতকা সৃষ্টি করা হয়নি ততক্ষণ তাঁদের কেউ যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}[আর কতো না নবী ছিল; যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহ'র পথে তাদের যা কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ'র পথে তারা হেরেও যায়নি, দুর্বলও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন][৪]।

মুসা (আ)'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অনেক নবী-রাসুল স্ব স্ব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন যার কিছু কিছু বর্ণনা কুরআন করীমে আলোচিত হয়েছে, যেমন মুসা (আ)'র যুদ্ধের বর্ণনা যেভাবে কুরআন করীমে চিত্রিত হয়েছে:{ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

---

১) সূরাহ আল-হাদীদ:২৫।

২) ইব্‌ন তাইমিয়্যার ফাতাওয়া সংকলন, প্রাগুক্ত: ২৮/২৬৩।

৩) ইব্‌ন কাইউম, যাদুল মাআদ-কিতাবুল ফুরুসিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:১৮।

৪) সূরাহ আলে ইমরান:১৪৬।

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ}[হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে][১]।

শামভীল (আ)'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

মুসা (আ)'র পরবর্তী সময়ে শামভীল (আ) ইহুদীদের বাদশাহ তালুতকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন তার বর্ণনা যেভাবে কুরআন করীমে চিত্রিত হয়েছে:{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}[মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখোনি, যখন তারা নিজেদের নবীর কাছে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন; যাতে আমরা আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন: তোমাদের প্রতি কী এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বললো: আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ'র পথে লড়াই করবো না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই পেছনে ফিরে গেল। আর আল্লাহ তাআলা জালেমদের ব্যাপারে ভালো করেই জানেন][২]।

দাউদ (আ)'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

ইহুদীদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে দাউদ (আ)'র আগমন ঘটে এবং তিনিও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তার বর্ণনা যেভাবে কুরআন করীমে চিত্রিত হয়েছে: { فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}[তারপর ঈমানদারগণ আল্লাহ'র হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও প্রজ্ঞা। আর তাকে যা চাইলেন তা শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই অনুদানশীল][৩]।

সুলায়মান (আ)'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

পরবর্তী পর্যায়ে দাউদ (আ)'র পুত্র সুলায়মান (আ)'র যুদ্ধের বর্ণনা কুরআন করীমে এভাবে আলোচিত হয়েছে যে, প্রথমে তিনি রানী বিলকিসকে একটি পত্র পাঠালেন। এরশাদ হচ্ছে:{ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ}[সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা হলো: অসীম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ'র নামে

---

[১]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:২১।

[২]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২৪৬।

[৩]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২৫১।

শুরু, আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও][১]। অতঃপর রানী বিলকিস সুলায়মান (আ)'র পত্রপ্রাপ্তির পর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উপঢৌকন প্রেরণ করে জেনে নিলেন যে, পত্রবাহক বাদশাহ না নবী। কেননা নবী-রাসুলগণ পার্থিব লোভে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন না; বরং তাঁরা আল্লাহ'র নির্দেশে তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবে রাজা-বাদশাহগণ উপঢৌকনের কারণে ঘোষিত যুদ্ধ থেকেও বিরত থাকেন। অতঃপর সুলায়মান (আ) উপঢৌকন গ্রহণ না করায় প্রতীয়মান হলো যে, তিনি পার্থিব লোভে যুদ্ধে জড়াবেন না এবং সুলায়মান (আ)'র সামনে তাঁর সৈন্য সমবেত করা হলো, এরশাদ হচ্ছে:{وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}[এবং সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো। জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুল হতে। অতঃপর তাদের বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হলো][২]। অতঃপর সুলায়মান (আ)'র প্রতিক্রিয়া ছিল এই রকম যা রানী বিলকিস উপঢৌকন পাঠিয়ে জানতে চেষ্টা করেছিলেন:{فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ}[অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করলো, তখন সুলায়মান বললো: তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ লাঞ্ছিত অবস্থায় সেখান থেকে বহিস্কৃত করবো][৩]।

ঈসা (আ)'র যুদ্ধভাবনা

অতঃপর ঈসা (আ) তাওরাতের সত্যায়নকারী ও মহানবী (স)'র আগমনের সুসংবাদ নিয়ে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, যেমন কুরআন করীমে আলোচিত হয়েছে:{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ}[স্মরণ করো, যখন মরয়ম-তনয় ঈসা (আ) বললো: হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ'র প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন,তাঁর নাম আহমদ][৪]। তিনি আল্লাহ'র একত্ববাদের প্রতি তার সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে আল্লাহ'র সাথে অংশদারীত্বকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শুধু তাই নয় যারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে তাঁর শিষ্যদের সহায়তা কামনা করেছেন, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى

---

১) সূরাহ আন-নামল:৩০-৩১।

২) সূরাহ আন-নামাল:১৭।

৩) সূরাহ আন-নামল:৩৬-৩৭।

৪) সূরাহ আস-সাফফ:৬।

اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} [ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ'র সাহায্যকারী হয়ে যাও যেমন ঈসা ইব্‌ন-মরয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল: আল্লাহ'র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল: আমরা আল্লাহ'র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং একদল কাফের হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল,আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো][১]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ ইসলামে আবির্ভূত নতুন কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ বা বিধান বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার পর আল্লাহ'র নির্দেশে পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং মহানবী (স)ও এর ব্যতিক্রম নন।

---

[১]) সূরাহ আস- সাফ্ফ:১৪।

ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের মূল আবেদন বিধায় সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মহানবী (স)ও বেশ কিছু যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তা কখনো নিজের প্রাধান্য বিস্তার বা গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে নয়, যেমন প্রাচ্যবিদরা মহানবী (স)'র বিরুদ্ধে অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার বা গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন বলে অপপ্রচার অব্যাহত রাখে। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে জিহাদের কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচিত হলো:

ক) আল্লাহ'র একত্ব প্রতিষ্ঠা

কখনো আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশনা এসেছে পৃথিবীতে আল্লাহ'র একত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; যেমন হাদীসে এরশাদ হচ্ছে: { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله }[আমি লোকদের (অবিশ্বাসীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা আল্লাহ'র একত্বে বিশ্বাসী হয়। অতঃপর বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার উপাস্য নেই। তার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাঁর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ঘোষিত হলো এবং একমাত্র তার বিচারিক পাওনা ছাড়া আল্লাহ'র নিকট তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জবাবদিহি করবে][1]।

খ) বিশৃঙ্খলা নিরসন

আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কখনো যুদ্ধের নির্দেশনা এসেছে বিশৃঙ্খলা নিরসনের লক্ষ্যে; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }[আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহ'র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম তাদের বিষয় ভিন্ন][2]।

গ) নির্যাতনের প্রতিরোধ

আবার কখনো আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশনা এসেছে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে: { وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا }[আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ'র পথে লড়াই করবো না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে][3]।

ঘ) নির্যাতিত জনপদকে মুক্ত করা

আবার কখনো আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশনা এসেছে নির্যাতিত জনপদকে মুক্ত করার লক্ষ্যে; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে: { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا }[আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ'র পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে: হে আমাদের

[1]) সহীহ বুখারী [২৫] ও সহীহ মুসলিম [২২]।

[2]) সূরাহ আল-বাকারাহ:১৯৩।

[3]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২৪৬।

পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বন্ধু বা অভিভবিক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও][১]।

ঙ) বিদ্রোহ দমন

আবার কখনো আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশনা এসেছে বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়; তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ'র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে; তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইন্‌সাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইন্‌সাফকারীদেরকে পছন্দ করেন][২]।

উপরিউল্লিখিত জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র একত্ব প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ বা বিধান প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নতারোধ, আল্লাহ'র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন দমন, পৃথিবীতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিরসন, নির্যাতিত জনপদ ও অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের মুক্তকরণ ও বিদ্রোহ দমনসহ ন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামে জিহাদের অনুমোদন এসেছে। অযথা রক্তপাত ঘটানো, ব্যক্তি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার, গনীমতের সম্পদ লাভ অথবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ রক্ষার্থে জিহাদের বিধান অনুমোদন হয়নি।

ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (স) ও আরবদের সম্পর্কে অপপ্রচার করে বলে থাকে যে; ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স) অশিক্ষিত ও বর্বর আরবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন। যেই জাতির কোনো সভ্যতা ও আভিজাত্য নেই, নেই কোনো শিক্ষা ও সংস্কৃতি। তারা প্রাধান্য বিস্তার কিংবা বংশীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বদা যুদ্ধে মেতে থাকতো। শত্রু কিংবা বন্ধুর সাথে সামান্য বিষয়েও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেত। শত্রুর অবর্তমানে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও যুদ্ধবাজ ছিলেন।

রণাঙ্গনের আদর্শ

সাধারণত যুদ্ধে বিজয় অর্জনই প্রধান ও মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এটিই যুদ্ধের অঘোষিত নিয়ম-নীতি। তা সত্ত্বেও মহানবী (স) যেহেতু মানবতার দূত ও সমগ্র বিশ্বের জন্য রাহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন; সুতরাং তিনি কখনো যুদ্ধের তথাকথিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেননি। সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে অপদস্ত বা অনুগত করতে অথবা কোনো দেশ বা অঞ্চল দখল করতে যুদ্ধে লিপ্ত হননি; বরং তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত সকল যুদ্ধ আল্লাহ'র

---

১) সূরাহ আন-নিসা:৭৫।

২) সূরাহ আল-হুজুরাত:৯।

নির্দেশে তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পরিচালিত হয়েছিল। কখনো মানবতা বিরোধী কোনো অপরাধ ও আচরণ মহানবী (স) নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো যুদ্ধে সংঘটিত হয়নি।

রণাঙ্গনে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধের সেনা বাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে,{وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً }[তোমরা অসহায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না][১]। অন্য এক হাদীসে আরো বর্ণনা এসেছে যে, কোনো ফলজ বৃক্ষ কাটা যাবে না, ফসল বিনষ্ট করা যাবে না এবং চলন্ত পানি বন্ধ করা যাবে না, যা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ঘোষিত যুদ্ধবিষয়ক মানবাধিকার সনদরূপে পরিচিতি লাভ করেছে; অথচ এই সকল নিয়ম-নীতি মহানবী (স)'র যুদ্ধনীতির আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে যা মহানবী (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় বিধায় ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের ঘৃণ্য অপপ্রচার রোধে মহানবী (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হলো।

[১]) সুনান আবী দাউদ [২৬১৪]।

বদর অভিমূখে অভিযান

বদর অভিযানের প্রেক্ষাপট

মহানবী (স) অবগত হয়েছিলেন যে, সিরিয়া থেকে কুরাইশদের একটি বণিক দল মদীনার পার্শ্ববর্তী পথ অতিক্রম করে স্বদেশে ফিরবে। যারা মক্কায় অসহায় মুসলিমদের নির্যাতন করেছে এবং তাঁদের ঘর-বাড়ী ও ধন সম্পদ অবৈধভাবে দখলে নিয়েছে, যেখানে এবং যেভাবেই পাওয়া যায় অবৈধ দখলদরাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার তাঁদের থাকে এবং এটি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; বরং তা প্রাচীন ও আধুনিক যুদ্ধনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মক্কায় যখন আসহাবে রাসুল (স) কুরাইশদের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্যাতনের শিকার হতে লাগলেন; মূলত তখন থেকেই দু'দলের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং মহানবী (স)'র মদীনায় হিজরতের পর যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান ছিল বিধায় যুদ্ধাবস্থায় শত্রুদের সম্পদের উৎস দখলে নেয়া অথবা ধ্বংস করে দেয়া যুদ্ধনীতির আওতায় পড়ে। তাছাড়া শত্রুপক্ষ যদি পূর্বেই ঘর-বাড়ী ও ধন সম্পদ অবৈধভাবে দখলে নেয় এবং নিজেদের ভূমি ত্যাগে বাধ্য করে তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

পবিত্র কুরআন করীম যেমন চিত্রায়ন করেছে:{ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}[এই (পরিত্যক্ত) ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহ'র কাছে অনুদান ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করে, তারাই সত্যবাদী][১]। সুতরাং যারা সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে যুদ্ধাবস্থায় তাদের সম্পদের ওপর আক্রমণ প্রাচীন ও আধুনিক যুদ্ধনীতি শুধু অনুমোদনই করে না; বরং আন্তর্জাতিক আইনে তাকে সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বলে গণ্য করা হয়। অতঃপর মহানবী (স) ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে ৩১৩ জন সাহাবী (৮২ জন মুহাজির, ৬১ জন আওসী আনসার ও ১৭০ জন খাযরাজী আনসার) নিয়ে অভিযানে বের হন।

ইতিমধ্যে আবু সুফয়ান মুসলিমদের অভিযান সম্পর্কে অবগত হয়ে দামদাম বিন আমর গিফারীকে কুরাইশদের উক্ত বিষয়ে অবগত করার লক্ষ্যে মক্কায় প্রেরণ করে দেয়; তারা যেন তাদের সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসে। মক্কায় কুরাইশরা অবগত হওয়ার পর খুব দ্রুত তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং মক্কার অভিজাত লোকজনের কেউ এই অভিযানে পিছিয়ে ছিল না[২]। সকলেই অংশ নিল এমন কি যারা যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি তাদেরকেও তারা যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করলো। তারা এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়[৩]। তবে আবু সুফয়ান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তার

---

[১]) সূরাহ আল-হাশর:৮।

[২]) আবু লাহাব ব্যতীত কেউ পিছিয়ে ছিল না। আবু লাহাব তার পরিবর্তে আস বিন হিশামকে পাঠিয়ে ছিল। বিনিময়ে আবু লাহাব আসের কাছে পাওনা চার হাজার দেরহামের দাবি ছেড়ে দেয়। সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত,পৃ:১/১৬৮।

[৩]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহু আস-সীরাহ, প্রাগুক্ত,পৃ:১৫৬।

বণিকদল নিয়ে সমুদ্র পথে মক্কায় পৌঁছার পথ অবলম্বন করায় মুসলিমদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সন্ধ্যায় আল্লাহ'র রাসুল (স) আলী (র), যুবাইর (র) ও সাআদ বিন আবী অক্কাস (র) কে একদল সাহাবী নিয়ে কুরাইশের সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রেরণ করলেন। তাঁরা এসে বদরের কূপের নিকটবর্তী দুজন যুবককে পেলেন যারা; কুরাইশদলের জন্য পানি সংগ্রহ করছিল। যুবকদ্বয়কে নিয়ে তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট ফিরে এলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) তখন নামাযে ছিলেন। তাঁরা যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে নিজেদের কুরাইশদলের পানি সংগ্রহকারী বলে জানায়। তবে আলী (র)'র দল মনে করেছিলেন যুবকদ্বয় আবু সুফয়ানের লোক, তাঁরা এখনো আবু সুফয়ানের বণিকদলের আশায় আছে এবং তাঁরা জানেন না যে, আবু সুফয়ানের বণিক দল নিরাপদে মক্কায় ফিরে গেছে। অতঃপর তাঁরা যুবকদ্বয়কে পিঠিয়ে স্বীকারোক্তি নিলেন যে, তারা আবু সুফয়ানের লোক[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) নামায শেষ করে আলী (র)'র দলকে তিরষ্কার করে বললেন: তারা যখন সত্য বলেছে তখন তাদের পিঠানো হয়েছিল আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন তাদের ছেড়ে দিয়েছ। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) যুবকদ্বয়কে কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় যে, ঐ পাহাড়ের পিছনে অবস্থান করছে। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) যুবকদ্বয়কে কুরাইশদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তবে বলেছে প্রতিদিন ৯ থেকে ১০টি উট জবেহ করা হয়। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) ধারণা করে নিলেন যে, কুরাইশ সংখ্যায় নয়শ থেকে এক হাজারের কাছাকাছি হবে। যুবকদ্বয় আরো বললো যে, তাদের মধ্যে মক্কার অভিজাত শ্রেণীর সকলেই রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের বললেন যে, "মক্কাহ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তোমাদের নিকট নিক্ষেপ করেছে"[২]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপরিউক্ত বাক্যে কুরাইশদের পরাজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

মহানবী (স) যখন কুরাইশদের মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি ও মক্কাহ ত্যাগ সম্পর্কে অবগত হলেন এবং মদীনার নিকটবর্তী স্থানে কুরাইশদের আগমন সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। সাহাবীদের একদল বলতে লাগলেন যে, এত সংক্ষিপ্ত সময়ে বড় ধরনের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব নয়। তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বুঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এদের সম্পর্কে কুরআন করীমের উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়: { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ }[যেমন করে তোমাকে তোমার রব ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সত্যের সাথে, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত

---

[১]) মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিক্হ আস-সীরাহ, দারুল কলম, বৈরুত, ৫ম সংস্করণ-১৯৮৫,পৃ:২২১।

[২]) মুসনাদ আহমদ [৯৪৮]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: মুহাম্মদ আল-গাযালী রচিত ফিক্হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২২১-২২২।

হবার পর; তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হচ্ছে দেখতে দেখতে। আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে নিষ্কন্টক কিছু তোমাদের জন্য হোক; অথচ আল্লাহ চাইলেন সত্যকে স্বীয় কালামসমূহের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে][১]।

তবে মুহাজিরগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সমর্থন করলেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর (র), উমর (র) ও মিকদাদ (র) সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। অতঃপর মিকদাদ বিন আমর বললেন: "হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আল্লাহ'র নির্দেশের প্রতি আপনি অগ্রসর হোন আমরা আপনার সাথে আছি। মুসা (আ)'র সাথে বনী ইসরাঈলের মতো আমরা বলবো না:{فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ}[আপনি এবং আপনার রব গমন করুন এবং আপনারা দুজনে যুদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে থাকি][২]; বরং আমরা আপনার ডানে-বামে, সামনে-পিছনে আপনার সহযোদ্ধা হিসেবে লড়তে থাকবো"[৩]। কিন্তু মহানবী (স) মদীনার বাহিরে শত্রুদের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মদীনাবাসীর পরামর্শ চাইলেন এবং বিশেষ করে আনসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন "হে লোকেরা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও"। অতঃপর সাআদ বিন মুআয (র) বললেন: আপনি নিশ্চয় আমাদের মতামত চাচ্ছেন। মহানবী (স) বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর সাআদ (র) বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমরা আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি সত্য নিয়ে আবিভূর্ত হয়েছেন। এই বিষয়ে আমরা সর্বদা আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং আপনার ইচ্ছেমতো আপনি অগ্রসর হোন আমরা আপনার সাথে আছি। ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন; আপনি যদি আমাদের নিয়ে এই সমুদ্র অতিক্রম করতে চান আমরা আপনার সাথে বিনা প্রশ্নে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়বো[৪]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) সাআদ (র)'র কথায় সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন:{ سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم}[তোমরা চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে দুটো'র মধ্যে একটি দলের ওপর বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ'র শপথ আমি যেন এখন শত্রুদলের ধরাশায়ী ও হত্যার স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি][৫]। মহানবী (স) মুহাজির ও আনসারগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভের পর কুরাইশদের সংবাদ জানার চেষ্টা করে জানতে পারলেন যে, কুরাইশ প্রায় এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং আরো জানতে পারলেন যে, কুরাইশের সকল নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে।

এদিকে আবু সুফয়ান তার বণিকদল নিয়ে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের ফিরে আসার সংবাদ পাঠালে আবু জাহ্ল দাম্ভিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে

---

[১]) সূরাহ আল-আনফাল:৫-৭।

[২]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:২৪।

[৩]) সহীহ বুখারী [৩৯৫২] বিস্তারিত দেখুন: ইব্ন হাজর আসকালানী, আল-ইসাবাহ, প্রাগুক্ত:১/৩০১।

[৪]) সহীহ মুসলিম [১৭৭৯] বদরযুদ্ধ অধ্যায়। বিস্তারিত দেখুন: সীরাত ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬৩-৬৪।

[৫]) মুসনাদ আহমদ [৩৬৯৮]। বিস্তারিত দেখুন: ইবন কাসীর, বিদায়াহ ওয়া নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৩/২৬২।

বললো: আল্লাহ'র শপথ আমরা ফিরে যাবো না; যতক্ষণ না আমরা বদরপ্রান্তে পৌঁছাবো। অতঃপর সেখানে আমরা তিন দিন অবস্থান করবো, পশু জবাই করবো, খাবো, মদ্য পান করবো এবং নর্তকীরা নিত্য পরিবেশন করবে। সমগ্র আরবজাতি আমাদের অভিযান ও ঐক্য সম্পর্কে শুনবে। অতঃপর তারা আমাদের সমীহ করবে[১]।

বদরযুদ্ধের চিত্রায়ন

বিশিষ্ট সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে মহানবী (স) ৩১৩ জন সাহাবী (৮২ জন মুহাজির, ৬১ জন আওসী আনসার ও ১৭০ জন খাযরাজী আনসার) নিয়ে অভিযানে বের হয়ে বদরপ্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তখন প্রসিদ্ধ সাহাবী হাব্বাব বিন মুনযির (র) মহানবী (স) কে বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! এই স্থান যদি আল্লাহ'র নির্দেশের আলোকে পছন্দ করা হয়ে থাকে তাহলে ওখান থেকে আগে-পিছে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি যুক্তি বা রণকৌশলের কারণে পছন্দ করা হয়ে থাকে তাহলে আমার বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) জবাবে বললেন: যুদ্ধে রণকৌশল প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাহলে আপনি সাহবীদের নিয়ে এখান থেকে উঠে পড়ুন এবং আমরা বদরপ্রান্তরের পানির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করবো। অতঃপর আমরা পানির হাউস বানিয়ে পানি জমিয়ে রাখবো এবং এর পিছনের পানির কূপগুলো নষ্ট করে ফেলবো। তারপর আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। অতঃপর তৃষ্ণার্থ হলে পানি পান করবো এবং তারা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি পান করতে পারবে না। আল্লাহ'র রাসুল (স) এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সাহাবীদের নিয়ে হাব্বাব বিন মুনযির'র পরামর্শ মতো বদরপ্রান্তরের পানির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করলেন[২]।

অতঃপর সাআদ বিন মুআয (র) মহানবী (স)'র জন্য একটি নিরাপদ মঞ্চ নির্মাণের প্রস্তাব করেন যেখানে মহানবী (স) নিরাপদে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসতে পারবেন এবং মদীনায় পিছিয়ে পড়া মুসলিমগণ তাঁকে সেখানে পেয়ে যাবেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) সাআদ বিন মুআয (র)'র প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলেন এবং তাঁর সাহাবীদের আল্লাহ'র সাহায্য ও সমর্থনের কথা স্মরণ করিয়ে অভয় দিলেন। অতঃপর নিজের হাত দিয়ে ইশারা করে বলতে লাগলেন এই স্থানে কুরাইশদের অমুক ব্যক্তি ধরাসায়ী হবে, ঐস্থানে অমুক কুরাইশ ব্যক্তি মারা পড়বে। যুদ্ধের পর দেখা গেল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইঙ্গিতকৃত স্থানেই উল্লেখিত কুরাইশ ব্যক্তিরা ধরাসায়ী হলো; একটুও এদিক-সেদিক হয়নি[৩]।

পৃথিবীর ইতিহাসে বদরযুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা; যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে বিশ্ব পরিচালিত হবে, না মানুষের প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটবে। মহানবী (স) আল্লাহ'র দরবারে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের আকুতি নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন এবং বলেন:{ اللّٰهُمَّ هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك...اللّٰهُمَّ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم }[হে আল্লাহ!

---

[১]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিক্‌হুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৭।

[২]) ইব্‌ন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন: ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, আল-ইসাবাহ, প্রাগুক্ত:১/৩০২।

[৩]) সহীহ মুসলিম [১৭৭৯ ও ২৮৭৩]।

কুরাইশ অতি দাম্ভিকতা ও অহংকারের সাথে এগিয়ে এসেছে। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং তোমার রাসুলকে অস্বীকার করছে। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ছোট্টদলকে ধ্বংস করো তাহলে আজকের পর পৃথিবীতে কখনো তোমার ইবাদত করা হবে না][১]। মহানবী (স)'র এই আকুতি শুনার পর আবু বকর (র) আল্লাহ'র আযাবের ভয়ে মহানবী (স) কে পিছনের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বলেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে দেয়া অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করবেন[২]।

মহানবী (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে বদরযুদ্ধই প্রথম যা ১৭ রমাদ্বান ২য় হিজরিতে শুক্রবার সকালে বদরপ্রান্তরে সংঘটিত হয়[৩] এবং দিনটি ছিল খুবই গরম[৪]। প্রথমে দুপক্ষের তিনজন তিনজন মল্লযুদ্ধে উপণীত হয়। মুসলিমদের পক্ষে ওবাইদাহ বিন হারিস (র), হামযাহ্ বিন আবদুল মুত্তালিব (র) ও আলী বিন আবী তালিব (র)'র হাতে কুরাইশদের তিনজন উতবাহ বিন রাবীআহ, শায়বাহ বিন রাবীআহ ও অলীদ ইবন উতবাহ নিহত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বীরগণ প্রত্যেকেই নিজ প্রতিযোগীকে হত্যা করে বড় বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন[৫]। এর পরই সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ'র রাসুল (স) এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে "আভিজাত্য চূর্ণ হয়ে যাক" বলে কুরাইশদের দিকে নিক্ষেপ করলে কুরাইশদের প্রত্যেকের চোখে বালি পড়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাহাবীদের পাশাপাশি ফেরেস্তা দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করলেন[৬]। আল্লাহ'র মেহেরবানিতেই মুসলিম বাহিনীর পক্ষে ভূমিধস বিজয় সাধিত হয়। সত্তর জন কুরাইশ নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়[৭]। অপর দিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চৌদ্দ জন (৬ জন মুহাজির ৮ জন আনসার) শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) শহীদদের গোসল ও জানাযা ছাড়া যে স্থানেই তাঁরা শাহাদত বরণ করেছিলেন সেখানেই সমাধিস্থ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বদরযুদ্ধে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কুরাইশ নেতাদের প্রায় সকলেই ছিল এবং তাদেরকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়[৮]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিক্ষিপ্ত সকলের নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলতে লাগলেন: হে অমুকের পুত্র অমুক! কতই না সহজ ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আনুগত্য করা? আরো বললেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যা ওয়াদা দিয়েছিলেন তা আমরা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি এবং তোমাদের প্রতি যা অঙ্গিকার ছিল তোমরাও তা অবশ্যই পেয়েছ। অতঃপর বিশিষ্ট সাহাবী উমর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললেন: আপনি মৃত লাশের সাথে কথা বললেন যাদের প্রাণ নেই? অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) উত্তরে

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৯৫৪] ও সহীহ মুসলিম [১৭৬৩]।
[২]) সহীহ মুসলিম [১৭৬৩]। সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৫০২,যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/৮৭।
[৩]) মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক [৭৬৯৭]। সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত,পৃ:১৫৬।
[৪]) সহীহ বুখারী [৩৯৬০] ও সহীহ মুসলিম [১৭৯৪]।
[৫]) সহীহ বুখারী [৩৯৬৬] ও সহীহ মুসলিম [৩০৩৩]।
[৬]) সহীহ বুখারী [৩৯৯৫]।
[৭]) সহীহ বুখারী [৩০২৯]।
[৮]) সহীহ বুখারী [৩১৮৫] ও সহীহ মুসলিম [১৭৯৪]।

বললেন: যার হাতে মুহাম্মদ (স)'র প্রাণ তাঁর শপথ! আমি যা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা বেশী শুনতে পাচ্ছ না[১]।

যুদ্ধবন্দীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

যুদ্ধবন্দীর বিষয়টি অনেকটাই নতুন প্রকৃতির। বদরযুদ্ধে বিষয়টি মুসলিমদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে সামনে আসে এবং তখনো যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) এই যুদ্ধে বন্দী হওয়া সত্তর জন কুরাইশদের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তার প্রতি মনোনিবেশ করেন। মূলত যুদ্ধবন্দীর বিষয়টি বদর যুদ্ধেই সর্বপ্রথম মুসলিমদের সামনে আসে বিধায় মহানবী (স) তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। উমর (র)'র পরামর্শ ছিল: এই যুদ্ধবন্দীরা সকলেই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ; সুতরাং তাদের নিকটতম মুসলিম আত্মীয় তাদেরকে হত্যা করবেন। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে আব্বাসও ছিলেন, তাঁকে হত্যা করা মহানবী (স)'র পক্ষে খুবই কঠিন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই মহানবী (স) আব্বাসসহ বেশ ক'জন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীকে হত্যা না করে বন্দি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কারণ তারা কুরাইশদের চাপে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে[২]।

অন্যদিকে আবু বকর (র)'র পরামর্শ ছিলো যে, আমরা ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্বল সব ত্যাগ করে মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করছি। মাত্র এক বছরের মাথায় আমাদের বড় ধরনের একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে এবং আমাদের যৎসামান্য অর্থ যা ছিল তাও এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে তারা সকলেই আমাদের নিকটাত্মীয়। মুক্তিপণের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদান করা হলে আমরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবো পাশাপাশি ইসলামের আদর্শ উপলব্ধি করে যুদ্ধবন্দীরা ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাবে[৩]।

মহানবী (স) আবু বকর (র)'র পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ এই সিদ্ধান্ত পরামর্শভিত্তিক ইজতিহাদের আলোকে গৃহীত হলেও যথার্থ ছিল না; যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মাধ্যমে তাঁর রাসুল (স) কে সংশোধন করে দিলেন। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[কোনো নবীর পক্ষে উচিত নয় যে, তার কাছে দুশমন বন্দীরা থাকবে আর তাদেরকে সে পরিপূর্ণভাবে হত্যা করে পৃথিবীতে ধরাশায়ী করবে না। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো; অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। যদি

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৭৫৭]।

[২]) মহানবী (স) আব্বাস, আবুল আসসহ বনী হাশিম গোত্রের আরো কয়েকজন লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তাঁরা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। হাদীসটি ইব্ন ইসহাক আব্বাস বিন আবদিল্লাহ বিন মাআবদ থেকে তার সীরাহ গন্থে বর্ণনা করেছেন, প্রাগুক্ত,পৃ:৬২৯-৬৩০।

[৩]) ঘটনাটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাহ গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে যেমন: ইব্ন সাআদ তার তাবকাত গন্থে, ইব্ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে, মুহাম্মদ আল-গাযালী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে এবং হুসাইন হায়কাল তার হায়াতে মুহাম্মদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদেরকে বিরাট আযাব পাকড়াও করতো][১]। উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) এবং আবু বকর (র) দুজনেই বসে কান্না করেছিলেন। উমর (র) তাঁদের দুজনকে কান্না করতে দেখে বলেছিলেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমাকে বলুন: কি কারণে আপনি এবং আপনার সাথী কান্না করছেন? তোমার সাথী-বন্ধুরা মুক্তিপণ নিয়ে যা আমার ওপর উপনীত করেছে তার জন্য কান্না করছি। আমার কাছে তাদের আযাব উপস্থাপন করা হয়েছে এই বৃক্ষ অপেক্ষা অতি সন্নিকটে[২]। অপর এক বর্ণনায় এসেছে: আমাদের এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যদি আল্লাহ'র আযাব আসতো তাহলে উমর (র) ছাড়া কেউ বাঁচতো না[৩]।

পাশাপাশি যুদ্ধবন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সুন্দর আচরণসহ সকল মানবিক অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মুসলিমদেরকে নিদের্শ প্রদান করা হয়; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[হে নবী! যারা তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুন বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, অতি করুণাময়। আর হে নবী! যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায় তাহলে বস্তুতঃ তারা আল্লাহ'র সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে। অতঃপর তিনি তাদের ওপর তোমাকে কতৃত্ব ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়][৪]।

বদরযুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, বদরযুদ্ধ মহানবী (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে প্রথমযুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুদ্ধনীতি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন। নিম্নে বদরযুদ্ধে বাস্তবায়িত কতিপয় যুদ্ধনীতি ও মুসলমানদের জন্যে কিছু শিক্ষনীয় বিষয় উল্লেখ করা হলো:

ক) **পরামর্শ গ্রহণ:** সমর নেতা তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য নন এবং এটি আধুনিক যুদ্ধনীতির অন্তর্ভূক্তও নয়। তবে মহানবী (স) যেহেতু সাধারণ নেতাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের মতামত ও যুক্তিকে সর্বদা সম্মান করতেন। অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন; বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ অতি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। পবিত্র কুরআন করীম

---

[১]) সূরাহ আল-আনফাল:৬৭-৬৮।

[২]) সহীহ মুসলিম [১৯৮ ও ১৭৬৩]।

[৩]) ইবন কুতাইবাহ আল-দ্বীনওয়ারী, তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস, দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত, লেবানন, তারিখ ব্যতীত, পৃ:১০৮। তবে হাদীসটি মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল হিসেবে প্রমাণিত।

[৪]) সূরাহ আল-আনফাল:৭০-৭১।

যেমন চিত্রায়ন করেছে:{ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}[... অতঃপর তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলো; তখন আল্লাহ'র তাআলার ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসা স্থাপনকারীদের ভালোবাসেন][১]। তাছাড়া মহানবী (স)'র সাহাবীগণ বিরল বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন; তাঁরা ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন বিধায় মহানবী (স) তাঁদের নিকট পরামর্শ আহ্বান করতেন।

এখানে বিশেষ করে মদীনাবাসীর সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পরামর্শ করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; কারণ এটি তাঁদের মধ্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের জীবন চলার পথে সাহায্য করবে। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের সাথে পরামর্শ নাও করতে পারতেন। তবে তাঁর (স) আদর্শ হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে গুরুত্বের সাথে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা এবং তাঁদের মতামতের মূল্যায়ন করা; যাতে করে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে, তাঁদের মতামত প্রদানের যোগ্যতা আছে। তাছাড়া পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিজেদের সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় যুদ্ধের ফলাফল অনুকূলে থাকলে প্রত্যেকেই নিজের কৃতিত্ব মনে করতে পারে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের ফলাফল বিরুদ্ধে গেলে কেউ যেন অপরের ওপর দোষ চাপাতে না পারে; কেননা সকলের পরমর্শের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

খ) **আল্লাহ'র সাহায্য কামনা:** সকল যুদ্ধেই মহানবী (স) আল্লাহ'র নিকট শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করতেন; বদরযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ তিনি জানতেন শুধুমাত্র সংখ্যার আধিক্যে ও ভালো প্রস্তুতির মাধ্যমেই যুদ্ধজয় সম্ভব নয়; যতক্ষণ না আল্লাহ'র সাহায্য এর সাথে সমন্বয় হয় এবং তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট অত্যন্ত বিনয়ভাবে প্রার্থনা করেছেন।

ইতিহাসে তার প্রমাণ প্রচুর, তাই বদরযুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা শত্রুপক্ষের এক তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ'র অশেষ রাহমতে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়েছে। অপরদিকে হুনাইন যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে অনেকে সংখ্যার আধিক্যে যুদ্ধবিজয় সম্ভব হয় বলে ধারণা করেছিলেন বিধায় যুদ্ধের প্রথমার্ধেই মুসলিমগণ পরাজয়ের মুখোমুখী হয়েছিলেন এবং মহানবী (স) কে ত্যাগ করে অধিকাংশ সহযোদ্ধা পশ্চাৎপদ অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তীতে মহানবী (স)'র দৃঢ়তা ও বিচক্ষণ রণকৌশলের কারণেই মুসলিমদের পক্ষে বিজয় সাধিত হয়েছিল।

এখানেই আধুনিক যুদ্ধনীতির সাথে ইসলামী যুদ্ধনীতির মূল পার্থক্য যে, ঈমানীযুদ্ধ কখনো সংখ্যার আধিক্যে ও উত্তম প্রস্তুতির দ্বারা জয় করা যায় না। আল্লাহ'র অশেষ মেহেরবানী ও দয়ায় মুসলিমদের পক্ষে অধিকাংশ যুদ্ধে বিজয় সাধিত হয়েছিল। যেমন কুরআন করীমে চিত্রিত হয়েছে:{ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[তাদের পশ্চাদ্ধবনে শৈথিল্য করো না। যদি

১) সূরাহ আলে ইমরান:১৫৯।

তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ'র কাছে এমন কিছু আশা করো, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়][১] অনুরূপভাবে কুরআন করীমে আরো এরশাদ হচ্ছে: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ }[তুমি বলো, (হে মুশরিকরা!) তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি (শাহাদত বা বিজয়) প্রত্যাশা করো, আর আমরা প্রত্যশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ][২]।

তাছাড়া মুসলিমগণ সবর্দা নিজেদেরকে আল্লাহ'র নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকেন। আল্লাহ'র ওপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও তাঁর বিধি-নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন বিধায় তাঁর পক্ষ থেকে যাই আসুক তার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ মনে করে থাকেন। শাহাদাত তথা পরকালে জান্নাতের মাধ্যমে তার প্রতিদান অথবা পৃথিবীতে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয় তথা মুসলিমদের হাতে মুশরিকদের শাস্তি প্রদান। এগুলো হলো ইসলামী যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামের যুদ্ধনীতি যা যুদ্ধক্ষেত্রে অনুকূল-প্রতিকূল কোনো অবস্থাতেই এর পরিবর্তন হয় না।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহ'র মেহেরবানিতেই যদি যুদ্ধে বিজয় সাধিত হয় তাহলে এত রণকৌশল ও প্রস্তুতির প্রয়োজন কেন? আল্লাহ তো সবর্দা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথেই আছেন সাহায্য নিয়ে। তাছাড়া উহুদযুদ্ধসহ কোনো কোনো যুদ্ধে মুসলিমগণ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন কেন? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ'র মেহেরবানিতেই যুদ্ধে বিজয় সাধিত হয়; তার অর্থ এই নয় যে, রণকৌশল ও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। অবশ্যই এগুলোরও প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি আল্লাহ'র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখাও অপরিহার্য। বদরযুদ্ধে শত্রুপক্ষের রণকৌশল ও প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি ছিল না; বরং তারা সংখ্যায় মুসলিম বাহিনীর তিনগুণের অধিক ছিল এবং সকলেই অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। অথচ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে অনেকের অস্ত্রও ছিল না; তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র মেহেরবানিতেই মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বিজয় সাধিত হয়েছিল।

গ) বারযখী জীবন: বদরযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের লাশ বদরের কূপে নিক্ষেপ করার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের নাম ধরে কথোপকথনের মতো করে বললেন: হে অমুকের পুত্র অমুক! কতই না সহজ ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আনুগত্য করা? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যা ওয়াদা দিয়েছিলেন তা আমরা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি এবং তোমাদের প্রতি যা অঙ্গীকার ছিল তোমরাও তা অবশ্যই পেয়েছ। উমর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মৃত লাশের সাথে কথোপকথন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) যা বললেন: আমি যা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা বেশী শুনতে পাচ্ছ না[৩]।

---

১) সূরাহ আন-নিসা:১০৪।

২) সূরাহ আত-তাওবাহ:৫২।

৩) সহীহ বুখারী [৩৭৫৭]।

উপরিউক্ত কথোপকথন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্বে কবরের জীবনে (ইসলামী পরিভাষায় বারযখী জীবন) বিশেষ এক প্রকার জীবনের অস্তিত্ব আছে; যার বৈষয়িক বাস্তবতা ও ধারণা আমাদের জ্ঞাত না হলেও তা অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই। বদরযুদ্ধের উপরিউক্ত ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা প্রতি-উত্তরে সক্ষম নয় এবং তা থেকেই বারযখী জীবনের শান্তি উপভোগ ও শাস্তিভোগের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। যা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রীয় শক্তির আওতায় না হলেও ধর্মীয় অনুভূতি দিয়ে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

ঘ) যুদ্ধবন্দির সাথে সদ্ব্যবহার: প্রাচীনকালে যুদ্ধবন্দিদের সাথে কখনো সদাচারণ করা হতো না; বরং তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতো এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের হত্যা করে উল্লাস করা হতো। আধুনিক যুগে যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংরক্ষণে বেশকিছু পদক্ষেপ ও নীতিমালা প্রণিত হলেও তা কখনো সঠিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন হয়নি। এর বড় প্রমাণ আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর আফগানিস্তান এবং ইরাকের যুদ্ধবন্দীদের সাথে মার্কিন সেনাদের যে ব্যবহার ও আচরণ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে তা বর্বতার সকল ইতিহাসকেও হার মানিয়েছে; অথচ তারা সমগ্র বিশ্বে সভ্য ও অভিজাত হিসেবে পরিচিত।

তবে ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নশীল অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু তাই নয় মহানবী (স) বদরযুদ্ধে অংশ নেয়ার পরও প্রতিপক্ষের বেশ ক'জন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল না; বরং তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে বিধায় তাদেরকে হত্যা না করে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা হওয়ার সুবাদে তিনি বাড়তি কোনো সুবিধা পাননি। মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তির বিষয়েও কোনো ছাড় পাননি। অতঃপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বলেছিলেন যে, আমার তো কিছুই নেই আমি কী দিয়ে মুক্তি পাবো? তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আপনি যুদ্ধে আসার সময় রাতের অন্ধকারে চাচির কাছে যে স্বর্ণ রেখে এসে বলেছিলেন যে, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তুমি এই স্বর্ণ দিয়ে চালিয়ে দিও; তা দিয়ে আপনি মুক্ত হবেন। তখন তিনি বললেন: তুমি কীভাবে জানতে পারলে? তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমি যেই সত্তার প্রতিনিধিত্ব করি তিনিই আমাকে জানালেন। এই ঘটনার পর আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করলেন[১]। যদিও তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স) 'র নির্দেশে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখে মক্কায় অবস্থান করে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করেছেন এবং মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন[২]।

ঙ) নবী-রাসুলদের ইজতিহাদ: মহানবী (স) যেহেতু বিশ্বশান্তির আলোকবার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন এবং একজন শান্তিকামী ব্যক্তি হিসেবে আবু বকর (র)'র পরামর্শ গ্রহণ করে

---

১) মুসনাদ আহমদ [৩৩১০]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবাভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৪০৫ এবং সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:১/৩৮৪।

২) ইবন হাজর আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/৩৭৫।

মুক্তিপণের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথচ এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মাধ্যমে তাঁর রাসুলকে সংশোধন করে দিলেন যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[কোনো নবীর পক্ষে উচিত নয় যে, তার কাছে দুশমন বন্দিরা থাকবে আর তাদেরকে সে পরিপূর্ণভাবে হত্যা করে পৃথিবীতে ধরাশায়ী করবে না। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদেরকে বিরাট আযাব পাকড়াও করতো][১]।

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও নবী-রাসুলগণ অহীর আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তবে পার্থিব বিষয়ে নিজেরা ইজতিহাদ করেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের ইজতিহাদে সঠিক ও ভুল দুটিরই অবকাশ থাকে। তবে নবী-রাসুলগণের ইজতিহাদ সঠিক না হলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসুলগণকে সংশোধন করে দেন। বদরযুদ্ধে মুক্তিপণের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথার্থ না হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মাধ্যমে তাঁর রাসুল (স) কে সংশোধন করে দিলেন। তবে বিষয়টি শরয়ী প্রেক্ষাপটে (প্রকাশ্য নির্দেশনানুযায়ী) অশুদ্ধ হলেও আধ্যাত্মিকভাবে (ঊর্ধ্বজগতের নির্ধারণ হিসেবে) অবগত করে দেয়া হয়।

যেমন নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্পর্কে আদম (আ) এর ইজতিহাদ, নিজের অবাধ্য সন্তান সম্পর্কে নূহ (আ) এর ইজতিহাদ এবং অহী আগমনের পূর্বে ইউনুস (আ)'র স্থান ত্যাগ করার ইজতিহাদ সব একই সূতিকায় গ্রথিত। এতে নবী-রাসুলগণের মর্যাদা ক্ষুন্ন কিংবা একে তাঁদের শাস্তি হিসেবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কারণ ইজতিহাদী ভুল কোনো অপরাধ কিংবা পদচ্যুতি নয়; যা নবী-রাসুলগণের নিষ্পাপ চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে গণ্য হতে পারে। বরং ইজতিহাদী ভুলের মধ্যেও সাওয়াব রয়েছে এবং যেখানে সাধারণ ফকীহদের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, ফকীহদের ইজতিহাদ সঠিক হলে দুটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, আর ভুল হলে ইজতিহাদের একটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

চ) গনীমতের সুসম বন্টন: ইসলামের পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত শত্রুসম্পদের ব্যাপারে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না বললেই চলে; বরং একটি হযবরল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া বদরযুদ্ধ দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাস্তায় মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ ও বিসর্জনের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। অনুরূপভাবে যুদ্ধপরবর্তী শত্রুসম্পদের সাক্ষাৎ এই যুদ্ধেই প্রথম হয়েছে যখন তাঁরা ছিলেন দারিদ্রে নিস্পেষিত ও বিধ্বস্ত। তাছাড়া যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুহাজিরদের দারিদ্র ও আর্থিক প্রয়োজন দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই বলে প্রার্থনাও করা:{ اللَّهُمَّ إنهم حفاة فاحملهم، اللَّهُمَّ إنهم عراة

---

[১]) সূরাহ আল-আনফাল:৬৭-৬৮।

فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم}[হে আল্লাহ! এরা নিঃস্ব তাদের বহনের ব্যবস্থা করো, এরা বিবস্ত্র তাদের তুমি পরিধানের ব্যবস্থা করো। হে আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্থ তাদের পরিতৃপ্ত করো][১]। তাঁদেরকে আশান্বিত করেছিলেন বিধায় স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধপরবর্তী সময়ে শত্রুসম্পদের মালিকানা ও বন্টন নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মৃদু মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে সাহাবীগণ আল্লাহ’র রাসুল (স) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে কুরআন করীমের নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম সম্পর্কে। বলে দিন, গনীমতের মাল হলো আল্লাহ’র এবং রাসুলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ’র তাকওয়া অবলম্ভন করো এবং নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ’র এবং তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য করো, যদি ঈমানদার হয়ে থাকো][২]।

তবে সূরাহ আল-আনফালের উপরিউক্ত আয়াতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে মিলেনি। শুধুমাত্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটানোর লক্ষ্যে বর্ণনা এসেছে যে; গনীমতের সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের, তাঁদের আর কারো নয়। সুতরাং এই বিষয়ে তোমাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন করে নাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুসলিম হয়ে থাকো। অতঃপর তাঁরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন করে নিলেন। পরে সূরাহ আল-আনফালের অন্য আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং বলা যেতে পারে ইসলামই সর্বপ্রথম গনীমতের সুসম বন্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। কারণ বিষয়টি খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর বিধায় কুরআন করীমের একাধিক আয়াতে গনীমতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ}[আর এ কথাও জেনে রাখো যে, কোনো বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবেও পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ’র জন্য, রাসুলের জন্য, নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং ইয়াতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমরা পূর্ণাঙ্গ আল্লাহ’র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো][৩]। গনীমতের বন্টন সম্পৃক্ত সূরাহ আনফালের উক্ত আয়াত অবতরণের পর এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত বাকি সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে কুরআনের নির্দেশনা মতে বন্টন করা হয়।

বদরযুদ্ধের কিছু বিরল ঘটনা

১) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবু সুফয়ানের সংবাদ নিয়ে দামদাম বিন আমর গিফারী মক্কায় আগমনের তিন রাত্রি পূর্বে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র ফুফু আতীকাহ বিনতে আবদিল মুত্তালিব স্বপ্ন দেখেন যে, একজন লোক উটে করে মক্কার উপকণ্ঠে আগমন করেন এবং নগরীর দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন: হে বদরবাসী তোমরা তিন দিনের মধ্যে

[১]) সুনান আবী দাউদ, [২৭৪৭]।

[২]) সূরাহ আল-আনফাল:১।

[৩]) সূরাহ আল-আনফাল:৪১।

তোমাদের মৃত্যুর জন্য বদরপ্রান্তরের দিকে চলো। অতঃপর তিনি এক টুকরা পাথর নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিক্ষেপ করলে ঐ পাথরের অংশ এগিয়ে আসতে থাকে এবং এমন কোনো ঘর ছিল না যাতে ঐ পাথরের অংশবিশেষ প্রবেশ করেনি[১]। এই ঘটনা বর্ণনার পর আবু জাহ্ল আব্বাসকে ঠাট্টা করে বললো যে,"তোমাদের মধ্যে এই মহিলা নবীর আবির্ভাব ঘটলো কবে"এবং দামদাম বিন আমরের আগমনের কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সাধারণত বনু হাশিমের লোকজনকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষের লোক হিসেবে সন্দেহ করা হতো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আতীকাহ বিনতে আবদিল মুত্তালিবের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটালেন।

২) বদরযুদ্ধে উমাইয়্যাহ বিন খাল্ফকে আবদুর রহমান বিন আউফ (র) বন্দী করতে সক্ষম হন এবং হিজরাতপূর্ব একটি চুক্তির আলোকে তাকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন; এমতাবস্থায় তাকে দেখে বেলাল (র) চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন: মুশরিকদের নেতা, তুমি বাঁচলে আমি বাঁচবো না। বেলাল (র) তাকে হত্যা করতে চেষ্টা চালালে আবদুর রহমান বিন আউফ (র) বেলাল (র) কে তাঁর ইচ্ছা থেকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন এবং তাতে বেলাল (র) অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর বিরক্ত হয়ে তিনি আনসারদের নিকট চলে যান। পরে আনসারদের সাহায্যে উমাইয়্যাহ বিন খাল্ফকে হত্যা করা হয়[২]। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমর নেতার কাছে পৌঁছার পূর্বে যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা ইসলামে অবৈধ নয়।

৩) আল-আস বিন হিশাম বিন মুগীরাহ উমর (র)'র আপন মামা বিধায় উমর তাকে হত্যা করতে চেষ্টা চালান এবং তাতে তিনি সফল হন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, উমর (র)'র অন্তরে একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুলের ভালোবাসাই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

৪) যুদ্ধ সমাপ্তির পর আল্লাহ'র রাসুল (স) বদরপ্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করেন যেন সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে নিজের সৈন্যদের নিয়ে নিরাপদে পৌঁছানো যায়। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া মাত্র সমরনেতার রণাঙ্গন ত্যাগ করা উচিত নয়। বরং কিছু সময় রণাঙ্গনে অতিবাহিত করে ধীরে-সুস্থে রণাঙ্গন ত্যাগ করা অতীব জরুরী। তবে রণাঙ্গনে সমরনেতার তিন দিন অবস্থান করা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুন্নাত বা আদর্শ।

৫) বদরপ্রান্তরের কূপে নিক্ষিপ্ত কুরাইশদের লাশের মধ্যে উতবাহ বিন রাবীআহ'ও ছিল সেখানে উতবাহ'র ছেলে আবু হুযাইফা (র) উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে খুবই বিমূর্ষ দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তোমার পিতার পরিণতি দেখে সম্ভবত তোমার খারাপ লাগছে। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ'র শপথ হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমার পিতার পরিণতির ব্যাপারে আমার কোনো অনুতাপ নেই। তবে আমি তার প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও

---

[১]) আলী মুহাম্মদ আস-সাবুনী,আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০৯, রিয়াদ, পৃ:৪১৬।

[২]) সহীহ বুখারী [২৩০১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৩৯২-৩৯৩।

আভিজাত্য সম্পর্কে জানতাম এবং আমি আশান্বিত ছিলাম যে, তা তিনি ইসলামকে উপহার দিবেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমি আশাহত হয়েছি বিধায় দুঃখিত হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আবু হুযাইফা (র)'র কল্যাণ কামনা করেন।

৬) বদরযুদ্ধে আবু উবাইদাহ (র) বিন আল-জার্‌রাহ তাঁর পিতা জার্‌রাহকে হত্যা করেন। কারণ তাঁর পিতা আল-জার্‌রাহ আবু উবাইদাহ (র) কে বারবার প্রতিহত করতে চেষ্টা চালান এবং যখন তার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় তখন বাধ্য হয়ে তিনি পিতাকে হত্যা করেন। উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)'র বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না; যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন; যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ'র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ'র দল। জেনে রাখো! আল্লাহ'র দলই সফলকাম হবে][১]।

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে যতই নিকটতম আত্মীয় হোক না কেন তাকে সমর্থন বা সহযোগিতা করা বা তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ইসলাম অনুমোদিত নয়।

৭) মুক্তিপণের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সম্পদশালী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ চার হাজার দিরহাম এবং অন্যান্যদের তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়। তবে যারা মুক্তিপণ আদায়ে অসামর্থ্য এবং শিক্ষিত তারা আনসারদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করবে; তাদের শিক্ষা প্রদানকে মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যাদের কিছুই নেই এবং যারা একেবারেই নিঃস্ব ও অপারগ তাদেরকে আল্লাহ'র রাসুল (স) মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন যেমন: মুত্তালিব বিন হান্তব মাখযুমী, সাইফ বিন আবী রিফাআহ ও কবি আবু ইয্যাহ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য[২]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন যে, যদি মুতঈম বিন আদী জীবিত থাকতেন এবং আমার কাছে এইসব আবর্জনা সম্পর্কে কথা বলতেন আমি তার সৌজন্যে সবাইকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিতাম। কারণ তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তায়েফ থেকে ফেরার পর মক্কাহ নগরীতে প্রবেশের আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধাবস্থায় কাউকে বন্দী করার উদ্দেশ্য মূলত মুক্তিপণ আদায় নয়, যেমন ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা বলে থাকে; বরং রক্তপাত এড়ানোই যুদ্ধে বন্দী করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

---

১) সূরাহ আল-মুজাদালাহ:২২।

২) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ:৩১৮।

৮) যেখানে আল্লাহ'র রাসুল (স) মুতঈম বিন আদী'র প্রতি তাঁর আচরণের কারণে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, অনুরূপভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিভিন্ন অপরাধের কারণে কঠোরও হয়েছিলেন, যেমন উকবাহ বিন আবী মুয়ীত ও আন-নাযর বিন আল-হারিস; তারা দুজনেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের অন্যতম প্রবক্তা। তাদের মতো অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা বড় বিপদজনক; বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াতের অতিসংকটময় মুহূর্তে তাদের মতো অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা হলে পরবর্তীতে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরো হিংস্র হয়ে উঠবে; সুতরাং এই দুজনকে বদর অঞ্চল থেকে মদীনা ফেরার পথে সাফরা নামক স্থানে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে উকবাহ বিন আবী মুয়ীত আল্লাহ'র রাসুল (স) কে একাধিকবার শারীরিকভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করেছিল। আর আন-নাযর বিন আল-হারিস আল্লাহ'র রাসুল (স) যেখানেই দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করতেন সেখানে সে সমবেত লোকজনকে কায়সার-কিসরা'র গল্প শুনিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো[১]।

৯) মুক্তিপণ আদায়ে অক্ষম যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি প্রদানের জন্য আনসারদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদানকে মুক্তিপণ হিসেবে ঘোষণা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা ইসলামী বিধান মতে অবৈধ নয় এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পণ্য নয়[২]।

১০) কুরাইশ যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য যখন মুক্তিপণ পাঠাচ্ছিল তখন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কন্যা যায়নাব (র) তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে সম্পদ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হার ছিল যেটি মূলত মা খদীজাহ (র)'র। বিয়ের সময় মা খদীজাহ (র) তাঁর মেয়েকে উপহার দিয়েছিলেন। উপরিউক্ত হারটি দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স) আবেগ আপ্লুত হলে সাহাবীগণ হারটি ফেরত দিতে বললে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর কন্যা যায়নাব (র) কে সম্মানের সাথে ফেরত পাঠানোর শর্তে তাকে মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি প্রদান করেন[৩]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আবুল আস কখনো ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি, না কখনো তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করেছেন। ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাঁর সম্পদ, ব্যবসা ও সম্ভ্রম সর্বদা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষে ব্যয় করেছেন। বদরযুদ্ধে তিনি কুরাইশদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন; যার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) যাদেরকে যুদ্ধমাঠে হত্যা না করে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

---

[১]) আলী আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৪০৩। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:১/৪৩৯-৪০০।

[২]) সহীহ বুখারী [৪০২৪]।

[৩]) মুসনাদ আহমদ [২৬৪৭২]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবরাহীম আল-আলী, সহীহুস সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারু আন-নাফায়েস, ১৪০৮ হি:/১৯৯৮ ইং, পৃ:২৬১।

বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান

ইহুদীদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা

বিশিষ্ট সীরাতবিদ ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে বনু কায়নুকার ইহুদীরা বদরযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অবিস্মরণীয় বিজয়ের পর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চুক্তির বিষয়ে বেপরওয়াভাব প্রদর্শন শুরু করে। বিশেষ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনাস্থ বনী কায়নুকার বাজারে তাদের সমবেত করে তাদেরকে বুঝালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়ে বললেন: তোমরা অবশ্যই অবগত যে, আমি আল্লাহ'র প্রেরিত রাসুল; যা তোমাদের গ্রন্থে (তাওরাত) উল্লেখ রয়েছে এবং মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদের কাছ থেকে উক্ত বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছেন। অতঃপর কুরাইশদের মতো বিপর্যয় এড়াতে সতর্ক করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চুক্তি মেনে চলার উপদেশ প্রদান করলে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ধমকি দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলে: হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদেরকে তোমার স্বজাতির মতো মনে করেছ? যুদ্ধের কোনো ধারণা নেই সেই রকম আনাড়ি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তোমার প্ররোচিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ'র শপথ! আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, আমরা যুদ্ধবাজ বীর জাতি[1]।

এভাবেই মুসলিমদের সাথে বনু কায়নুকার ইহুদীদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ}[তুমি কাফেরদিগকে বলে দাও, খুব শীঘ্রই তোমরা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে, সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। নিশ্চয় দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করে আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা সচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য][2]।

পরবর্তীতে এক আরব মুসলিম নারীর জোরপূর্বক পর্দা খোলা নিয়ে মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে ঘটনার সূত্রপাত হয়। বিশিষ্ট সীরাতবিদ ইবন হিশাম আবু আওয়ানার বরাতে বর্ণনা করেন যে, এক আরব মহিলা বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে বনু কায়নুকার বাজারে এক ইহুদী কামারের পাশে বিক্রি করতে বসেছিলেন। ইহুদীরা তার চেহেরার পর্দা সরাতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর ইহুদী কামার মহিলার কাপড়ের এক প্রান্ত তার পিঠের দিকে তার অন্য প্রান্তে গিট্টা দিয়ে রাখলে মহিলা দাড়াতে গেলে কাপড়ে টান পড়ে চেহেরার পর্দা খুলে যায় এবং ইহুদীরা হেসে উঠে। অতঃপর মুসলিম মহিলা চিৎকার করলে এক মুসলিম ইহুদী কামারের ওপর হামলে পড়ে এবং তাকে হত্যা করলে উপস্থিত ইহুদীরা হামলাকারী মুসলিমকে হত্যা করে। অতঃপর মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে দাঙ্গা

---

[1]) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত,পৃ:২/১২৫ ও তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৬৭। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৩৭৬-৩৭৭।

[2]) সূরাহ আলে ইমরান: ১২-১৩।

বেধেঁ যায় এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাবারী ও ওয়াকিদীর বর্ণনামতে দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে কোনো এক শনিবারে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়[১]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার কারণে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশনার আলোকে মুহাজির ও আনসারদের একটি দল নিয়ে বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। কুরআন করীমে এরশাদ হয়েছে:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}[তবে কোনো সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও সমভাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না][২]।

বনু কায়নুকার ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অভিযানের সংবাদ পেয়ে তাদের দূর্গের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আল্লাহ'র রাসুল (স) পনের দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর তারা যখন বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) অভিযান সমাপ্ত না করে অবরোধ প্রত্যহার করবেন না তারা প্রতিরোধ ও ধৈর্যের শক্তি হারিয়ে ফেলে। অথচ তারা ইতিপূর্বে কুরাইশদের চেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা দাবী করে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ধমকি দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেন। অতঃপর ইহুদীরা বাধ্য হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সিদ্ধান্ত মেনে দূর্গ থেকে বের হয়ে আসতে সম্মত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের বেঁধে নিয়ে আসার জন্য বিশিষ্ট সাহাবী আল-মুনযির বিন কুদামাহ আস-সিলমী আল-আওসীকে দায়িত্ব প্রদান করেন[৩]।

বনু কায়নুকার ইহুদীদের শেষ পরিণতি

বনু কায়নুকার ইহুদীদের বন্দী করে খাযরাজ গোত্রের অঞ্চল দিয়ে নিয়ে আসার সময় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই মিত্রতার অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী আল-মুনযির বলেন: যাদেরকে আল্লাহ'র রাসুল (স) বন্দী করেছেন তাদেরকে তোমরা ছেড়ে দিবে? আল্লাহ'র শপথ! তাদেরকে যে ছেড়ে দিবে তার ঘাড় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের মুক্ত করার জন্য বাধ্য হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর জামার পকেটে হাত ডুকিয়ে জামা ধরে টানাটানি শুরু করে। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে জামা ছাড়তে বলেন: তখন সে বলে আমার সাতশ মিত্রেদের সাথে ভালো আচরণ করা না হলে আমি ছেড়ে দিব না। তখন রাগে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চেহেরা গম্ভীর হয়ে যায় এবং বলেন: ঐ সাতশ তোমার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এই শর্তে যে, তারা মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে মদীনায় থাকতে পারবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ বিন উবাই মিত্রতার অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি পিড়াপিড়ি করলেও অপর সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত (র) ইহুদীদের

---

[১]) সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত,পৃ:২/৪৭ ও তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৬৭। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/৪৮০ এবং ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, প্রাগুক্ত:১/১৭৬।

[২]) সূরাহ আল-আনফাল:৫৮।

[৩]) আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৪২৯। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন ফারিস, আস-সিরাউ মাআল-ইহুদ: ১/১১৪।

বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মিত্রতার দাবী থেকে দায়মুক্ত হয়ে যান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}[হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে: আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে][১]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড হলেও তাদেরকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ প্রদান করেন[২]। তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং তাদের অধিকাংশ সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ গনীমত হিসেবে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের মালিকানার অন্তর্ভূক্ত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) মুহাম্মদ বিন মুসলামাহকে তাদের সম্পদের তালিকা করে জমা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কায়নুকার ইহুদীরা অধিক শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তারা অস্ত্র ফেলে পরাজিত হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়। তাদের এই করুণ পরিণতির পর মদীনার অন্যান্য ইহুদী গোত্রগুলো ভয়ে কিছুদিন চুপচাপ ছিল।

বনু কায়নুকা'র অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে মদীনার সনদে বনু কায়নুকার ইহুদীরাও চুক্তিবদ্ধ ছিল; সুতরাং চুক্তির শর্ত মেনে চলা ও চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। চুক্তিবদ্ধ কোনো জাতি বা গোত্রের শত্রুর পক্ষে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতো। বদরযুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অপ্রত্যাশিত (ইহুদীরে মতে) ও অবিস্মরণীয় বিজয়ের পর তারা অন্তরের গোপনীয় মুসলিম-বিদ্বেষ ধরে রাখতে পারেনি; এক পর্যায়ে তা প্রকাশ করে ফেলে। বনু কায়নুকার বাজারে সংঘটিত আরব মহিলার পর্দা উন্মোচন একটি উপলক্ষ মাত্র। উক্ত ঘটনায় বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে:

ক) **নারীর সম্মান ও মর্যাদা:** ঘটনার মূল সূত্রে আমরা দেখতে পাই ইহুদীদের মুসলিম মহিলার চেহেরা উন্মোচনের প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র একজন মুসলিম মহিলার চেহেরা উন্মোচনের কারণে বনু কায়নুকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অভিযান পরিচালনা

---

[১]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৫১-৫২।

[২]) সহীহ বুখারী [৪০২৮] ও সহীহ মুসলিম [১৭৬৬]।

দৃশমান হলেও মূল বিষয় অবশ্যই গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা। তবে এটাও সত্য ইসলাম নারীর সম্মান ও মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। বিশ্ব ইতিহাসে যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে আছে, উমাইয়া যুগে এক মুসলিম মহিলার সম্মানহানির ঘটনায় উমাইয়া শাসক হজ্জাজ বিন ইউসুফ ভারতবর্ষের হিন্দু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করে সৈন্য পাঠিয়ে ভারত জয় করেছিলেন। আব্বাসী যুগে এক মুসলিম মহিলার *ওয়া-মুতাসিমাহ* ডাকে সাড়া দিয়ে আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ কাদেসিয়ার খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দির শেষের দিকে **১৯৯৭** সালে এক মহিলা সাংসদের মাথার স্কার্পের বিরুদ্ধে সেক্যুলার তুর্কী সেনাবাহিনীর চাপের মুখে তুরস্কের ইসলামী রাফা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবেকান আপোষ না করে পদত্যাগের বিষয়টি বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই ত্যাগের বিনিময়ে তুরস্কের রাজনীতির মঞ্চ থেকে সেক্যুলার তুর্কী সেনাবাহিনীর নির্বাসন ও গত বিশ বছরের অধিক সময় থেকে ইসলামপন্থীদের তুরস্ক শাসন বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়।

খ) **মুসলিম মহিলার পর্দা:**ইসলাম শুধুমাত্র মহিলাদের পর্দার নির্দেশ করে না, যা ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে নারীর অধিকার হরণ বলে সর্বত্র অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি পর্দার নির্দেশনা এসেছে। কুরআন করীমের সূরাহ আন-নূরের ত্রিশ নাম্বার আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে পর্দার নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর একত্রিশ নাম্বার আয়াতে নারীদের পর্দার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে নারীদের মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী'র শরয়ী পর্দার অন্তর্ভূক্তি নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য দৃশ্যমান।

আল্লাহ'র রাসুল (স) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস{لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين}[হজ্বে মুহরিম মহিলা নিকাব করবে না এবং হাতমোজা পরিধান করবে না][১] দ্বারা প্রমাণিত মহিলার মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী শরয়ী পর্দার অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে অনেক ইসলামী গবেষক মনে করেন যে, মানুষের মুখমন্ডল হলো দৃষ্টি আকর্ষণের মূল কেন্দ্র। মুখমন্ডল উন্মুক্ত থাকার কারণে বর্তমান আধুনিক যুগে অসংখ্য দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভূক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার কমে যাবে এবং বাস্তবতায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নেকাবধারী মহিলাদের দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান খুবই নগন্য। তারা হজ্বে মুহরিম মহিলাদের মুখমন্ডল উম্মুক্ত রাখার বিষয়টি একটি বিশেষ বিধান হিসেবে বিবেচনা করে সাধারণ বিষয়কে এর অন্তর্ভূক্ত করতে আগ্রহী নয়।

উপরিউক্ত মুহরিম মহিলার পর্দার বিধান সংক্রান্ত হাদীস ব্যতীত আল্লাহ'র রাসুল (স) থেকে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণীত হয়েছে, যেখানে মহিলারা উন্মুক্ত মুখমন্ডলে জনসম্মূকে এসেছে তাদেরকে মুখমন্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। প্রক্ষান্তরে পুরুষদেরকে তাদের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। বুরাইদাহ (র) থেকে বর্ণিত হাদীস:{يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية}[হে আলী! একাধিকবার

১) সহীহ বুখারী [১৮৩৮]।

(নারীর দিকে) দৃষ্টিপাত করো না প্রথমবার ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও দ্বিতীয়বার নয়][১]। অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত হাদীস [আল্লাহ'র রাসুল (স) হজ্বের সময় ইয়ামুন্নাহ্‌রের (ঈদুল আযহার) দিনে ফাদ্বল ইবন আব্বাসকে তাঁর বাহনের পিছনে বসিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) লোকজনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর খাসআম গোত্রের এক রূপসী মহিলা এসে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তাঁর পিতার হজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; এমতাবস্থায় ফাদ্বল ইবন আব্বাস উক্ত মহিলার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) ফাদ্বল ইবন আব্বাসের থুতনী ধরে তারমুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন][২]।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী শরয়ী পর্দার অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া মহিলাদের নামায আদায়ের সময় মাথা ঢেকে রাখতে হয় কারণ মহিলাদের মাথার চুল পর্দার অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু তাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখতে বলা হয়নি। যদি মুখমন্ডল শরয়ী পর্দার অন্তর্ভূক্ত হতো মাথার মতো মুখমন্ডলও ঢেকে রাখা অপিরহার্য হতো[৩]। তবে মহিলার শরীরের যে কোনো অংশের প্রতি যৌনদৃষ্টিতে তাকানো নিষিদ্ধের বিষয়ে কারো মতবিরোধ নেই।

গ) বনু কায়নুকার ইহুদীদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যতই ইহুদীরা বাহ্যিক দিক থেকে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোক না কেন? তারা কখনো মুসলিম জাতির সত্যিকারের বন্ধু হবে না। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ তাদের অন্তরের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। কখনো তা দৃশ্যমান হয়, কখনো তারা সুকৌশলে তা এড়িয়ে চলে, প্রয়োজনে তার সদ্বব্যবহার করে। সুতরাং কুরআন করীমের একাধিক আয়াতে ইহুদী-খৃষ্টানদের বন্ধু বানাতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}[হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে; সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন, ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে][৪]।

---

[১]) সুনান আবী দাউদ [২১৪৯], জামে তিরমিযী [২৭৭৭] ও মুসনাদ আহমদ [২২৯৯১]।

[২]) সহীহ বুখারী [৬২২৮] ও সহীহ মুসলিম [১৩৩৪]।

[৩]) তবে নামাযের পর্দার বিধান ও পরপুরুষের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার পর্দার বিধানের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

[৪]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৫১-৫২।

উহুদ অভিমূখে অভিযান

উহুদযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইসলামের ইতিহাসে উহুদযুদ্ধ একটি স্মরণীয় ঘটনা। এক বছর পূর্বে মুসলিমগণ মহানবী (স)'র নেতৃত্বে ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রথমযুদ্ধে (বদর) স্মরণকালের সেরা বিজয় অর্জন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে, মক্কাহ'র মুশরিকরা বদরযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অবশ্যই বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসবে। উহুদযুদ্ধের শেষে মুশরিকদের দলপতি আবু সুফয়ান তাগিদ দিয়েছিল এই বলে যে,"আজ বদরযুদ্ধের প্রতিশোধের দিন এবং যুদ্ধ চলমান বিষয়" মহানবী (স) আবু সুফয়ানের এই কথার কোনো উত্তর দেননি[১]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শত্রু দলপতির ঘোষণা যে, আবু সুফয়ানের নেতৃত্বাধীন মুশরিক বাহিনী ও মহানবী (স)'র নেতৃত্বাধীন তাওহিদী বাহিনী'র মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে এবং মক্কাহ বিজয় পর্যন্ত ঘটেছিলও তাই।

অতঃপর মক্কাবাসী বদরযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আবু সুফয়ানের ব্যবসায়িক সম্পদের সাহায্যে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো এবং সমগ্র মক্কাবাসীর ঐকমত্যের ভিত্তিতে বদরযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদের সাথে যোগ দেয় আরো কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন। যোদ্ধাদের উৎসাহ প্রদান ও রণক্ষেত্র থেকে যোদ্ধাদের পালানো রুখতে আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ'র নেতৃত্বে একদল প্রতিশোধ পরায়ণ নারীরও এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ আবু সুফয়ানের বাহিনী তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে মক্কাহ ত্যাগ করে[২]।

বদরযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশদের মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কাহ ত্যাগ সম্পর্কে মহানবী (স) যখন অবগত হন; তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। তিনি সাহাবীদের মদীনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করতে অথবা মদীনায় অবস্থান করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বললে সাহাবীদের একদল মদীনা থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম পরিচয়দানকারী মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইও অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে সাহাবীগণের বড় একটি অংশ বিশেষ করে যারা কোনো কারণে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এবং অনুপস্থিতির কারণে "আহলে বদর"এর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত; তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে মহানবী (স) কে পীড়াপীড়ি শুরু করলে মহানবী (স) তাঁদের মতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ঘরে প্রবেশ করে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসেন।

অতঃপর যাঁরা মদীনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মহানবী (স) কে পীড়াপীড়ি করেছিলেন তাঁদের ধারণা হলো; হয়তো মহানবী (স) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের পীড়াপীড়িতে সম্মত হয়েছেন ভেবে তাঁরা লজ্জিত হয়ে বললেন যে, মনে হয় আমরা আপনাকে বাধ্য করেছি যা আমাদের উচিত হয়নি, আপনি ইচ্ছা করলে বিরত থাকুন। অতঃপর মহানবী

[১]) ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, প্রাগুক্ত:২/৩০৮।

[২]) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ:৩৪০। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ।

(স) বললেন:{ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل}[রণসাজে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ না করে যুদ্ধের পোষাক খুলে ফেলা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়][১]।

উহুদযুদ্ধের বিবরণ

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) হিজরতের ৩২ মাস পর শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার এক হাজার সাহাবী নিয়ে কুরাইশের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়ে মদীনা ও উহুদের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে আবদুল্লাহ বিন উবাই এক তৃতীয়াংশ সৈন্য (কম-বেশি ৩০০ জন যাদের অধিকাংশ তার গোত্রের) নিয়ে এই বলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দল ত্যাগ করে যে, আমার মত গ্রহণ করা হলো না অথচ বাচ্চাদের মত গৃহীত হলো, আমরা কেন নিজেদের হত্যার মুখোমুখী করবো তা আমরা জানি না?[২] তাদেরকে অভিযানে ফিরিয়ে আনার জন্য আবদুল্লাহ বিন হারাম বারবার সতর্ক করে বলতে লাগলেন যে, আল্লাহ'র নবীকে অপমান করো না; কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনেনি[৩]। অতঃপর তাদের সম্পর্কে কুরআন করীমের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো:{ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا}[অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য কখনো কোনো সঠিক পথ পাবে না][৪]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কিছু সাহাবী ইহুদীদের সহযোগিতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তাদের সাথে যেহেতু মুসলিমদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-সহযোগিতার চুক্তি রয়েছে। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স) এই বলে তা নাকচ করে দেন যে,{لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك}[মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা আমরা নিব না][৫]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের (সাতশ'র অধিক নয় অপরদিকে শত্রুপক্ষ ন্যূনতম তিন হাজার) বিভিন্ন শ্রেণীতে রণবিন্যাস এভাবে সাজালেন যে, মুসলিম বাহিনীর সামনে মদীনা এবং পিছনের দিকে রয়েছে উহুদ পাহাড়। মুসলিম বাহিনীর পিছনে পাহাড়ের গিরিপথে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর'র নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরান্দাজ মোতায়েন করে তাঁদের নিদের্শ দেয়া হলো যে,"তোমরা তোমাদের স্থানে অটল থাকবে এবং আমাদের পিছনের দিক সংরক্ষণে রাখবে। যদি দেখো যে, আমরা বিজয় অর্জন করেছি

---

[১]) ঘটনাটি ইমাম আহমদ, ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম ও তাবরী সকলেই নিজ নিজ গ্রন্থে পাশাপাশি অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী [৭৩৬৯] হাদীসের পরে উক্ত ঘটনার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬২, তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/৫০০, মুসনাদ আহমদ [১৪৮২৯] ও ইমাম নাসায়ী'র সুনান কুবরা [৭৬৪৭]।

[২]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/৮৭ ও সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬৫।

[৩]) সহীহ মুসলিম [১৮১৭] ও সুনান আবী দাউদ [২৭৩২]।

[৪]) সূরাহ আন-নিসা:৮৮।

[৫]) সহীহ মুসলিম [১৮১৭] ও সুনান আবী দাউদ [২৭৩২]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৮০ ও সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬২।

তোমরা তাতে অংশ নিবে না এবং যদি দেখো যে, আমাদের হত্যা করা হচ্ছে তবুও আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে না"[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজের তরবারী বিশিষ্ট সাহাবী আবু দুজানা (র)'র হাতে দিলেন এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকা মুসআব বিন উমাইর (র)'র হাতে ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে দেখতে পান এবং যুদ্ধের প্রথম সারিতে আবু দুজানা (র), হামযাহ (র) ও মুসআব বিন উমাইর (র) ছিলেন। মুসআব বিন উমাইর (র) শাহাদাত বরণ করলে আলী (র) পতাকা ধারণ করেন। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বিজয় সাধিত হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর কুরাইশদের পরাজয় অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নারীরা পলায়ণরত যোদ্ধাদের অভিশাপ দিচ্ছে। মুসলিম বাহিনী তাদের পিছু নিয়ে তাদের হত্যা করছে এবং গনীমত নিয়ে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের ওপরে অবস্থানরত তীরান্দাজগণ নীচে নেমে আসতে গেলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কয়েকজন ব্যতীত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করে অধিকাংশ সৈন্য নীচে নেমে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে যান।

তবে তীরান্দাজগণের প্রধান আবদুল্লাহ বিন জুবাইর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিদের্শের অবাধ্য হননি এবং গুটিকয়েকজন তীরান্দাজ নিয়ে গিরিপথে অবস্থান করেছিলেন। কুরাইশদের পক্ষের খালিদ বিন অলীদ গিরিপথে ফাঁকা ও স্বল্পসংখক তীরান্দাজ দেখে দ্রুত ঘোড়া নিয়ে সেদিকে গেল এবং ইকরামাহ বিন আবী জাহ্ল তার পিছু নিয়ে তীরান্দাজদের ওপর আক্রমণ করে আবদুল্লাহ বিন জুবাইরসহ সবাইকে শহীদ করে পিছনের দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর ভয়াবহ আক্রমণ করে বসলো[২]। পশ্চাতে আক্রমণের তীব্রতায় মুসলিম বাহিনী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং খালিদ বিন অলীদের দল রাসুল (স) কে তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মূখমন্ডলে প্রচন্ড আঘাত লাগে এবং তাঁর একটি দাঁত শহীদ হয়। অতঃপর তিনি মূখমন্ডল থেকে রক্ত মুছে বলেন: কিভাবে সেই জাতি নাজাত পাবে যারা তাদের নবীকে ছেড়ে পালিয়ে যায় অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ'র দিকে ডাকছেন? পরে নবী তনয়া ফাতিমা (র) ও আলী (র)'র প্রচেষ্টায় রক্ত বন্ধ হয়[৩]।

অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রচার করা হয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) শহীদ হয়েছেন। এই ভূয়া খবরের কারণে মুসলিম বাহিনীর অন্তরে প্রচন্ড ভয়-ভীতি প্রবেশ করে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পশ্চাতে পালাতে থাকেন। অতঃপর যুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয় এবং যুদ্ধ থেমে গেলে মুসলিমগণ তাঁদের শহীদদের লাশ নিয়ে ভয়ের মধ্যে থাকেন। যাঁদের মধ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা হামযাহ (র), ইয়ামান (র), আনস বিন নাযর (র) ও মুসআব বিন উমাইর (র) সহ অনেকেই ছিলেন[৪]। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর চাচার

---

[১]) সহীহ বুখারী [২৮১২ ও ৩৭৩৭] ও সুনান আবী দাউদ [২২৮৮]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৮২ এবং শব্দ ভিন্ন হলেও সমার্থক বর্ণনা করেছেন ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬২।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৭৩৭]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৮৩।

[৩]) সহীহ মুসলিম [১৭৯১], সুনান ইবন মাজাহ [৩২৬৯] ও মুসনাদ আহমদ [১২৮৩১]। সমার্থক শব্দমালা নিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

[৪]) সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, যাঁরা উহুদযুদ্ধে নিহত হয়েছেন (২৮)। বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন: উহুদযুদ্ধে সত্তর জন মুসলিম শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনাহ'র যুদ্ধে সত্তর জন মুসলিম শহীদ

মৃত্যু ও তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো করে অবমাননা করাতে খুব বেশী ব্যথিত হলেন। অতঃপর গোসল ও জানাযাহ ছাড়া রক্তসহ তাঁদের উহুদপ্রান্তরে সমাধীস্থ করার নির্দেশ প্রদান করেন[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) শনিবার সন্ধ্যায় উহুদ থেকে মদীনায় ফিরে এসে সেই রাত্রি অতিবাহিত করেন এবং মুসলিমগণ তাঁদের আহত যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ফজরের নামাযের পর আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিমগণকে শত্রুর সন্ধানে বের হতে ঘোষণা করার জন্য বেলালকে নির্দেশ দেন। তবে গতকাল যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে বের না হয়। আলী (র)'র হাতে পতাকা দিয়ে আহত সাহাবীদের নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) হামরাউল আসাদ (মদীনা থেকে দশ মাইল দূরত্বে) নামক স্থানে অবস্থান করে প্রচুর আগুন জালালেন যেন দূর থেকে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম মনে হয়।

মুসলিম বাহিনীর পাশ দিয়ে মাআবদ খুযায়ী (তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন) যাচ্ছিল। অতঃপর তাঁদের অতিক্রম করে কুরাইশদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যারা উহুদযুদ্ধের বিজয়ে উল্লাসিত এবং তারা মুসলিম বাহিনীকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনায় ফিরে এসে আক্রমণের পরামর্শে লিপ্ত। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ তাদেরকে এ কাজে নিষেধ করে। অতঃপর আবু সুফয়ান মাআবদ খুযায়ীকে দেখে বললো: মাআবদ তোমার পিছনে কী দেখেছ? তোমার দুর্ভাগ্য! মুহাম্মদ (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তোমাদের অনুসন্ধানে বের হয়েছে, আমি এত বড় দল আর কখনো দেখিনি। এই কথায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা মক্কায় চলে গেলে রাসুল (স) হামরাউল আসাদ স্থানে আরো তিন দিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন[২]।

উহুদযুদ্ধের শিক্ষা

এই যুদ্ধ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বহন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো যে, মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে তাঁরই দ্বীন তথা বিধি-বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন এবং আল্লাহ তাঁদের সাথেই আছেন যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতঃপর এই যুদ্ধে কেন মুসলিমদের এত বড় বিপর্যয় হলো? কুরআন করীমে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কারণসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কে মুসলিমদের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তাছাড়া যুদ্ধের প্রথমার্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে বিজয় প্রদান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে দেয়া অঙ্গীকারের বাস্তবায়নও করেছেন।

যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে{ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ

হয়েছেন এবং ইয়মামহ'র যুদ্ধেও সত্তর জন মুসলিম শহীদ হয়েছেন। তবে ইয়মামাহ'র যুদ্ধ আবু বকর (র)'র যুগে সংঘটিত হয়েছিল। সহীহ বুখারী [৩৮৫০]।

১) সহীহ বুখারী [১৩৪৩], সুনান আবী দাউদ [৩১৩৮ ও ৩১৩৯], সুনান নাসাঈ [১৯৫৫],জামে তিরমিযী [১০৩৬] ও সুনান ইবন মাজাহ [১৫১৪]।

২) তাবকাতে ইব্ন সাআদ,প্রাগুক্ত:৩/৮৪ ও সীরতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬৩। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/৫১২।

{صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[আর নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ব্যর্থ হচ্ছিলে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছিলে, আর যা তোমরা চাচ্ছিলে (বিজয়) তা দেখার পর (নবীর নির্দেশ) অমান্য করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল][১]। কুরআন করীমের বর্ণনার আলোকে নিম্নে উহুদযুদ্ধের পরাজয়ের সাম্ভাব্য কারণসমূহ উপস্থাপিত হলো:

১) সাধারণত পৃথিবী তার নিজস্ব গতি ও রীতি-নীতিতেই চলে এবং সাধারণত এর ব্যতিক্রম হয় না। বদরযুদ্ধের প্রেক্ষাপট উহুদযুদ্ধ অপেক্ষা একটু ভিন্ন। বদরযুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় শত্রু পক্ষের চেয়ে কম ও প্রস্তুতির দিক থেকেও দুর্বল বিধায় তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ঐক্য লক্ষণীয় ছিল এবং সকলেই মহানবী (স) কে ঘিরে ছিলেন এবং আল্লাহ'র পথে জিহাদে বিজয় অর্জনে নিজেদের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। কিন্তু উহুদযুদ্ধে তাঁদের চিত্র অনেক ভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। তাঁরা পরস্পর মতবিরেধে জড়িয়ে পড়েন, ব্যর্থতা, বিবাদ ও অবচেতন মনে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে ঘাটতি প্রতীয়মান হয়েছে; বরং কারো কারো অন্তর পার্থিব বিষয়ের (গনীমত) প্রতি ধাবিত হয়।

যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{مِنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا}[তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া][২] এবং কুরআন করীমের একই সূরায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ না মানার বর্ণনাও এসেছে, যেমন:{ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}[আর তোমরা যখন (পর্বতের)ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি; অথচ রাসুল (স) ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। প্রতিফলে তোমাদের ওপর এলো দুঃখের ওপরে দুঃখ, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর (বিজয় ও গনীমত) জন্য বৃথা দুঃচিন্তা না করো এবং যার সম্মুখীন হয়েছ (পরাজয় ও ভীতি) সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন][৩]।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গনীমতের সম্পদ লাভের প্রচেষ্টা ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ অমান্য করা এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২) দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ'র পক্ষ থেকে মুসলিমদের শিক্ষা প্রদান করা যে, জয় ও পরাজয় পৃথিবীর বৈশিষ্টের অন্তর্ভূক্ত বিধায় জয়-পরাজয় কারো জন্য চিরস্থায়ী নয় এবং এটি উহুদযুদ্ধে ঘটেছে তাই কোনো এক যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে যেন মুসলিম বাহিনী

---

১) সূরাহ আলে ইমরান:১৫২।

২) সূরাহ আলে ইমরান:১৫২।

৩) সূরাহ আলে ইমরান:১৫৩।

আল্লাহ'র রাহমত থেকে নিরাশ না হন, বিশেষ করে সেই পরাজয় যদি নিজেদের ভুলের কারণেই ঘটে থাকে। এই চিত্র কুরআন করীমের একাধিক স্থানে আমরা দেখতে পাই, যেমন:{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}[তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে][১]। আরো এরশাদ হচ্ছে:{إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}[তোমাদের যদি হতাহত হওয়া স্পর্শ করে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ দলেরও অনুরূপ ক্ষতবিক্ষত হওয়া পাকড়াও করেছিল। আর এ জাতীয় দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না][২]।

৩) তৃতীয়ত উহুদযুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে যাচাই-বাছাই করে নিতে চান এবং তাঁদের শক্তির বিকাশ ঘটাতে চান যা শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। পরাজয়ের গ্লানি ও প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বর্ণনা কুরআন করীমের এর পরবর্তী আয়াতে এসেছে:{وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ}[আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান][৩]।

উপরিউক্ত আয়াতে কুরআন করীম মুসলিম বাহিনীকে সতর্ক করে দেয় যে, যুদ্ধ তথা দিনকাল পালাক্রমে পরিবর্তনশীল। পরাজয়ে নিরাশ না হয়ে পরাজয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করা ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যুদ্ধে মুসলিমগণ যে অবস্থার সম্মূখীন হয়েছেন তার জন্য তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থতা থেকে কখনো সফলতা ও বিজয় আসে না বরং ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করে নতুনরূপে শক্তি সঞ্চার করে পুনরায় শত্রুর বিরুদ্ধে যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই কল্যাণকর।

তাছাড়া এই যুদ্ধে কুরাইশদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বদরযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মোচন ও মুসলিম বাহিনীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বিধায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, অপরদিকে মুসলিমগণ এই যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুতরাং কুরাইশরা ছিল মারমুখী এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদ প্রায়, অপরদিকে মুসলিমগণ নিজেদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত এবং কুরাইশরা মদীনার দ্বারপ্রান্তে এসে যুদ্ধ করেছিল যাতে মুসলিম বাহিনীর পালানোর কোনো জায়গা না থাকে।

এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামে যুদ্ধনীতির বিশেষ নীতি হলো দ্বীন ও নিজের প্রতিরক্ষা করা। কুরআন করীমে সূরাহ আলে ইমরানের ১৫২ নং আয়াতে জয় ও পরাজয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং যুদ্ধনীতির সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে; যাতে করে

---

১) সূরাহ আলে ইমরান:১৩৭।

২) সূরাহ আলে ইমরান:১৪০।

৩) সূরাহ আলে ইমরান:১৪১।

মুসলিমগণ জীবনপরিক্রমা থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং যুদ্ধজয়ের কারণসমূহ গ্রহণ করতে পারে। যুদ্ধে বিজয়ের কারণসমূহ পরিচিত ও নির্ধারিত আছে যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের সবর্দা বিজয় প্রদানে শক্তি রাখেন; কিন্তু মানবজাতি যেহেতু পৃথিবীতে বসবাস করে বিধায় পৃথিবীর রীতি-নীতি উপেক্ষা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো কিছু সাধারণত করেন না এবং যুদ্ধে বিজয়ের কারণসমূহ ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচারণে পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কুরআন করীমের বর্ণনা থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিজয় প্রথমবার মুসলিম বাহিনীর পক্ষে ছিল; কিন্তু তাঁরা যখন দ্বিতীয়বারে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ অমান্য করেন এবং পার্থিবজীবন তাঁদের কাছে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন পরাজয় তাঁদের ওপর চেপে বসে। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[আর নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ব্যর্থ হচ্ছিলে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছিলে, আর যা তোমরা চাচ্ছিলে (বিজয়) তা দেখার পর (নবীর নির্দেশ) অমান্য করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল][১]।

৪) উহুদযুদ্ধে মুসলিম পরিচয় প্রদানকারী মুনাফিকদের সুস্পষ্ট উপস্থিতিও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কীভাবে আবদুল্লাহ বিন উবাই যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তার অনুগত প্রায় তিনশ জন যোদ্ধা নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করে। তার অভিযোগ আল্লাহ'র রাসুল (স) তার মতো বায়োজ্যেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন যুবক সাহাবীদের মতামত গ্রহণ করেন। মূলত সে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল না; কারণ সে বিপজ্জনক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চায় না এবং এগুলো হলো মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তারা ইসলামে গনীমতের সম্পদ নিতে আগ্রহী তবে রণাঙ্গনে উপস্থিত হতে রাজী নয়।

৫) উহুদযুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অনুগত তিনশ জন যোদ্ধা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরও আল্লাহ'র রাসুল (স) ইহুদীদের সাহায্য নিতে সম্মত হননি। যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস ও তাবকাতে ইবন সাআদের বর্ণনায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে,[মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা আমরা নিব না][২], অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, [আল্লাহর রাসুল (স) বদরযুদ্ধে তাঁর পক্ষে

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:১৫২।

[২]) সহীহ মুসলিম [১৮১৭] ও সুনান আবী দাউদ [২৭৩২]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৮০ ও সীরতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬২।

যুদ্ধরত এক লোককে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো? লোকটি না সূচক উত্তর দিলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: তুমি ফিরে যাও আমি কখনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না][১]। উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবসময় অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ ইসলাম অনুমোদিত নয়।

তবে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন যেমন হিজরতের সময় মদীনার পথ দেখানোর জন্য বিশ্বস্ততার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবদুল্লাহ বিন আরকাত বা উরাইকিতকে পথপদর্শক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন অথচ আবদুল্লাহ বিন আরকাত বা উরাইকিত তখনও মুশরিক ছিলেন[২]। তাছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স) হুনায়নের যুদ্ধে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ'র কাছ থেকে থেকে একশ বর্ম ও সামরাস্ত্র ধার নিয়েছিলেন তখনও সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ মুশরিক ছিলেন[৩]।

মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করার বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহদের মতে যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করা ইসলাম সমর্তন করে না। তবে ইমাম শাফেয়ী এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন: যদি সমরনেতা (ইমাম) মনে করেন যে, নির্দিষ্ট কোনো অমুসলিম প্রজ্ঞাবান ও মুসলিমদের ব্যাপরে বিশ্বস্ত এবং তার সহযোগিতার মুসলিম বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে তাহলে বৈধ অন্যথায় নয়[৪]। উপরিউক্ত বিষয়টি এই গ্রন্থের "হুনায়ন অভিমূখে অভিযান" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

৬) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিচক্ষণতার পরিচয় তাঁর যুদ্ধ পরিচালনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি মুসলিম বাহিনীকে বিভিন্ন উপ-দলে বিন্যাস করে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে একটি তীরান্দাজ যোদ্ধার দল সংরক্ষণ করে তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, মাঠের যোদ্ধরা জয়ী হোক অথবা পরাজিত হোক কোনো অবস্থাতেই তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ না করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপরিউক্ত নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই তাঁর যুদ্ধবিদ্যা বা রণকৌশলের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে অসাধারণ বিরল প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, সমগ্র নবী-রাসুলগণের মধ্যে বিরল প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা বিদ্যমান ছিল, মূলত এগুলো নুবুওয়্যতের গুণ বা যোগ্যতা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

সম্ভবত আল্লাহ'র রাসুল (স) নুবুওয়্যতের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে এই যুদ্ধে যা ঘটবে তা পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন যা যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হওয়ার পর সাহাবীদের

---

১) সহীহ মুসলিম [১৮১৭]।

২) সহীহ বুখারী [২২৬৩ ও ২২৬৪]।

৩) ঘটনাটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে যেমন: ইব্‌ন সাআদ তার তাবকাত গন্থে, প্রাগুক্ত:৪/৪০১, ইব্‌ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত:৩/৩৫, মুহাম্মদ আল-গাযালী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত,পৃ:২৯৭ এবং সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে , প্রাগুক্ত, পৃ:২৮৪।

৪) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন "মুগনী আল-মুহতাজ" প্রাগুক্ত:৪/২২১।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "রণসাজে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ না করে যুদ্ধের পোষাক খুলে ফেলা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়"[১] তা থেকে সহজেই অনুমেয় বিধায় সাহাবীগণ তাঁর আদেশ ও উপদেশসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। রণক্ষেত্রে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সমরনেতার আদেশ ও উপদেশ পরিপন্থী কোনো কর্মে কী পরিণতি হয় তা হাতে-কলমে বুঝানোর জন্য যেন তিনি এই যুদ্ধে তাঁর সাহাবীদের সাথে একটি প্রাণবন্ত কৌশলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কারণ কখনো নেতিবাচক ফলাফল ইতিবাচক ফলাফল থেকেও অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

৭) মূলত যুদ্ধকালীন সময়ের দিকে তাকালে যুদ্ধকালীন সময়কে দুভাগে বিভক্ত প্রতীয়মান হয়:

ক) যুদ্ধের প্রথমার্ধে মুসলিম বাহিনী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আদেশ ও উপদেশসমূহের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশিত স্থানে অবস্থানে অটল ছিলেন। অতঃপর তার পরিণতি কি হলো? যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে চলে আসে এবং মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। অপরদিকে ভয়-ভীতি তিন হাজার মুশরিকদের পেয়ে বসে এবং তারা পালানো শুরু করে দেয়। কুরআন করীমে যুদ্ধের এই সময়ের অবস্থান এভাবে বর্ণীত হলো:{ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ }[আর আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন,যখন তোমরা তারই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে][২]।

খ) যুদ্ধের দ্বিতীয়াংশে মুসলিম বাহিনীর একাংশ যুদ্ধ শেষ হয়েছে মনে করে নিজেদের প্রতিরক্ষা ভুলে গিয়ে গনীমতের সন্ধানে মুশরিকদের পিছনে দৌঁড়াতে লাগলেন; তা দেখে পাহাড়ের গিরিপথে অবস্থানরত তীরান্দাজগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। একদল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মতো ওখানেই অবস্থান করতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ থাকেন; তাঁদের মধ্যে দলপতি আবদুল্লাহ বিন জুবাইরও ছিলেন। অপর দল যেহেতু যুদ্ধ শেষ (তাঁদের ধারণা মতে) হয়ে গেছে বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুমতির প্রয়োজন নেই মনে করে গনীমতের সন্ধানে নীচে নেমে এসে গনীমত সংগ্রহকারীদের দলে যুক্ত হয়ে যান। অতঃপর পাহাড়ের ওপরে মুসলিম বাহিনীর সংরক্ষিত প্রতিরক্ষাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

এতেই রণকৌশলে অভিজ্ঞ খালিদ বিন অলীদের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর সংরক্ষিত পাহাড় তীরান্দাজমুক্ত পেয়ে তাঁদের ওপর তার দল নিয়ে প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করে তাঁদের পর্যস্ত করে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে আক্রমণ শুরু করে দেয়। মুসলিম বাহিনী হঠাৎ পিছন থেকে আক্রমণ হওয়ায় কুরাইশদের নতুন দল যুদ্ধে যোগ দিয়েছে মনে করে ঘাবড়ে যান এবং যুদ্ধের প্রথমার্ধে যে ভয়-ভীতি তিন হাজার মুশরিকদের পেয়ে বসেছিল তা এখন মুসলিম বাহিনীকে পেয়ে বসে এবং মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকেন।

---

[১]) ঘটনাটি ইমাম আহমদ, ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম ও তাবরী সকলেই নিজ নিজ গ্রন্থে কাছাকাছি অর্থে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৬২, তারীখে তাবরী, প্রাগুক্ত:২/৫০০, মুসনাদ আহমদ [১৪৮২৯] ও ইমাম নাসাঈ'র সুনান কুবরা [৭৬৪৭]।

[২]) সূরাহ আলে ইমরান:১৫২।

কুরআন করীমে যুদ্ধের শেষার্ধের অবস্থান এভাবে বর্ণিত হলো:{ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}[এমনকি যখন তোমরা ব্যর্থ হচ্ছিলে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছিলে, আর যা তোমরা চাচ্ছিলে (বিজয়) তা দেখার পর (নবীর নির্দেশ) অমান্য করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। আর তোমরা যখন (পর্বতের) ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রাসুল (স) ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। প্রতিফলে তোমাদের ওপর আসলো দুঃখের ওপরে দুঃখ, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর (বিজয় ও গনীমত) জন্য বৃথা দুঃচিন্তা না করো এবং যার সম্মুখীন হয়েছ (পরাজয় ও ভীতি) সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন][১]।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মতো পাহাড়ের গিরিপথে অবস্থান না করে গনীমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ময়দানে আসার কারণে সমগ্র মুসলিম সেনাদলে পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্ভবত মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ অমাণ্য করলে কী পরিণতি হয় এই যুদ্ধে তা শিক্ষা দিলেন; যেন ভবিষ্যতে তার পুণরাবৃত্তি না ঘটে।

৮) এই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স) আহত হন; তাঁর মূখমন্ডলে প্রচন্ড আঘাত লাগে,তাঁর একটি দাঁত শহীদ হয় এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিম বাহিনী আরো ঘাবড়ে যান। কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে মুসলিমগণের সম্পৃক্ততা এবং তাঁদের মাঝে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অবস্থানকে মুসলিম বাহিনী এক বিশাল শক্তি মনে করতেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করতে পারেননি। তবে তাঁরা যখন এই অবচেতন মন থেকে সচেতন হন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যুর বিষয়ে সঠিক সংবাদ পান তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ'র রাসুল (স) আহত হওয়ার কারণে ভগ্নহৃদয় হন। তবে তাঁদের ঈমানী শক্তির যেন কখনো বিলুপ্তি না ঘটে, তাঁরা যেন ইসলামের ওপর সর্বদা অটল থাকেন সম্ভবত মুসলিম বাহিনীকে সেই শিক্ষাই দিলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যেমন কুরআন করীমে তার বর্ণনা এসেছে:{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}[আর মুহাম্মদ একজন রাসুল বৈ তো নয়। তার পুর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা হত্যাকান্ডের শিকার হন; তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:১৫২-১৫৩।

কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ’র কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন][১]।

৯) সহীহ বুখারির বর্ণনা মতে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ’র রাসুল (স) উহুদযুদ্ধের শহীদদের গোসল ও জানাযার নামায ব্যতীত এক কবরে দুজন করে দাফন করার নির্দেশ দেন[২]। উপরিউক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদদের গোসল ও নামায ব্যতীত সমাধিস্থ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেন যে, বিভিন্ন বর্ণনায় একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ’র রাসুল (স) উহুদযুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েননি[৩]। তবে যে সকল বর্ণনায় “আল্লাহ’র রাসুল (স) দশজন দশজন করে তাঁদের জানাযা পড়েছেন এবং প্রতিবার হামযাহ (র) ও ছিলেন” তা দুর্বল ও সম্পূর্ণ ভুল[৪]।

১০) আল্লাহর রাসুল (স) মদীনায় ফিরে যুদ্ধাহত মুসলিমগণ এবং শুধুমাত্র যাঁরা পূর্বের দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা, চিকিৎসা এবং বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে পরের দিন সকালে শত্রুর সন্ধানে পুনরায় বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সাহাবীগণ আল্লাহ’র রাসুল (স)’র ডাকে সাড়া দিয়ে মুশরিকদের সন্ধানে বিনা প্রশ্নে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নেতৃত্বে বের হয়ে পড়লেন[৫]। তাঁদের মনে এখনো যুদ্ধজয়ের স্পৃহা নিভে যায়নি এবং এইবারে কিন্তু তাঁদের মনে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে বা গনীমতের কামনা নেই; বরং শুধুমাত্র বিজয়ের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে আল্লাহ ও আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সন্তুষ্টি অর্জন অথবা আল্লাহ’র পথে শাহাদাত বরণের উদ্দেশ্যে তাঁরা বের হয়েছেন। তাঁদের সংকল্প ও দৃঢ়তা মাআবদ খুযায়ীর নিকট শুনে সদ্য বিজয়ে উজ্জীবিত কুরাইশ পুনরায় তাঁদের মুখোমুখী হতে সাহস করেনি।

এঁদের সম্পর্কে কুরআন করীমে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}[যারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে বিশাল প্রতিদান। যাদেরকে লোকেরা (মুশরিকরা) বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে (বহু সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে) সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:১৪৪।

[২]) সহীহ বুখারী [৪০৭৯]। আরো বর্ণনার জন্য দেখুন: যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২১৩-২১৮ এবং বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৪১৯।

[৩]) সহীহ বুখারী [১৩৪৩], সুনান আবী দাউদ [৩১৩৮ ও ৩১৩৯] সুনান নাসাঈ [১৯৫৫] ও জামে তিরমিযী [১০৩৬] ও ১৫১৪]।

[৪]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: মুগনী আল-মুহতাজ, প্রাগুক্ত:১/৩৪৯ ও বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৪১৭।

[৫]) এই অভিযান “হামরাউল আসাদ” অভিযান নামে পরিচিত। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২৪১-২৪২, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৪২৬-৪২৭ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত:৩৮৭-৩৮৮।

জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার ভরসার অভিভাবক। অতঃপর ফিরে এল মুসলিম বাহিনী আল্লাহ'র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহ'র অনুগ্রহের অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল][১]।

উহুদদ্ধের কিছু বিরল ঘটনা

১) বিশিষ্ট সাহাবী সাআদ বিন রাবী (র) আল্লাহ'র রাসুল (স) যাকে ভালোবাসতেন এবং কুরাইশদের আগমনের খবর যার কাছে গোপন রেখেছেন। উহুদযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সাআদ বিন রাবী (র)'র সংবাদ জানাতে পারবে? তার কী হলো? সে জীবিতদের মধ্যে না মৃতদের মধ্যে? উবাই ইবন কাআব (র) বললেন: আমি দেখছি হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! অতঃপর তিনি বললেন: যদি তুমি তাকে জীবিত দেখ তাকে আমার সালাম বলো। অতঃপর উবাই ইবন কাআব (র) তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পান এবং তাকে বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে আপনার অবস্থা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে বারোটি আঘাত করা হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি আমার প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে গেছি[২]। অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেছেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তোমার ওপর সালাম এবং তাঁকে বলো: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি, আর আমার স্বজাতি আনসারদের বলো: আল্লাহ'র কাছে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না যদি তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি নিবেদিত প্রাণ থাকে। অতঃপর তিনি ইহজগত ত্যাগ করলেন। উপরিউক্ত সাহাবীর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁরা অন্তিম মুহূর্তেও ঈমানের দৃঢ়তায় অটল এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) কে দেওয়া অঙ্গীকারের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মরণঘাতি আঘাত ও মৃত্যুর যন্ত্রণাও তাঁদেরকে ঈমানী দায়িত্ব পালনে প্রভাবিত করতে পারে না।

২) বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জাহাশ'র প্রার্থনা সম্পর্কে সাআদ বিন আবী আক্কাস (র) বলেন: আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (র) উহুদযুদ্ধের দিন আমাকে বললেন: তুমি আল্লাহ'র কাছে প্রার্থানা করবে না? অতঃপর আমরা দুজনে আল্লাহ'র কাছে দোয়া করতে এক কর্ণারে যাই; সাআদ বলেন: আমি আল্লাহ'র কাছে দোয়া করলাম: হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শক্ত শত্রুর সাথে লড়াই করার সুযোগ দাও, যে আমার সাথে লড়াই করবে এবং আমি তার সাথে লড়াই করবো। অতঃপর আমাকে বিজয় দান করো এবং আমি তাকে হত্যা করবো। তারপর তার সম্পদ ছিনিয়ে নিব। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (র) আমার দোয়ার ব্যাপারে আমীন বললেন। তারপর তিনি আল্লাহ'র কাছে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শক্ত শত্রুর সাথে লড়াই করার সুযোগ দাও, যে আমার সাথে লড়াই করবে এবং আমি তার সাথে লড়াই করবো। তারপর সে আমাকে ধরে আমার নাক কান কেটে দিবে। অতঃপর আগামীকাল (পরকাল) যখন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো তুমি আমাকে বলবে: কে তোমার নাক কান কেটে দিল? তখন আমি বলবো তোমার ও তোমার রাসুল (স)'র পক্ষে যুদ্ধে। তখন তুমি বলবে: সঠিক বলেছ। বিশিষ্ট সাহাবী সাআদ বিন আবী

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান:১৭২-১৭৪।

[২]) আলী বিন বুরহানুদ্দীন আল-হালবী, আস-সীরাহ আল-হালবিয়্যাহ ফী সীরাতে আল-আমীন ও আল-মামুন, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত:২/৫৩২। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী সাল্লাবী, সীরাহ নাবভিয়্যাহ,প্রাগুক্ত: ৪৬০।

আব্বাস (র) তাঁর ছেলেকে এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: আল্লাহ'র কাছে আমার আবেদনের চেয়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ'র প্রার্থনা উত্তম ছিল। সুতরাং দিন শেষে আমি তাঁকে দেখলাম; তাঁর কাটা নাক ও কান একটি সূতায় ঝুলতেছিলো। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে আল্লাহ'র রাস্তায় শাহাদতের কামনা করা বৈধ বলে সহজেই প্রতীয়মান হয়[১]।

৩) বিশিষ্ট সাহাবী হানযালাহ বিন আবী আমির যুদ্ধক্ষেত্রে কুরাইশদের নেতা আবু সুফয়ানের ওপর আঘাত করলে আবু সুফয়ান মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে এবং হানযালাহ তাকে জবেহ করার চেষ্টা করছিলেন; এমতাবস্থায় মুশরিকদের পক্ষ থেকে আসওয়াদ বিন শাদ্দাদ বর্শা দিয়ে হানযালাহ'র ওপর আক্রমণ করলে তাঁর শরীরে বর্শা ডুকে যায় এবং তিনি বর্শা নিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে গেলে প্রতিপক্ষ তাঁকে দ্বিতীয় বার আঘাত করে হত্যা করে। এ ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে জানানো হলে তিনি বলেন: আমি ফেরেস্তাদেরকে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে রূপার পাত্রে রেখে মেঘের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে দেখেছি[২]। অতঃপর এ বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: যুদ্ধের ডাক শুনার পর তিনি যখন বের হন তখন তিনি অপবিত্র ছিলেন[৩]। প্রসিদ্ধ মাগাযীবিদ ওয়াকিদী'র বর্ণনামতে বিশিষ্ট সাহাবী হানযালাহ বিন আমির (র) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই'র মেয়ে জামীলাহকে বিয়ে করেন। অতঃপর উহুদযুদ্ধের পূর্বরাতে নববিবাহিত স্ত্রীর সাথে বাসর রাত উদযাপন করার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নববিবাহিত স্ত্রীর সাথে বাসর রাত উদযাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরের দিন ফজরের নামাযের পর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে পুনরায় আটকে রেখে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁর গোত্রের চারজন লোককে বাসর রাত উদযাপন সম্পর্কে সাক্ষী বানান। পরবর্তীতে তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমান ফাঁক হয়ে যায়, অতঃপর হানযালাহ তাতে প্রবেশ করে, তারপর আসমানের ফাঁক মিলে যায়। অতঃপর আমি মনে করলাম এটি শাহাদতের ইঙ্গিত। সুতরাং আমি বাসর রাত উদযাপন সম্পর্কে চারজনকে সাক্ষী বানালাম[৪]। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বেশকিছু শিক্ষনীয় বিষয় প্রতীয়মান হয় যেমন:

ক) হানযালাহ'র স্ত্রী জামীলাহ (র) স্বপ্নের মাধ্যমে স্বামীর শাহাদতের ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হয়েও স্বামীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র পথে শহীদ হওয়া স্ত্রী ও সন্তানদের গর্বের বিষয়। সুতরাং তিনি স্বামীর সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হয়ে গর্ভবতী হন। অতঃপর তিনি হানযালাহ (র)'র পক্ষ থেকে একটি পুত্র সন্তানের মা হন। আবদুল্লাহ তাঁর নাম রাখা হয়। পরবর্তীতে তিনি আবদুল্লাহ ইবন

---

১) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২১২। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত: ৪৬০।

২) মুহাম্মদ আবদুর রাউফ মুনাভী, ফায়যুল কবীর, মাকতাবাহ তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, মিশর, ১৩৬৫ হিজরী, [২৬৪৬]।

৩) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; ইবরাহীম আল-আলী, সহীহুস সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৮৯।

৪) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, প্রাগুক্ত:১/২৭৩।

গাসীলিল মালাইকাহ (ফেরাস্তা দ্বারা গোসলপ্রাপ্তের পুত্র আবদুল্লাহ) নামে ইতিহাসে পরিচিত হোন।

খ) হানযালাহ বিন আমির (র) কে ফেরাস্তা দ্বারা গোসল প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ'র রাসুল (স) ব্যতীত কেউ দেখেনি। উপরিউক্ত বিষয়ে সাহাবীদেরকে সংবাদ প্রদান তাঁর অসংখ্য মুজিযাসমূহের একটি।

গ) শহীদের অপবিত্র হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে তাঁকে গোসল দেওয়া জরুরী। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী হানযালাহ বিন আমির (র) কে ফেরাস্তাগণ গোসল দেন।

ঘ) বিশিষ্ট সাহাবী হানযালাহ বিন আবী আমির (র) কে ফেরাস্তা দ্বারা গোসল প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাঁর পথে শহীদগণের পৃথিবীতে সম্মানিত করার প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত।

৪) বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (র) উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর পুত্র জাবির (র) কে সম্বোধন করে বললেন: হে জাবির মদীনার মধ্যে আমার বিষয়ে তুমিই সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। আমার মৃত্যুর পর আমার মেয়েদের দেখাশুনার বিষয়টি না থাকলে আমার চোখের সামনে তোমার শহীদ হওয়া কামনা করতাম[১]। আমি উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই এবং আমি নিজেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের মধ্যে প্রথম শাহাদত বরণকারীদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমার মৃত্যুর পরে আল্লাহ'র রাসুল (স) ব্যতীত তোমার চেয়ে আমার আপনজন কেউ নেই। আমার কিছু কর্য আছে তা পরিশোধ করবে এবং তোমার বোনদের প্রতি সদাচারণ করবে[২]।

অতঃপর তিনি উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের প্রথমার্ধে আল্লাহ'র পথে শাহাদত লাভ করেন। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র) উহুদযুদ্ধে তাঁর পিতার শাহাদতের বর্ণনা প্রদান করেন যে, যখন আমার বাবা উহুদযুদ্ধে শহীদ হন তাঁর চেহেরা থেকে চাদর সরিয়ে আমি কান্না করছি, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ আমাকে কান্না করতে নিষেধ করছেন। তবে তিনি নিষেধ করছেন না, আমার ফুফুও কান্না করছেন, তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) আমার ফুফুকে সম্বোধন করে বললেন: তুমি কান্না করো অথবা না করো তোমরা তাঁকে উঠিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তাঁদের পাখা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতে থাকবে[৩]। তিনি আরো বলেন: হে জাবির! আমি তোমাকে বিপর্যস্ত দেখছি কেন? তিনি বলেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমার বাবা শহীদ হয়েছেন, রেখে গেছেন বড় একটি পরিবার ও লোন। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমি কী তোমাকে সুসংবাদ দিব না যখন তোমার বাবার সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাত হবে, সেই সম্পর্কে? তিনি বললেন: অবশ্যই হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! তখন তিনি বললেন: মহান আল্লাহ কারো সাথে পর্দার আড়ালে ব্যতীত কথা বলেননি, তোমার বাবার সাথে বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: হে আমার বান্দা তুমি আমার কাছে কামনা করো আমি তোমাকে প্রদান করবো। তিনি বলেন: হে মহান আল্লাহ আমাকে জীবিত করুন আমি তোমার পথে দ্বিতীয় বার শহীদ হবো। তখন মহান রাব্বুল আলামীন বলরেন: পূর্ব থেকে আমার সিদ্ধান্ত রয়েছে

[১]) সহীহ বুখারী [৪০৯৮]।

[২]) সহীহ বুখারী [১৩৫১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী সাল্লাবী, সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত: ৪৬২।

[৩]) সহীহ বুখারী [১২৪৪]।

যারা মৃত্যুবরণ করে তারা আর ফিরে যাবে না। তখন তিনি বলেন: হে মহান আল্লাহ আমার পরবর্তীদের সেই বার্তা পৌঁছে দিন[১]। অতঃপর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [আর যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের রবের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত][২]। মূলত আবদুল্লাহ বিন আমার (র) উহুদযুদ্ধের পূর্বে মুবাশ্বির বিন আবদুল মুনযির (র) কে স্বপ্ন দেখেন যিনি বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি স্বপ্নে আমাকে বলেন: আপনি কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের মাঝে আগমন করবেন। আমি তাঁকে বললাম: আপনি কোথায়? তিনি উত্তরে বললেন: জান্নাতে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি তাঁকে পুনরায় বললাম: আপনি না বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তারপর আমাকে জীবিত করা হয়। স্বপ্নের বিষয়টি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন: হে জাবির'র পিতা! এটি শাহাদাহ[৩]। আল্লাহ'র মেহেরবানীতে উহুদযুদ্ধে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো।

৫) বিশিষ্ট সাহাবী খায়সামা আবু সায়ীদ (র)'র ছেলে বদরযুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। তিনি বলেন: বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মূলত আমি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিলাম এবং আমার ছেলেও অংশগ্রহণে আগ্রহী। অতঃপর আমরা লটারি করলাম, তাতে তার অংশগ্রহণ নির্ধারিত হয়। অতঃপর সে শাহাদত লাভ করলো। আমি গত রাত্রে আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখি অতি সুন্দর আকৃতিতে জান্নাতের ঝর্ণা ও ফলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাকে সে বললো: আমাদের সাথে এসে যান জান্নাতে আমাদের সঙ্গী হতে পারবেন। আমার বয়স বেড়েছে, হাঁড় দুর্বল হয়ে গেছে, আমি আল্লাহ'র সাক্ষাতে আগ্রহী, হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে শাহাদত দান করেন এবং জান্নাতের সৌভাগ্যের সাক্ষাত পাই। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তার জন্য দোয়া করেন এবং তিনি উহুদযুদ্ধে শহীদ হন[৪]। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণের মধ্যে শাহাদাত লাভের তীব্র আকুতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

৬) বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইবনুল জামুহ (র) প্রচন্ড খোঁড়া (শারীরিক প্রতিবন্ধী) ছিলেন। তাঁর চার পুত্র সিংহের মতো আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা হলেন: খাল্লাদ, মুআওয়ায, মুআয ও আবু আয়মান (র)। উহুদযুদ্ধের দিন তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে এই বলে আটকে দেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে খোঁড়ার কারণে ছাড় দিয়েছেন। সুতরাং আপনার যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমার সন্তানেরা আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে বাঁধা দিচ্ছে। আল্লাহ'র শপথ! আমি আমার এই লেংড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটা-চলা করতে আগ্রহী। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল

[১]) সহীহ ইবন মাজাহ, সম্পাদনা শায়খ আলবানী [১৫৮-১৫৯]।

[২]) সূরাহ আলে ইমরান: ১৬৯।

[৩]) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২০৯। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী সাল্লাবী, সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত: ৪৬২।

[৪]) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২০৮।

(স) তাঁকে বললেন: মহান আল্লাহ তোমাকে খোঁড়ার কারণে ছাড় দিয়েছেন, সুতরাং তোমার ওপর জিহাদে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি তাঁর সন্তানদের বলেছেন: তোমাদের তাঁকে বাঁধা দেওয়ার অধিকার নেই। আল্লাহ'র ইচ্ছে থাকলে তিনি শাহাদত লাভ করতে পারেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ'র নিকট দোয়া করেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাশ করে আমার পরিবারে ফিরিয়ে দিও না। অতঃপর তিনি যুদ্ধে শহীদ হন।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বলেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স) আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন আমি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করবো এবং শহীদ হবো অতঃপর আমার সঠিক পা (তাঁর প্রতিবন্ধী ছিল) নিয়ে জান্নাতে হাঁটাহাঁটি করবো। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর উহুদযুদ্ধে কুরাইশ তাঁকে, তাঁর এক ভাতিজা ও মুক্তদাসকে হত্যা করলো। যুদ্ধশেষে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের তিন জনকে একই কবরে দাফন করার নির্দেশ প্রদান করেন[১]।

৭) বিশিষ্ট সাহাবী আল-উসাইরাম'র (প্রকৃত নাম আমর বিন সাবিত বিন ওশাইশ আউসী) নিকট ইসলাম উপস্থাপন করা হলে সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতঃপর উহুদযুদ্ধের দিন আল্লাহ'র রাসুল (স) উহুদে অবস্থানকালে সে এসে বিশিষ্ট সাহাবী সাআদ বিন মুআয (র) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো: উহুদযুদ্ধে অবস্থান করছেন। অতঃপর সে তার ভাতিজাদের সম্পর্কে জানতে চায়। অতঃপর তাকে বলা হলো যে, তাঁরা উহুদযুদ্ধে অবস্থান করছেন। অতঃপর সে তার গোত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হলো: সকলেই উহুদযুদ্ধে অবস্থান করছেন। অতঃপর সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে তরবারী ও বর্শা নিল এবং বর্ম পরিধান করে অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলিমগণ তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে দেখে বললো: হে আমর তুমি আমাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছ? সে বললো: আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতঃপর তিনি যুদ্ধে মারত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমতাবস্থায় বনী আবদুল আশহাল গোত্রের কিছু লোক যুদ্ধে তাদের লাশের সন্ধানে বের হলে তাকে আহতাবস্থায় দেখে তাঁরা বলেন: আল্লাহ'র শপথ! এ উসাইরাম, সে এখানে কীভাবে আসলো আমরা তো তাকে রেখে এসেছি এবং সে ইসলাম বিরোধী ছিল। অতঃপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কী হলো? গোত্রীয় প্রীতির কারণে নাকি ইসলামের আগ্রহে? অতঃপর তিনি বললেন: ইসলামের আগ্রহে। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং ইসলাম গ্রহণ করে তরবারী নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সঙ্গী হয়েছি। তারপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আমার সম্পদের মালিক হবেন মুহাম্মদ (স), তিনি ইচ্ছেমতো ব্যয় করবেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তাঁর বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন: সে জান্নাতবাসী। অন্য বর্ণনায় বলা হলো: মৃত্যুবরণ করলো অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করলো অথচ এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করলো না। আল্লাহ'র রাসুল (স) তার সম্পর্কে বলেছিলেন। কাজ করেছে কম প্রতিদান পেয়েছে প্রচুর[২]।

---

[১]) মুসনাদ আহমদ [২২৫৫৩]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:৩/১০১।

[২]) সহীহ বুখারী [২৮০৮]।

৮) মুখাইরীক মদীনায় বসবাসকারী একজন ইহুদী। উহুদযুদ্ধের সময় যখন আল্লাহ'র রাসুল (স) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তখন সে তার স্বজাতি ইহুদীদের সমবেত করে বললো: হে ইহুদ সম্প্রদায়! তোমরা অবশ্যই অবগত যে, মুহাম্মদ (স) কে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তখন তারা বললো: আজ শনিবার; শনিবারে যুদ্ধে যাওয়া নিষিদ্ধ। তখন সে বললো: তোমাদের কোনো শনিবার নেই। অর্থাৎ এটি তোমাদের খোঁড়া অজুহাত মাত্র। অতঃপর সে তরবারী গ্রহণ করলো এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে বললো: আমি যদি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার সম্পদ মুহাম্মদ (স)'র মালিকানায় থাকবে; তিনি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে নিহত হয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তার সম্পর্কে বললেন: মুখাইরীক উত্তম ইহুদী[১]।

তবে মুখাইরীকের ইসলাম গ্রহণ নিয়ে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইতিহাসবিদ যাহাবী ও ইবন হাজর আসকালানী ওয়াকিদীর বরাতে উল্লেখ করেন যে, মুখাইরীক মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন[২]।

৯) কুযমান নামক এক সাহসী লোক উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণে পিছিয়ে ছিল। অতঃপর বনী যফর গোত্রের নারীরা তাকে লজ্জা দিলে সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আসে প্রথম সারিতে যোগ দেয় যখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে সারিবিন্যাস করছিলেন। অতঃপর সে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে প্রথম তীর নিক্ষেপ করে এবং তরবারী ও বর্শা নিয়ে শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে গিয়ে সাত বা নয় জনকে হত্যা করার পর শত্রুপক্ষের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলে বিশিষ্ট সাহাবী কাতাদাহ বিন নোমান (র) তাকে শাহাদতের সুসংবাদ দেন। পরবর্তীতে মুসলিমগণ তাকে বলেন হে কুযমান! তুমি আজ ইসলামের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছ অতঃপর তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। তখন সে বললো: কীসের সুসংবাদ? আমি ইসলামের জন্য লড়িনি, আমার গোত্রের জন্য লড়িছি। অতঃপর তার বিষয়টি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন: সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। মহান রাব্বুল আলামীন কখনো এই দ্বীনকে পাপিষ্ঠ দ্বারাও সহয়তা করেন[৩]। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র পথে যুদ্ধে নিহত হলেই শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় না। তার জন্য শাহাদতের ইচ্ছে থাকা বাঞ্ছনীয় ও আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়্যত থাকা অপরিহার্য। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের অন্তরে শাহাদতের কামনা সৃষ্টি করুন! আমীন।

---

[১]) ওয়াকিদী, মাগাযী, প্রাগুক্ত:১/২৬৩ এবং সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:৩/৯৯।

[২]) যাহাবী, তাজরীদু আসমায়িস সাহাবাহ, প্রাগুক্ত:৩/৭০ এবং আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ, দারুন নাহযাহ, মিশর, তারিখ ব্যতীত:৩/২৯৩।

[৩]) সুনান দারমী [২৫৫৯]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:৩/৯৯।

বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান

বনু নাযীর অভিযানের প্রেক্ষাপট

হিজরী চতুর্থ বর্ষের (৬২৫ খৃষ্টাব্দে) রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। আর-রাহীকুল মাখতুম ও তাবকাতে ইব্ন সাআদের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) নিয়মিত প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় আগমন করতেন[১]। তেমনি এক শনিবারে বের হয়ে মসজিদে কুবায় যুহরের নামায আদায় করেন। মুহাজির ও আনসাদের একটি দল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি বনু নাযীরের (মদীনার পার্শবর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত ইহুদী গোত্র) এলাকায় উপস্থিত হন এবং আমর বিন উমাইয়্যাহ ভুল করে কিলাব গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল (যাদের সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সন্ধি ছিল) তাদের রক্তপণ নিয়ে বনু নাযীরের সাথে আলোচনা করলে তারা বললো যে, আপনি যেভাবে পছন্দ করেন সেভাবেই হবে।

কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ'র রাসুল (স) একটি দেয়ালের পাশে দাড়ানো ছিলেন এবং ইহুদীদের একজন ঘরের ছাদে উঠে বড় পাথর চাপা দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার পরিকল্পনা করলো যা সরাসরি সন্ধি ভঙ্গের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর রাসুল (স) অহীর মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মদীনার দিকে রওনা দেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সঙ্গী সাহাবীগণ পরে তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে বললেন যে, আপনি এত দ্রুত উঠে আসলেন আমরা বুঝতেই পারিনি। তখন তিনি বললেনঃ ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা আমাকে অবগত করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি[২]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনার কারণে আগামী দশ দিনের মধ্যে তোমাদেরকে এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। দশ দিনের পর যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অতঃপর তারা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে চলে যেতে নিষেধ করে। তাদেরকে দুর্গে অবস্থান করতে বলে অভয় দিয়ে বললো যে, আমার সাথে নিজ গোত্রের দুই হাজার লোক আছে; যারা তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে। ইহুদীরা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের আশ্বাস পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিয়ে তীর ও পাথর নিয়ে দুর্গে অবস্থান করে নিল। অথচ শেষ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই তার অঙ্গীকার পূর্ণ না করে ইহুদীদের বিপদগ্রস্থ করলো।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন এবং খেজুর বাগান কেটে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন[৩]। অতঃপর ইহুদীরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নাম ধরে চিৎকার করে বললোঃ হে মুহাম্মদ (স)! আপনি তো বিশৃঙ্খলা করতে নিষেধ করতেন

---

[১]) সফিউর রাহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪০১। তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্তঃ৩/৯৯।

[২]) আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪০১ ও তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্তঃ৩/৯৯। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুনঃ সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত,পৃঃ১৯০।

[৩]) সহীহ বুখারী [২৩২৬ ও ৪০৩১]।

এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের দুর্নাম করতেন। অথচ এখন নিজেই খেজুর বাগান কেটে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো:{ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}[তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক অকর্তিত অবস্থায় সেগুলোর মূল ও কান্ডের ওপর ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ'রই আদেশে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করেন][১]। উপরিউক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) অহীর মাধ্যমে নিদের্শপ্রাপ্ত হয়েই খেজুর বাগান কেটে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

বনু নাযীরের নির্বাসন

পরিশেষে ইহুদীরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট প্রস্তাব করলো যে, তারা মদীনা অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। তখন তিনি বললেন যে, আজ তোমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র তোমাদের জান নিয়ে চলে যাবে এবং অস্ত্র ব্যতীত উটের পিঠে যতটুকু বোঝা বহন করা যায় সেই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে উটের পিঠে যা ধরে সেই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে তারা মদীনা ছেড়ে খায়বার ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন: ইয়ামীন বিন উমাইর বিন কাআব ও আবু সাআদ বিন ওহাব[২] এবং মুসলিম দুজনের সম্পদ নিরাপদে রইল।

বনু নাযীর থেকে অর্জিত সম্পদ আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রাথামিক পর্যায়ের মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারদের মধ্যে শুধুমাত্র দুজনকে (যাঁদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তাঁরা হলেন: সাহ্ল বিন হুনাইফ ও আবু দুজানাহ সম্মাক বিন খারসাহ) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য বনু নাযীরের পূর্ণসম্পদ যেহেতু "মালে ফাই" (বিনা যুদ্ধ হস্তগত হওয়া শত্রুসম্পদ) হিসেবে অর্জিত হয়েছে, তাই তার ওপর আল্লহ'র রাসুল (স)'র একচ্ছত্র মালিকানা থাকলেও যা তিনি নিজে ভোগ না করে অসহায় মুহাজির ও দরিদ্র আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। বনু নাযীরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরাহ আল-হাশর পূর্ণ অবতীর্ণ হয় এবং বনু নাযীরের সম্পদ বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে সূরাহ আল-হাশরের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়:{ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاأَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে (যুদ্ধবিহীন অভিযান থেকে) যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি; কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতামান। আল্লাহ

---

১) সূরাহ আল-হাশর:৫।

২) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, সীরাতে ইব্ন হিশাম, তারীখে তাবারী ও তাফসীরে ইব্ন কাসীরের সূরাহ আল-হাশর। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত: ৪/৪৫৬-৪৫৭ ও সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী'র, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:পৃ:১৯০-১৯১।

জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে (যুদ্ধবিহীন) যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ'র রাসুলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে; যাতে ধন-ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয়। রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে তাকওয়া করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা][১]।

বনু নাযীরের ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষা

বনু নাযীরের ঘটনা বনু কায়নুকা'র বিশ্বাসঘাতকতার পর ইহুদীদের দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যা অসংখ্য ঘটনা থেকে প্রমাণিত যে, ইহুদীরা বিভিন্ন নবী-রাসুলদের সঙ্গে অসদাচারণের ফলে তাঁদের অভিশাপের কারণে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়; যার বর্ণনা কুরআন করীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবেই চিত্রায়ন করেছেন:{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}[বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিশপ্ত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমা লংঘন করতো][২]। বনু নাযীরের নির্বাসনের ঘটনার সাথে বেশ কিছু উপদেশ ও শিক্ষা এবং ইসলামের বিধান সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বনু নাযীরের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মু'জিযাহ বা অলৌকিক শক্তির অন্তর্ভূক্ত। সমগ্র সাহাবীগণ পদে পদে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) নিঃসন্দেহে মানবসন্তান তবে তাঁর সাথে সর্বদা আসমানী শক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান; যার কারণে তাঁর নুবুওয়্যত ও রিসালতের প্রতি তাঁর সাহাবীগণের ঈমান ও বিশ্বাস দৈনন্দিন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দৃঢ়তা লাভ করেছে। সীরাতবিদগণ বিভিন্নভাবে উপরিউক্ত অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন; যা মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করার চিত্রায়নই বলা যায়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন][৩]। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহান রাব্বুল আলামীন সর্বদা তাঁর রাসুলকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র থেকে শুধু রক্ষাই করেননি, পাশাপাশি ষড়যন্ত্রের মুখোশও উন্মোচন করে দিয়েছেন; যাতে তার প্রতিকার করা যায়।

২) বনু নাযীরের খেজুরবৃক্ষ কর্তন ও আগুনে জ্বালিয়ে ধ্বংস করার বিষয়টি সকল বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে প্রমাণিত। তবে সব বৃক্ষ নয় কিছু বৃক্ষ অক্ষতও ছিল যা উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ কুরআন করীমের আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয়, যেমন:{ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}[তোমরা যে কিছু কিছু

১) সূরাহ আল-হাশর:৬-৭।
২) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৭৮।
৩) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৬৭।

খেজুরবৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক অকর্তিত অবস্থায় সেগুলোর মূল ও কান্ডের ওপর ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ'রই আদেশে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করেন][১]।

উপরিউক্ত বৃক্ষ কর্তনের ঘটনা ইসলামের মৌলিক যুদ্ধনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তারপরেও আল্লাহ'র রাসুল (স) তা করলেন। এই বিষয়ে মহাগ্রন্থ কুরআন করীমের বর্ণনা হলো তা আল্লাহ'র নির্দেশেই করা হয়েছে।

মূলত বনু নাযীর তাদের নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন তাদেরকে দূর্গে অবরুদ্ধ করেন তখন তারা খেজুর বাগানের আড়ালে মুসলিম বাহিনীর প্রতি তীর ও পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে। এর জবাবে মুসলিমগণ তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারছে না; বরং আক্রান্ত হচ্ছিলেন বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিম বাহিনীর স্বার্থ রক্ষা ও রণকৌশলের আওতায় খেজুরবৃক্ষ কর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন; কারণ বৃক্ষনিধন না করা হলে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছিল না এবং আক্রমণ প্রতিহত করা যাচ্ছিল না। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে ইসলামী গবেষকগণ মনে করেন যে, সমর নেতার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুর বৃক্ষনিধনের সাথে ইসলাম বা মুসলিম বাহিনীর ক্ষতি নিবারণ ও লাভপ্রাপ্তি জড়িত তাহলে বৃক্ষনিধনের অনুমোদন কুরআন করীমের নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বনু তামীম ও তুলাইহা'র অভিযানে খালিদ বিন অলীদ (র)'র প্রতি খলীফা আবু বকর (র)'র বৃক্ষনিধনের নির্দেশকে ইমাম শাফেয়ী (রা) একই কারণের অন্তর্ভূক্ত করেন। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন: খলীফা আবু বকর (র) মুসলিম বাহিনীর স্বার্থ রর্ক্ষার্থে খালিদ বিন অলীদ (র) কে বৃক্ষনিধনের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন অথচ তিনি সিরিয়ার অভিযানে ফলজবৃক্ষ নিধনে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তিনি আল্লাহর রাসুল (স)'র কাছে শুনেছিলেন যে, মুসলিমগণ সিরিয়া জয় করবেন; সুতরাং মুসলিমদের স্বার্থ রর্ক্ষার্থে বৃক্ষনিধনের বৈধতা সত্ত্বেও সিরিয়ার অভিযানে তা নিষেধ করেছিলেন[২]। তাছাড়া এটি ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ উলামা ও ইসলামী গবেষকদের অভিমতও বটে[৩]।

৩) বিনা যুদ্ধ অর্জিত শত্রুসম্পদকে ইসলামের পরিভাষায় "মালু ফাই" বলা হয় এবং ফাই সম্পর্কে সকল ইমামগণ ও ইসলামী গবেষকদের অভিমত যে, ফাই সম্পূর্ণ সমর নেতার অধিকারের অন্তর্ভূক্ত এবং তা ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করতে পারবেন। তবে গনীমতের সম্পদের (যুদ্ধে অর্জিত শত্রুসম্পদ) বিধান ভিন্ন এবং গনীমতের সম্পদে যোদ্ধাদের সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত আছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) বনু নাযীরের সম্পদ গৃহহীন মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন এবং তা সঠিক ছিল বলে কুরআন করীমে বর্ণনা এসেছে।{ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }[আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে (যুদ্ধবিহীন অভিযান থেকে) যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায়

[১]) সূরাহ আল-হাশর:৫।

[২]) ইমাম শাফেয়ী, আল-উম, প্রাগুক্ত:৭/৩২৪।

[৩]) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান বুতী, "ইসলামী বিধানে শরয়ী স্বার্থ রক্ষার নীতিমালা" প্রাগুক্ত:১৭০-১৭১।

কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি, কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতামান][১]।

১) সূরাহ আল-হাশর:৬।

যাতুর রিকাই'র যুদ্ধ

অধিকাংশ সীরাত গবেষকদের মতে এটি বনু নাযীরের বিতাড়নের ঘটনার দেড় মাস পর হিজরী চতুর্থ বর্ষে সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধ "গাযওয়াতু খাচফাহ"ও "গাযওয়াতু নাজদ" নামেও পরিচিত। তবে ইমাম বুখারী ও কিছু মুহাদ্দিস খায়বার যুদ্ধের পরের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন[১]।

যাতুর রিকাই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

মূলত মুসলিমদের সাথে নাজদের বিভিন্ন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকার কারণে তাদের শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে সত্তর জন সাহাবী যারা ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বিরে মাউনায় (সফর, ৪র্থ হিজরী) শহীদ হয়েছিলেন; সেই যুদ্ধবাজ গোত্রসমূহ ও বনু ছাআলাব গোত্রের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার গিফারী (র) কে মদীনার গর্ভনর নিয়োগ করে আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনা ত্যাগ করেন। নাজদের গাতফান অঞ্চলে পৌঁছে আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের সৈন্যবিন্যাস করেন। তবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে মুসলিম বহিনীর ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দিলে তারা মুসলিম বাহিনীর কাছ থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে এই অভিযানে বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়; যেগুলোর মধ্যে মুসলিমদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আশআরী (র)'র বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় তিনি বলেন: আমরা ছয়জন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে এক যুদ্ধে তাঁর উট অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। অতঃপর অনেক দূর পায়ে হাঁটার কারণে আমাদের পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আমরা সবাই পায়ে কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে নিই এমতাবস্থায় আমার পায়ে আঘাত লেগে নখ পড়ে যায়; সুতরাং পায়ে কাপড়ের টুকরো বাঁধার কারণে তা গাযওয়াতু যাতির রিকাই (কাপড়ের টুকরো'র যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ করে[২]।

২) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) গাযওয়াতু যাতির রিকাইতে "সালাতুল খাউফ" বা ভয়ের নামায আদায় করেছেন। মুসলিম বাহিনীর একদল তাঁর সাথে নামাযে শরিক হন অপরদল শত্রুর সম্মুখে অবস্থান নেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সঙ্গের দল নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গের দল তাঁরা নিজেদের নামায পরিপূর্ণ করে শত্রুর সম্মুখে অবস্থান নেন এবং দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি তাঁদের নিয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করেন। তারপর তিনি বসে থাকেন এবং সঙ্গের দল নিজেদের নামায পরিপূর্ণ করেন। তারপর তাঁদের নিয়ে সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করেন[৩]।

---

১) সহীহ বুখারী [৩৯০৬]।

২) সহীহ বুখারী [৪১২৮]। বিস্তারিত দেখুন: মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪২।

৩) সহীহ বুখারী[৪৫৩৫] সুনান আবী দাউদ [১২৪৬] ও বুলুগুল মুরাম [১৩৫]।

৩) বিশিষ্ট সাহাবী জাবির বিন আবদুল্লাহ (র)'র বরাতে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) রওনা দিলে তিনিও তাঁর সঙ্গে রওনা দেন। কাফেলা এক ঘনবৃক্ষরাশী অঞ্চলে পৌঁছালে তাঁদের তন্দ্রা আসে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) থেমে যান এবং সাহাবীগণ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর তরবারী বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে রেখে একটি সামুরাহ নামক (কূলবৃক্ষের মতো) কাঁটাদার বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র) বলেন: আমরা সামান্য ঘুমিয়ে নিলাম। হঠাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাদের ডাকলেন। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন তাঁর কাছে বসা। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এই লোক আমার তরবারী নিয়ে নেয়। আমি ঘুম থেকে জাগলাম দেখি তার হাতে খোলা তরবারী। অতঃপর সে বললো: কে আপনাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? আমি তাকে বললাম: আল্লাহ। (অতঃপর সে কিছুই করতে পারলো না) এই সেই ব্যক্তি বসে আছে। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে কোনো শাস্তি প্রদান করেননি[১]।

৪) বিশিষ্ট সাহাবী জাবির বিন আবদুল্লাহ (র)'র বরাতে ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে গাযওয়াতু যাতির রিকাইতে রওনা দিলাম। এই অভিযানে মুশরিকদের এক মহিলা মারা যায়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন কাফেলা নিয়ে রওনা দেন তখন মহিলার স্বামী উপস্থিত হয়। ঘটনার সময় সে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিল এবং সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাফেলার কাউকে হত্যা না করে সে থামবে না মর্মে শপথ করে। অতঃপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাফেলার পদচিহ্নের খোঁজে বের হয়ে পড়ে। পথে আল্লাহ'র রাসুল (স) এক স্থানে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করেন এবং বলেন কোন পুরুষ আজ রাত আমাদের পাহারা দিবে? মুহাজির থেকে একজন এবং আনসার থেকে একজন দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন আমরা পাহারা দিব। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদেরকে উক্ত অঞ্চলের রাস্তার শেষপ্রান্তে অবস্থান করার নির্দেশ দেন[২]।

তাঁরা কাফেলা থেকে বের হয়ে রাস্তার সম্মুখে এসে অবস্থান নিলেন এবং আনসারী তাঁর মুহাজির বন্ধুকে বললেন: বন্ধু আপনি রাত্রের কোন ভাগে বিশ্রাম নিতে চান প্রথমার্ধে না শেষের দিকে? মুহাজির বন্ধু বললেন: আমি প্রথমার্ধে বিশ্রাম নিতে চাই; মুহাজির শুয়ে পড়লেন অতঃপর ঘুমিয়ে গেলেন এবং আনসারী নামায পড়তে লাগলেন। লোকটি আসলো এবং আনসারী সাহাবীকে দেখে বুঝতে পারলো যে, সে পাহারাদার। অতঃপর সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো যা আনসারীর গায়ে লাগলো। তারপর তিনি তীরটি বের করে নামাযেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর লোকটি কিছুক্ষণ পর আরেকটি তীর ছুড়লো সেটিও আনসারীর গায়ে লাগলো। তারপরও তিনি তীরটি বের করে নামাযেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর লোকটি তৃতীয়বার তীর ছুড়লো সেটিও আনসারীর গায়ে লাগলো। অতঃপর তিনি তীরটি বের করে রুকু ও সিজদা করে যথাযথভাবে নামায পরিপূর্ণ করে মুহাজির বন্ধুকে

---

[১]) সহীহ বুখারী [২৯১০, ৩৯০৬ ও ৪১৩৫] সহীহ মুসলিম [৮৪৩]।

[২]) ইব্‌ন ইসহাক তার সীরাত গ্রন্থে ও ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ঘটনাটি বর্ণনা করেন; তবে ইব্‌ন ইসহাক দুজনের নামও উল্লেখ করেন: তাঁরা হলেন আম্মার বিন ইয়াসীর ও আব্বাদ বিন বিশ্‌র। বিস্তারিত দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:১৯৭-২০১।

জাগিয়ে বললেন: উঠে পড়ুন। আমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি। লোকটি যখন দেখলো যে, তার নিশানা সঠিক হয়েছে তখন সে পালিয়ে গেল।

মুহাজির ঘুম থেকে জেগে আনসাার বন্ধুর শরীরে রক্ত দেখে বললেন: প্রথম যখন আপনাকে সে তীর ছুড়লো তখন কেন আমাকে জাগাননি? আনসারী বন্ধু উত্তরে বললেন: আমি কুরআন করীমের একটি সূরাহ্ পাঠ করছিলাম, আমি তা বন্ধ করতে চাইনি। তবে সে যখন বাববার তীর ছুড়লো তখন আপনাকে না জাগিয়ে পারিনি। আল্লাহ'র শপথ! যদি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ রক্ষার দায়িত্ব না থাকতো তাহলে কুরআন করীমের পাঠ বন্ধ করার পূর্বে আমি শেষ হয়ে যেতাম। অর্থাৎ আমি শেষ হয়ে গেলেও কুরআন করীমের পাঠ বন্ধ করতাম না[১]।

(৫) বিশিষ্ট সাহাবী জাবির বিন আবদুল্লাহ (র)'র বরাতে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন সাআদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি গাযওয়াতু যাতির রিকাইতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে একটি দুর্বল উটে চড়ে রওনা দিলাম, যখন কাফেলা চলতে লাগলো আমি উটের কারণে পেছনে পড়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে পেয়ে গেলেন এবং বললেন: কী হলো জাবির? আমি বললাম: আমার উট আমাকে পিছিয়ে দিল। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন আওয়াজ দাও (যেভাবে পশুকে হাঁকানোর সময় আওয়াজ দেয়া হয়) আমি আওয়াজ দিলাম এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)ও আওয়াজ দিলেন। তারপর তিনি বললেন: লাঠিটি আমাকে দাও, আমি লাঠি তাঁকে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) লাঠি দিয়ে কয়েকবার হাঁকালেন এবং বললেন: ওপরে চড়ে যাও। অতঃপর উট চলতে লাগলো।

আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে কথা বলতে লাগলাম। অতঃপর তিনি বললেন: হে জাবির তোমার এই উট কি আমার কাছে বিক্রি করবে? আমি বললাম: (বিক্রি নয়) আমি আপনাকে এটি উপহার দিব। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: না, তবে বিনিময়ে (নিব)। আমি বললাম: আপনি দাম করুন,তিনি বললেন: আমি এক দিরহাম দিয়ে নিলাম, আমি বললাম: না। তখন আমি ঠকে যাবো হে আল্লাহ'র রাসুল (স)!। তিনি বললেন: দুই দিরহাম। আমি বললাম: না। আল্লাহ'র রাসুল (স) দাম বাড়াতে থাকেন এবং শেষ পর্যায়ে তিনি এক উওকিয়াহ দিতে সম্মত হলেন এবং আমিও রাযী হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন: এটি আমি নিয়ে নিলাম....। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: জাবির বিয়ে করেছ? আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহ'র রাসুল (স)!। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন: বিবাহিতা না কুমারী? আমি বললাম: না, বরং বিবাহিতা, তিনি বললেন: কেন কুমারী মেয়ে পাওনি যাতে তুমি তার সাথে খেলতে সেও তোমার সাথে খেলতো? আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমার বাবা উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তিনি সাতটি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অতঃপর আমি একটি বয়স্কা নারী বিয়ে করলাম যাতে সে তাদের সবাইকে আগলিয়ে রাখতে পারে এবং তত্ত্বাবধান করতে পারে। তিনি বললেন: আল্লাহ'র ইচ্ছায় তুমি সঠিক করেছ,.... তারপর আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম।

---

[১]) সুনান আবী দাউদ [১৯৮] ও ইমাম আহমদ [১৪৯০৮] তাবারী ও ইব্‌ন ইসহাক ঘটনাটি নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:১৯৭-২০১।

সাহাবী জাবির (র) বললেন: সকালে আমি উট নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দরজায় বেঁধে রাখলাম এবং মসজিদের পাশে বসলাম। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বের হলেন এবং উট দেখে বললেন: এটা কী? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন: এই উট জাবির (র) নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন: জাবির কোথায়? অতঃপর আমাকে ডাকা হলো এবং তিনি বললেন: ভাতিজা উটের রশি ধরো, এটি তোমার। বিশিষ্ট সাহাবী বেলালকে ডেকে বললেন: জাবিরকে নিয়ে যাও এবং তাকে এক উওকিয়াহ দাও। আমি তার সাথে গেলাম অতঃপর আমাকে এক উওকিয়াহ'র সামান্য বেশি দিলেন। আল্লাহ'র শপথ! আমার কাছে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দানকৃত এক উওকিয়াহ বাড়তে থাকলো এবং তার অবস্থান আমাদের বর্তমান বাড়ী থেকে বুঝা যায়[১]।

যাতুর রিকাই যুদ্ধের শিক্ষা

গাযওয়াতু যাতির রিকাইয়ের অভিযানে সংঘটিত ছোট ছোট ঘটনাপ্রবহে মুসলিমদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রাণবন্ত আদর্শ যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে বিধায় উপরিউক্ত ঘটনাসমূহের শিক্ষা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আল-আশআরী'র বরাতে বর্ণিত হাদীস থেকে এই যুদ্ধের নামকরণের কারণ সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ছয়জন সাহাবী একটি মাত্র উট নিয়ে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ আল্লাহ'র পথে জিহাদ ও আল্লাহ'র বার্তা পৌঁছে দিতে কী পরিমাণ কষ্ট ভোগ করেছেন তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র উক্ত হাদীসে ফুটে উঠেছে। চিত্রটি আরো স্পষ্ট করেছে যে, তাঁরা দারিদ্রে নিষ্পেষিত হওয়ায় প্রতিজনের বাহন বা উট ছিল না, ছয়-সাত জন লোক একটি মাত্র উট নিয়ে এক জনের পর আরেক জন করে অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে দরিদ্রতা অন্তরায় হয়নি এবং আল্লাহ'র পথে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা অনেক কষ্টসাধন করেছেন, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন....। পাথুরে রাস্তায় পায়ে হেঁটে দূরের পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কংকর ও পাথরের সাথে বারবার আঘাত খেয়ে তাঁদের পা কেটে গেছে, কারো নখ উঠে গেছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা দুর্বল হননি, দমে যাননি এবং আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে এ সবই তুচ্ছ বলে প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা যেন আল্লাহ'র সেই বাণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন:{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্য যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ'র রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ'র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই লেন-দেনের ওপর, যা তোমরা করেছ তার সাথে। আর এ হলো মহা সাফল্য][২]।

---

[১]) সহীহ বুখারী [২০৯৭ ও ৫০৭৯] সহীহ মুসলিম [৭১৫] ও মুসনাদ আহমদ [১৫০২৬]।

[২]) সূরাহ আত-তাওবাহ:১১১।

২) এই যুদ্ধে "সালাতুল খাউফ" বা ভয়ের নামাযের অনুমোদন এসেছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এভাবেই নামায আদায় করেছেন, যে একদল তাঁর সাথে নামাযে শরিক হন অপরদল শত্রুর সম্মুখে অবস্থান নেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সঙ্গের দল নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গের দল তাঁরা নিজেদের নামায পরিপূর্ণ করে শত্রুর সম্মুখে অবস্থান নেন এবং দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি তাঁদের নিয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করেন। তারপর তিনি বসে থাকেন এবং সঙ্গের দল নিজেদের নামায পরিপূর্ণ করেন, তারপর তাঁদের নিয়ে সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করেন[১]।

তবে দুটি কারণে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে নামায আদায় করা হয়েছেঃ প্রথমত; সবাই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইমামতিতে একই সাথে নামায আদায়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত হতে আগ্রহী। দ্বিতীয়ত; জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্বারোপ করা বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইন্তেকালের পর উক্ত পদ্ধতিতে নামায আদায় না করার ব্যাপারে হানাফী আলিমগণ গুরুত্বারোপ করেন এবং তাঁরা দ্বিতীয় কারণের চেয়ে প্রথম কারণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইন্তেকালের পর এর কোনো সুযোগ নেই তাই উক্ত পদ্ধতিতে নামায আদায় না করাই উত্তম বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ঘুমানো অবস্থায় মুশরিক বেদুঈন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তরবারী নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আঘাত করতে প্রচেষ্টা করেও সক্ষম না হওয়ার মূল কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মুজিযা বা অলৌকিক শক্তি। পাশাপাশি তাঁর নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীনের দেওয়া অঙ্গীকারের প্রতিফলন; যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হয়েছেঃ{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন][২]।

৪) যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সাহাবী জাবির (র)'র কথোপকথনের চিত্রায়ন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে তাঁর সাহাবীদের আন্তরিক ও মধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশাপাশি যুদ্ধে শহীদ হওয়া পিতার রেখে যাওয়া কন্যা সন্তানদের প্রতি তাঁর সাহাবীদের দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার লক্ষ্যে নিজের চাহিদা বিসর্জন দেওয়ার সুন্দর আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শহীদ পরিবারের আর্থিক দুরাবস্থা জেনে ভিন্নভাবে শহীদ পরিবারকে সহযোগিতা করার যে দৃষ্টান্ত আল্লাহ'র রাসুল (স) চিত্রায়ন করেছেন তা একটি বিরল আদর্শ হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।

৫) পাহারা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই (মুহাজির-আনসার) সাহাবী অবশ্যই স্মরণযোগ্য যে, তাঁরা কীভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে বিচক্ষণতা, অসম সাহসিকতা, একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও গভীর রাতে দায়িত্ব পালনের সময়ও নামায আদায় ও নিজের জীবনের আশঙ্কা সত্ত্বেও কুরআন করীমের তেলাওয়াতের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য ত্যাগ না করার যে দৃশ্য চিত্রায়ন করেছেন তা অবশ্যই প্রতিটি মুসলিমর জীবনে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া উচিত।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪৫৩৫], সুনান আবী দাউদ [১২৪৬] ও বুলুগুল মুরাম [১৩৫]।

[২]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৬৭।

বনু আল-মুসতালাক'র বিরুদ্ধে অভিযান

বনু আল-মুসতালাক বা আল-মুরাইসী'র যুদ্ধ প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইব্ন ইসহাক ও কিছু কিছু সীরাত গবেষকদের মতে ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন[১]। তবে সঠিক হলো পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয় যা অধিকাংশ সীরাত গবেষকদেরও মত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো বিশিষ্ট সাহাবী সাআদ বিন মুআয (র)'র এই যুদ্ধে সম্পৃক্ততা রয়েছে। অথচ তিনি খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বনু কুরাইযাহ'র যুদ্ধের পর মারা যান; সুতরাং বনী কুরাইযাহ'র যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয় যাতে কারো দ্বিমত নেই। আর যদি ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয় তাহলে সাআদ বিন মুআয (র) মৃত্যুর পর কীভাবে এক বছর জীবিত রইলেন? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে বিধায় সঠিক তথ্য হলো এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হয়েছিল[২]।

বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

সীরাত গবেষকগণ বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেছেনে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হারিস বিন আবী দ্বিরারের নেতৃত্বে বনু আল-মুসতালাক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বনু আল-মুসতালাকের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করলেন এবং মুরাইসী নামক জলাশয়ের কাছে (এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বিধায় "গাযওয়াতুল মুরাইসী" নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী আল-মুসতালাকের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ী করেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) গনীমতের এক পঞ্চাংশ নিজের জন্য রেখে বাকী চার অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে তাঁর যুদ্ধনীতি অনুযায়ী "অশ্বারোহীর জন্য দুই ভাগ ও পাদাতিক'র এক ভাগ" সঠিকভাবে বন্টন করে দেন[৩]। এই যুদ্ধে সাহাবীগণ তাঁদের মধ্যে দাসী বন্টন করার সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আযল (কৃত্রিম পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণকরণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তার উত্তরে বলেন: [এটা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণীর পৃথিবীতে আগমন নির্দিষ্ট করা আছে তা অবশ্যই আসবে][৪]।

মুসলিম বাহিনীর বিজয়রথে শরিক হয়ে গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে দুর্ভাগ্যবশত এই যুদ্ধে প্রচুর মুনাফিক অংশ গ্রহণ করেছিল যদিও তারা পূর্বের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণে পিছিয়ে ছিল। অতঃপর তারা সর্বদা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে তৎপর ছিল। ইব্ন সাআদ ও ইব্ন হিশাম উভয়েই নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, মুরাইসীর জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে উমর (র)'র দাস জাহজাহ বিন সাঈদ আল-গিফারী সিনান বিন ওয়াবার আল-জুহানী নামক এক আনসারীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়লে সিনান আল-জুহানী আনসারদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে বলেন এবং জাহজাহ আল-গিফারী মুহাজিরদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে বলেন।

---

১) সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/২৮৬।

২) যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১১২। বিস্তারিত দখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/৩০৪ ও উয়ুনুল আছার, প্রাগুক্ত:২/৯৩।

৩) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত: ২/১০৬ ও সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/২৯০।

৪) সহীহ বুখারী [৫২১০] ও মুসলিম [১৪৩৮]।

অতঃপর এই সংবাদ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কানে যায় এবং সে রাগান্বিত হয়ে বলেঃ তারা এই রকম করলো? আমাদের ঘরে আমাদেরকে হুমকি, আল্লাহর শপথ! আমরা কুরাইশদের (মুসলিমদের) আশ্রয় দিয়ে পুষেছি। আমরা মদীনায় পৌঁছলে নিশ্চই শক্তিশালীরা দুর্বলদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিবে[১]।

বিশিষ্ট সাহাবী যায়দ বিন আরকাম (র) এই কথা শুনে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে জানালেন তখন সেখানে উমর (র)ও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর উমর (র) সাথে সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললেনঃ আপনি তাকে হত্যা করতে আব্বাদ বিন বিশর্কে নির্দেশ দিন। আল্লাহ'র রাসুল (স) উত্তরে বললেনঃ তা কীভাবে সম্ভব? তখন লোকজন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর সাহাবীদের হত্যা করা শুরু করছেন[২]। তখনই আল্লাহ'র রাসুল (স) রওনা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যদিও তখন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র রওনা দেওয়ার সময় ছিল না; কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) সাধারণত দূরের সফরে রাতে যাত্রা শুরু করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) দিনের বেলা রওনা দিয়ে পুরো দিন চললেন এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো, রাতেও যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং পরের দিন সকাল হলো অতঃপর যাত্রা বিরতি করে বিশ্রাম নিলেন এবং লোকজন এতই ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে, বিশ্রামের সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো[৩]।

পূর্বের দিনের আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অবাঞ্ছিত ঘটনা নিয়ে যেন অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে এবং সাধারণ লোকজনকে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ না দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল (স) দিনের বেলায় যাত্রা শুরু করেছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী যায়দ বিন আরকাম আবদুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা সত্যায়িত করে কুরআন করীমের "সূরাহ আল-মুনাফিকুন" অবতীর্ণ হয়, যেমন এরশাদ হচ্ছে{يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}[তারা বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দূর্বলকে বহিস্কৃত করবে। (বস্তুত) শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না][৪]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসার পর আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ (সত্যিকারের মুসলিম) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বললেনঃ আমি শুনেছি আমার পিতা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে আপনি তাকে হত্যা করতে চান। তবে আপনি যদি তা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে নিদের্শ প্রদান করুন আমি তার মাথা আপনার কাছে নিয়ে আসবো। আল্লাহ'র শপথ! খাযরাজ গোত্রের প্রতিটি লোক ভালো করেই জানে যে, তাঁদের গোত্রে এমন কোনো লোক নেই যিনি তাঁর পিতার প্রতি আমার চেয়ে বেশী সহানুভতিশীল। আমার আশঙ্কা আপনি আমাকে ছাড়া

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪৯০৫]। বিস্তারিত দেখুনঃ তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৪২ ও সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্তঃ ২/২৯৯।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৫১৮] ও মুসলিম [২৫৮৪]।

[৩]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন তাফসীরে ইব্ন কসীর, প্রাগুক্তঃ ৪/৩৭০, তারীখে ইব্ন জারীর, প্রাগুক্তঃ ২/৬০৫ ও আল-ফাতহুর রব্বানী, প্রাগুক্তঃ ১৮/৩০৬।

[৪]) সূরাহ আল-মুনাফিকুনঃ ৮।

অন্য কাউকে তার হত্যার নির্দেশ দিলে তার ছেলে হিসেবে আমার জন্য এটি কঠিন হয়ে যাবে যে, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের হত্যাকারী পৃথিবীতে চলাচল করবে এবং আমি তাকে দেখতে থাকবো। অতঃপর আমি সেই হত্যাকারীকে হত্যা করবো এবং তা একজন মুসলিমকে একজন কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে এবং আমি জাহান্নামে যাবো। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমরা তার প্রতি সহানুভতিশীল হই এবং যতদিন আমাদের সাথে আছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করি[১]।

এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ বিন উবাই কোনো কথা বললে তার গোত্রের লোকেরাও তাকে আর মূল্যায়ন করতো না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) উমর (র) কে বললেন: হে উমর! তোমার কথা মতো যদি আমি সেই দিন তাকে হত্যা করতে চাইতাম হত্যা করতে পারতাম; তবে তখন তার প্রতি মানুষের সহানুভূতি সৃষ্টি হতো। অথচ আজ যদি আমি তাকে হত্যা করতে চাই তার সগোত্রীয় লোকেরাই তাকে হত্যা করবে। অতঃপর উমর বললেন: আমি সর্বদা আমার বিষয়ের ওপরে আপনার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকি বিধায় আপনার সাথে তার ঔদ্বত্যপূর্ণ আচারণ আমি সহ্য করতে পারিনি[২]।

[১]) বিস্তারিত দেখুন: তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৪৫ ও সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/৩০৪।
[২]) বিস্তারিত দেখুন: তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৪৬ ও সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/৩০৫।

ইফ্‌কের ঘটনা

বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধ থেকে আসার পথে মা আয়েশাকে জড়িয়ে যে মিথ্যা ঘটনা মুনাফিকরা রটিয়েছিল দুর্ভাগ্যবসত তাতে কিছু সহজ-সরল মুসলিমও সম্পৃক্ত হয়ে যায়; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের সবচেয়ে অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনার আলোকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মা আয়েশা নিজেই বর্ণনা করেন যে, তিনি এই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সফরসঙ্গী ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন: যুদ্ধের সমাপ্তির পর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষ থেকে দিনেই ফিরে যাওয়ার ঘোষণা করা হয় এবং রাত্রি বেলার শেষাংশে যাত্রা বিরতি করেন তখন আমি প্রকৃতির ডাকে বেরিয়ে পড়ি। অতঃপর ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি আমার হারটি হারিয়ে গেছে; তার খোঁজে আবার সেখানে ফিরে যাই এবং হার সন্ধানে আমার বিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা এসে আমি হাওদায় (দোলনায়) আছি মনে করে আমার হাওদাহ উটের পিঠে উঠিয়ে (ঘটনাটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর ঘটেছে বিধায় তারা আমাকে না দেখে) রওনা দেন। অতঃপর আমি হারটি পেয়ে যাই, এসে দেখি সৈন্যদল চলে গেছে। আমি সৈন্যদের স্থানে এসে কাউকে না পেয়ে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে অবস্থান করি এই চিন্তা করে যে, তাঁরা যখন আমাকে খুঁজে পাবে না তখন আমার সন্ধানে এই স্থানেই ফিরে আসবে। সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সৈন্যদের পিছনে ছিলেন। তিনি ভোর বেলায় আমার স্থানে আসলেন এবং একজন মানুষের ছায়ার মতো কাউকে দেখে এগিয়ে আসলেন। আমাকে তিনি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন বিধায় আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। নিদ্রায় আমার চোখ বুজে আসছিল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়লে আমি জেগে যাই। অতঃপর ওড়না দিয়ে আমি মুখ ঢেকে নিই। আল্লাহ'র শপথ! আমরা একটি শব্দ পরিমাণ কথা বলিনি এবং আমি "ইন্না লিল্লাহ" ছাড়া তাঁর কোনো শব্দ শুনিনি। তিনি তাঁর উট বসিয়ে দিলেন এবং আমি সেদিকে গিয়ে উটে আরোহন করি। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে উট চালাতে লাগলেন এবং আমরা সৈন্যদল যেখানে অবস্থান করেছিল সেখানে পৌঁছে গেলাম। অতঃপর আমার ব্যাপারে যারা কুৎসা রটালো তারা ধ্বংস হলো এবং তাদের নেতৃত্বে ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই[১]।

মা আয়েশা বলেন, মদীনায় ফিরে আসার পর আমি এক মাস অসুস্থ ছিলাম। লোকজন কুৎসা রটানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; অথচ এর কিছুই আমি জানতাম না। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষ থেকে আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় সেই মায়া-মমতা আমি উপলব্ধি করিনি যা ইতিপূর্বে উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন, সালাম দিতেন; অতঃপর বলতেন: কেমন আছ? আমি একটু আরোগ্য লাভ করার পর মিসতাহ'র মায়ের সাথে এক রাত্রে প্রকৃতির ডাকে বাহিরে যাই-তখন আমাদের শৌচাগার ছিল না- ফেরার সময় মিসতাহ'র মা পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং বললো মিসতাহ ধ্বংস

১) সহীহ বুখারী [৪৭৫০]।

হোক। অতঃপর আমি তাকে বললাম: আপনি খারাপ বলছেন। আপনি কি এমন ব্যক্তিকে গালি দিতে পারেন যিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তখন তিনি বললেন: তুমি কি শুনোনি সে কী বলেছে? অতঃপর তিনি আমাকে কুৎসা রটানোর পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তারপর আমার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল.. পুরো রাত সকাল পর্যন্ত কাঁদলাম। আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে আমি এক ফোটা ঘুমাতে পারিনি। আল্লাহ'র রাসুল (স) উক্ত বিষয় এবং তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ব্যাপারে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স) আমরা আপনার পরিবার সম্পর্কে ভালো ধারণাই রাখি। আর কেউ কেউ বললেন: নারীর অভাব নেই, আল্লাহ আপনার ওপর সঙ্কীর্ণ হবেন না। আপনি দাসীকে (বরীরাহ) প্রশ্ন করুন সে আপনাকে সত্যি বলবে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বরীরাহকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আয়েশার কাছে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মসজিদের মিম্বরে দাড়ালেন এবং বললেন: হে মুসলিমবৃন্দ! আমাকে কে সান্ত্বনা দিবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, আমার পরিবারকে জড়িয়ে যাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে? আমি তো আমার পরিবার সম্পর্কে ভালোই জানি। তারা এমন একজন সম্পর্কে বলাবলি করছে যাকে ভালো ছাড়া খারাপ জানি না। অতঃপর সাআদ বিন মুআয (র) বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, কুৎসা রটনাকারী যদি আউস গোত্রের কেউ হয় আমরা তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিব। আর যদি খাযরাজ গোত্রের কেউ হয় আপনি আমাদের নির্দেশ দিন আমরা তা বাস্তবায়ন করে দিব। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে খাযরাজ গোত্রের প্রধান সাআদ বিন উবাদাহ প্রতিবাদ করলেন, অতঃপর লোকজন মসজিদের মধ্যেই হট্টোগুল শুরু করে দিল। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার বাবা-মা আমার নিকটই ছিলেন। তাঁদের দেখে মনে হলো কান্না আমার বুক ফাটিয়ে দিচ্ছে। তিনি এই কুৎসা রটনার পর আমার পাশে বসেননি। এই ঘটনার পর এক মাস অতিবাহিত হলো। আমার ব্যাপারে ইতিমধ্যে তাঁর কাছে কোনো অহী অবতীর্ণ হয়নি। মা আয়েশা বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) বসার পর তাশাহ্হুদ পড়লেন তারপর বললেন: হে আয়েশা আমার কাছে তোমার ব্যাপারে এই রকম সংবাদ এসেছে তুমি যদি নিরাপরাধ হও শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি তুমি কোনো অপরাধে জড়িয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট অনুতপ্ত হও। তিনি (আয়েশা) বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন তাঁর কথা শেষ করলেন আমার অশ্রু বেরিয়ে আসলো এবং আমি এক ফোটা অশ্রু অনুভব করলাম। অতঃপর আমার বাবাকে (আবু বকর) বললাম: আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনি বললেন: আল্লাহ'র শপথ! আমি কী বলবো আমি জানি না। অতঃপর আমার মাকে বললাম: আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনি বললেন: আল্লাহ'র শপথ! আমি কী বলবো আমি জানি না। অতঃপর আমি বললাম: আল্লাহ'র শপথ! আমি জানি যে, আপনারা এই সম্পর্কে যা শুনেছেন তা আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে এবং আপনারা তা সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন। অতঃপর আমি যদি আপনাদের বলি আমি নিস্পাপ- আল্লাহ জানেন আমি অবশ্যই নিস্পাপ- আপনারা উক্ত ঘটনার ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি

আপনাদের নিকট আমি উক্ত ঘটনার ব্যপারে স্বীকারোক্তি-আল্লাহ জানেন আমি নিস্পাপ- প্রদান করি আপনারা অবশ্যই আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ'র শপথ! আমি আমার নিজের ও আপনাদের ব্যপারে ইউসুফের পিতার -ইয়াকুব (আ)- উদাহরণ ছাড়া কিছুই পাচ্ছি না। যেমন তিনি বলেছিলেন: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}[সুতরাং এখন ধৈর্যধারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল][১], তিনি (আয়েশা) বলেন: তারপর মোড় ঘুরে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি।

তিনি (আয়েশা) বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি, না কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর কাছে অহী প্রেরণ করলেন। অহী প্রেরণ সমাপ্তির পর আল্লাহ'র রাসুল (স) হেসে দিলেন এবং প্রথম যে বাক্যটি বললেন তা হলো: আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। অতঃপর আমার মা আমাকে বললেন: তুমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অতঃপর আমি বললাম: আল্লাহ'র শপথ! আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না, এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। তিনিই আমার নির্দোষের প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেন: অতঃপর অবতীর্ণ হলো:{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ }[নিশ্চয় তোমাদের একটি দল যারা মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি][২] উক্ত আয়াতসহ দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়[৩]।

তিনি (আয়েশা) বলেন: আমার বাবা আত্মীয়তা ও দরিদ্রতার কারণে মিসতাহকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন। অতঃপর তিনি বলেন: আল্লাহ'র শপথ! আয়েশার ব্যাপারে মিথ্যা রটানোর পর আমি তাকে কোনো সহযোগিতা করবো না। অতঃপর কুরআন করীমে আবু বকর (র)'র সংকল্পের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ'র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়][৪]। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন:

---

১) সূরাহ ইউসুফ:১৮।
২) সূরাহ আন-নূর:১১।
৩) সহীহ বুখারী [২৬৬১]।
৪) সূরাহ আন-নূর:২২।

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন তা অবশ্যই আমি পছন্দ করি। সুতরাং তিনি মিসতাহ্‌র সহযোগিতায় আবারো এগিয়ে আসলেন[১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিমদের সমাবেশে আগমন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করে উপরিউক্ত বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান। অতঃপর মিসতাহ বিন আসাসাহ (র), হাস্‌সান বিন সাবিত (র) এবং হামনাহ বিনতে জাহাশ (র) সম্পর্কে তাঁদের কৃতকর্মের জন্যে কুরআন করীমে অবতীর্ণ শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে শাস্তি প্রদান করা হয়[২]। অন্যান্য যারা এই অপকর্মে জড়িয়েছিল তাদের অপরাধ যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়নি। তবে এই অপকর্মের মূল হোতা ইবন উবাইকে শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী গবেষকগণ একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন:

ক) খাযরাজ গোত্রের নেতৃত্বে থাকার কারণে মদীনায় তার শক্ত অবস্থান ছিল। তাকে শাস্তি প্রদান করা হলে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে; যার দরুন বড় ধরণের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে বিধায় তাকে শাস্তির আওতায় আনা হয়নি।

খ) সম্ভবত মহান রাব্বুল আলামীন তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রেখেছেন এই কারণে যে, পৃথিবীতে শাস্তির প্রয়োগ অপরাধীকে অনেকটা অপরাধ থেকে মুক্ত করে দেয়; সুতরাং তার জন্য যেহেতু পরকালে ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাই তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

গ) একাধিকবার তার নিফাক প্রমাণিত হওয়ার পর উমর (র)'র আবেদন সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি, সেই একই কারণে ইফ্‌কের ঘটনায়ও তাকে শাস্তির আওতায় আনা হয়নি।

বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা

বনু আল-মুসতালাক যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাপ্রবহে মুসলিমদের জন্য রয়েছে অনেক শরয়ী বিধান ও শিক্ষণীয় বিষয় যা মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উপরিউক্ত ঘটনাসমূহের শিক্ষা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) গনীমতের পঞ্চমাংশ ও নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা সম্পদ ব্যতীত যোদ্ধাদের মাঝে গনীমতের সম্পদ সঠিকভাবে বন্টনের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা সম্পদ সম্পর্কে বিধান হলো যে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা সম্পদ নিয়ে নিতে পারবে যা হাদীস থেকে প্রমাণীত{من قتل قتيلا فله سلبه}[যে কোনো ব্যক্তিকে যুদ্ধে হত্যা করবে নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা সম্পদে তার অধিকার থাকবে][৩]। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ কোন খাতে ব্যয় করা হবে তা কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[আর এ কথাও

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩৮৫১]।

[২]) সুনান আবূ দাউদ [৪৪৭৪], জামে তিরমিযী [৩১৮১] নাসায়ী সুনান কুবরা [৭৩৫১] সুনান ইবন মাজাহ [২৫৬৭]ও মুসনাদ আহমদ [২৪০৬৬]।

[৩]) সহীহ বুখারী [৩১৪২] ও সহীহ মুসলিম [১৭৫১]।

জেনে রাখো যে, কোনো বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ'র জন্য, রাসুলের জন্য, তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থেকে থাকে আল্লাহ'র ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যে যুদ্ধের দিনে সম্মুখীন হয়েছিল উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল][১]। অতঃপর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করা হবে যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) বিভিন্ন যুদ্ধে তা প্রয়োগ করেছেন।

তবে ভূমির ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল বলেন যে, ভূমিও চার পঞ্চমাংশের মতো যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করা হবে। অপরদল এইভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভূমি বন্টন না করে সরকারী মালিকানায় নিয়ে নিবে। অতঃপর ভূমিহীন অসহায়দের মধ্যে বন্টন করা হবে, যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) বনু নাযীরের ভূমি অসহায় মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন অথবা ভূমি বন্টন না করে সরকারের তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগ করে অসহায়, অনাথ ও দরিদ্রদের দীর্ঘ মেয়াদে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে[২]।

২) কৃত্রিম পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিধানের বর্ণনা এসেছে যা হাদীসের পরিভাষায় "আযল" হিসেবে পরিচিত। স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় জরায়ুর বাহিরে বির্যপাত করাকে হাদীসের পরিভাষায় আযল বলা হয়; যা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

উপরিউক্ত বিষয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বরাতে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণীর পৃথিবীতে আগমন নির্দিষ্ট করা আছে তা অবশ্যই আসবে"[৩] অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তোমাদের আযল করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যার আগমন নির্ধারিত তা অবশ্যই আসবে তোমাদের কোনো কর্ম তা রুখতে পারবে না। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র)'র বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে "আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সময়ে আযল করতাম যখন কুরআন অবতীর্ণ হতো"[৪] অর্থাৎ যদি তা নিষিদ্ধ হতো অবশ্যই কুরআন করীমে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হতো।

বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র)'র বরাতে বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ফকীহগণ আযলের বৈধতার প্রতি মতামত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু এ বিষয়ে স্ত্রীর সম্মতি থাকা অপরিহার্য। তবে আল্লামা ইব্‌ন হায্‌ম উপরিউক্ত বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলেন: আযল কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। তিনি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য একটি হাদীস প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আযল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি আযলকে "তা সূক্ষ্ম জীবন্ত সমাধিস্থ করণের নামান্তর"[৫] হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইব্‌ন হায্‌ম সাহাবীদের আমলের ওপর ভিত্তি করে তাঁর

১) সূরাহ আল-আনফাল:৪১।

২) সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত:১৯৩। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৪৬ ও সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/৩১০।

৩) সহীহ বুখারী [৫২১০] ও মুসলিম [১৪৩৮], হাদীসের শব্দমালা ভিন্ন হলেও অর্থ অভিন্ন।

৪) সহীহ বুখারী[৫২০৮] ও মুসলিম [১৪৪০]।

৫) সহীহ মুসলিম [১৪৪২]।

অভিমতের ওপর আরো বেশ কিছু হাদীস ও আছার (সাহাবীগণের কথা ও কর্ম) উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে যেমন আবদুল্লাহ বিন উমর (র) আযল করতেন না এবং তিনি বলেন: আমার সন্তানদের কেউ আযল করেছে বলে অবগত হলে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিব। অনুরূপভাবে চতুর্থ খলীফা আলী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আযল অপছন্দ করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র)'র বরাতে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে অধিকাংশ ফকীহগণের মতামতের বিধানকে আল্লামা ইব্ন হায্ম রহিত (মানসূখ) হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেন[১]।

তবে আল্লামা ইব্ন হাজর আসকালানী তাঁর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে আল্লামা ইব্ন হায্মের উপরিউক্ত অভিমত উল্লেখ করে বলেন:"তাঁর এই অভিমত দুটি বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হয়। প্রথম হাদীস: জাবির (র)'র বরাতে বর্ণিত হাদীস যা ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেন যে,"আমাদের কিছু দাসী ছিল এবং আমরা আযল করতাম। অতঃপর ইহুদীরা বলতে লাগলো:"এটি অবশ্যই সূক্ষ্ম জীবন্ত সমাধিস্থকরণ"। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে, যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাউকে সৃষ্টি করতে চান তা কেউ রুখতে পারবে না। আর দ্বিতীয় হাদীস যেটি বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ (র) থেকে বর্ণিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাণী "সূক্ষ্ম জীবন্ত সমাধিস্থকরণ"থেকে হারাম বা অবৈধ প্রতীয়মান হয় না বরং অন্যান্য হাদীসসমূহের আলোকে যা প্রমাণিত হয় তার ওপর ভিত্তি করে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় বলা যেতে পারে; যা অধিকাংশ ফকীহগণের মতামতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয় এবং আযলের বৈধতার সমর্থনে বর্ণিত হাদীসসমূহ যেগুলোকে আল্লামা ইব্ন হায্ম রহিত (মানসূখ) বলে দাবি করেছেন তার উত্তরে সুনান আবী দাউদে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসসমূহের আলোকে শরয়ী বিধান হিসেবে অধিকাংশ ফকীহগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৩) আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের উচ্ছৃঙ্খল মন্তব্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণ এবং উমর বিন খাত্তাব (র)'র কথায় আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সুচারুভাবে তা এড়িয়ে যাওয়া আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিচক্ষণতার প্রমাণ। কারণ তিনি অবগত যে, তাঁর যোদ্ধাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক রয়েছে। তারা সর্বদা সুযোগের সন্ধানে থাকে এবং খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে তারা সদা তৎপর বিধায় তাদের সেই সুযোগ না দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) অসময়ে কাফেলা নিয়ে রওনা দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় ছিল যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় ফিরে মুনাফিকদের ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ (র)'র তাঁর পিতাকে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আল্লাহ'র রাসুল (স) অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রত্যাখান করে বলেন:"আমরা তার প্রতি সহানুভতিশীল হই এবং যতদিন আমাদের সাথে আছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করি"। পাশাপাশি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা না করার ব্যাপারে উমর (র) কে যে কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স)"তখন

---

[১]) ইব্ন হাযম, আল-মাহাল্লা, প্রাগুক্ত:১০/৮৭।

[২]) ইব্ন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৯/২৪৫।

লোকজন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর সাহাবীদের হত্যা করা শুরু করছে" বর্ণনা করেছেন তা অবশ্যই গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজ সমর্থকদের মাঝে অবহেলিত হয়ে পড়ে এবং স্বগোত্রে অপমানিত ও নিজ পুত্রের নিকট লাঞ্ছিত হয়।

৪) ইফ্‌কের ঘটনা (মিথ্যা অপবাদ) মূলত মা আয়েশাকে জড়িয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের ঘৃণ্য ও অভিনব পন্থা যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী কষ্টদায়ক। কারণ শত্রুপক্ষের সাধারণ ষড়যন্ত্রের জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকে কিন্তু ইফ্‌কের ঘটনা এতই অভিনব ও বিরল যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই রকম ষড়যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত থাকে না এবং তা প্রতিরোধও করা যায় না; বরং হৃদয়ের গভীরে ক্ষয় শুরু হয় এবং তা প্রসারিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে মানুষের অন্তরে জীবনের প্রতি এক প্রকার অনীহা ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মুনাফিকদের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার মুখোশ উন্মোচণে যদি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে দ্রুত অহী অবতীর্ণ হতো তাহলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এত কষ্ট হতো না। কিন্তু এক মাসের বেশি সময় ধরে উপরিউক্ত বিষয়ে কোনো অহী অবতীর্ণ না হওয়ায় তা আরো বেশি উদ্বেগ ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

ইফ্‌কের মতো চ্যালেঞ্জিং ঘটনায় মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কোনো হিকমাহ বা রহস্য অবশ্যই ছিল যা আল্লাহ তাঁর রাসুল (স) কে অহী অবতীর্ণ করে জ্ঞাত করলেন এবং তাঁর রাসুল (স)'র পরিবারকে পূতপবিত্র প্রমাণিত করে একটি সত্যের প্রকাশ ঘটালেন যে, নবী-রাসুলগণের জীবনের কোনো অংশে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যদি ইফ্‌কের ঘটনা না ঘটতো তাহলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যক্তিত্বের এই দিকটি উন্মোচণ হতো না। এই ঘটনাটি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কানে হঠাৎ করে আসার কারণে স্বাভাবিকভাবে অন্য দশ জনের মতো চিন্তিত হয়েছেন। মানষিকভাবে উদ্বিগ্ন থেকেছেন এবং অন্য দশটি ঘটনার মতো বিভিন্ন সূত্র থেকে বাস্তব ঘটনা উন্মোচণের প্রচেষ্টা করেছেন। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কারো অদৃশ্যের জ্ঞান না থাকায় স্পর্শকাতর ঘটনায় তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অনেকটা বিচলিতও হয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মতো পরিস্থিতির মোকাবেলাও করেছেন। সম্ভবত তাই অহী অবতরণে বিলম্বিত হয় যেন সমগ্র মানবজাতির সামনে দুটি বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়:

ক) নবী-রাসুলগণ নুবুওয়্যত বা রিসালতের কারণে মানবগন্ডির বাইরে নন। সুতরাং যারা আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদের জন্য নবী-রাসুলগণকে নুবুওয়্যত ও রিসালতের কারণে মানবোর্ধে ধারণা করা কখনো প্রযোজ্য নয়। পাশাপাশি এমন কোনো বিষয় নবী-রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত করা যথার্থ নয় যা শুধুমাত্র আল্লাহ'র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া।

খ) আল্লাহ'র অহী মানব অনুভূতির মতো কোনো বিষয় নয় যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী অবতীর্ণ হবে। যদি তাই হতো তাহলে ইফ্‌কের ঘটনার সূচনালগ্নেই তিনি শেষ করে দিতে পারতেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিজের পরিবার সম্পর্কে এত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রযোজন হতো না এবং অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা থেকে জনসাধারণকে এই বলে বিরত রাখতে পারতেন যে, উক্ত বিষয়ে অহী অবতীর্ণ হবে তোমাদের অযথা কথা বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র স্ত্রী আয়েশা (র)'র চরিত্র নিয়ে মুনাফিকদের কুৎস রটনার একমাস অতিবাহিত হওয়ার পরও উক্ত বিষয়ে কোনো অহী অবতীর্ণ না হওয়ায় সাধারণ জনগণ উক্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় আরো জড়িয়ে পড়ে; অথচ আল্লাহর রাসুল (স)'র সামনে তাদেরকে আলোচনা থেকে বিরত রাখতে "আমি তাঁর সম্পর্কে ভালো ব্যতীত খারাপ কিছুই জানি না"এই ছোট্ট একটি বাক্য ছাড়া কোনো পন্থাই ছিল না। অতঃপর তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে আয়েশা (র) সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর সাহাবীদের সাথে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে মতবিনিময় করেছেন এবং তাঁদের নিকট উক্ত ঘটনা থেকে উত্তরণের পরামর্শ চেয়েছেন। ইতিমধ্যে একমাস অতিবাহিত হলো এবং দু'একজন ব্যতীত সকলেই আয়েশা (র) সম্পর্কে বললো যে, আমরা তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মা আয়েশা (র) কে বললেন যে, আমার কাছে ভিন্ন রকম কিছু সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিরাপরাধ হও আল্লাহ তোমাকে নিষ্পাপ করে পুত-পবিত্র করবেন। আর যদি তোমার পক্ষ থেকে কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহ'র কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এটি মূলত অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মানুষের কথা প্রতীয়মান হয় না; বরং তিনি জনশ্রুতিকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করছেন না পাশাপাশি অজ্ঞাত বিষয়ে কোনো মন্তব্য করছেন না। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই বক্তব্যের পর তাঁর স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আয়েশা (র) কে পবিত্র ঘোষণা করে সূরাহ আন-নূরের প্রথমার্ধের দশটি (১১-২০) আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মা আয়েশা (র)'র সতীত্ব ঘোষণায় কুরআন অবতরণের পর মা আয়েশা (র)'র প্রতিক্রিয়া থেকে আল্লাহ'র প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং আল্লাহ'র আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন তাঁর মা যখন মেয়েকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বললেন মার প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলেন "আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। তিনিই সেই সত্তা যিনি আমার নিষ্পাপের ঘোষণা অবতীর্ণ করেছেন"[১]। মা আয়েশা (র)'র উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি প্রচন্ড অভিমান প্রকাশ করেছেন এবং স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিমান প্রকাশে শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যদিও বা তিনি নবী হয়ে থাকেন।

৫) ইফ্‌কের ঘটনায় কারো চরিত্র নিয়ে মিথ্যা রটানোর শাস্তির বিধান অবতীর্ণ হয় এবং যারা মা আয়েশার সতীত্ব হরণের মিথ্যা রটানোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে মিথ্যা রটানোর ঘটনায় অবতীর্ণ বিধানের আলোকে শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। তবে এই অপকর্মের মূল হোতা মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই চালাকির জোরে নিরাপদ থেকে যায় যেমন আল্লামা ইব্‌নুল কাইউম বর্ণনা করেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই ইফ্‌কের ঘটনা খুবই চালাকির সাথে ছড়িয়েছে, জনসম্মূখে বিভিন্নভাবে রসিয়ে মূখরোচক ঘটনা বানিয়ে অপরের বরাতে বর্ণনা করেছে যেন সে পরমুখে শুনা ঘটনা বর্ণনা করেছে[২]।

আমাদের সমাজেও কারো চরিত্র নিয়ে মিথ্যা রটানোর বিষয়টি খুবই প্রচলিত বিধায় এই রকম অপকর্মে সাধারণ মুসলিম যেন জড়িয়ে না পড়ে এবং এই রকম কলুষিত চরিত্র থেকে

---

১) সহীহ বুখারী [২৬৬১]।

২) ইব্‌নুল কাইয়ুম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১১৫।

সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আয়েশা (র)'র সতীত্ব ঘোষণায় অবতীর্ণ কুরআন করীমের আয়াতসমূহ উপাস্থাপন করা হলো: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[নিশ্চয় যারা মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেনো নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ'র কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করতো। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ'র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুরনায় এ ধরণের আচরনের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ (নিদর্শনসমূহ) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়। নিশ্চয় যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত][১]।

---

[১]) সূরা আন-নূর:১১-২০।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক স্মরণীয় ঘটনারূপে স্বীকৃত। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সরাসরি নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে মদীনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে চিরতরে সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে কুরাইশদের নেতৃত্বে সমগ্র আরবজাতির ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের কারণে কুরআন করীমে গাযওয়াতুল আহযাব (সম্মিলিত বিরোধী জোটের যুদ্ধ) নামে আলোচিত হয়েছে। সমগ্র আরবজাতির সম্মিলিত আক্রমণের প্রতিরক্ষাস্বরূপ মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে মদীনার চর্তুপার্শ্বে পরিখা খনন করেছিলেন বিধায় এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ নামেও পরিচিতি লাভ করেছে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদের মতে হিজরী পঞ্চমবর্ষে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়[১]। তবে এর ভিন্ন মতও রয়েছে যেমন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুসা বিন উকবা (র)'র বরাতে সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে হিজরী চতুর্থবর্ষে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়[২]। উক্ত বিষয়ে ইমাম ইবন কাসীর বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির করেছেন যে, আহযাবের যুদ্ধ হিজরী পঞ্চমবর্ষের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে এবং ইমাম ইবন কাইউমও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন[৩]।

আহযাব যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদী গোত্র বনু নাযীরের (যাদেরকে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে ইতিপূর্বে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়) একটি দল মক্কায় আগমন করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুরাইশদের উৎসাহিত করে বললো: আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো যতক্ষণ না তাঁকে সমূলে বিনাশ করতে পারি এবং আরো বললো যে, তোমরা যে ধর্মে আছো তা মুহাম্মদের (স) ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর এই ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআন করীমের নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيـنَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا}[তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কিতাবের কিছু অংশপ্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলিমদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের ওপর অভিশাপ করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ যার ওপর অভিশাপ করেন, তুমি তার কোনো সাহায্যকারী খুজে পাবে না][৪]। অতঃপর তারা কুরাইশদের আস্থায় নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়।

---

[১]) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৫ এবং সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ:৪২০।

[২]) সহীহ বুখারী [৩৮৭১]। বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/২৭৫, ইমাম আহমদের বিন্যাসে আল-ফাতহুর রব্বানী, প্রাগুক্ত:২১/৭৬,পূর্ণ বিবরণ দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২১৩।

[৩]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত: ৪/৪৭৬ ও ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রগুক্ত:২/২৬৯-২৭০।

[৪]) সূরাহ আন-নিসা: ৫১-৫২।

তারপর ইহুদীদের উপরিউক্ত দল গাতফান গোত্রে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের মতো তাদেরকেও সম্পদের লোভ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে আস্থায় নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হয়। তারপর তারা বনী ফযারাহ ও বনু মুররাহ গোত্রদ্বয়ের সাথে একই পন্থায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এভাবে উপরিউক্ত বিভিন্ন গোত্র ও দল নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়[১]।

মুসলিমদের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ

আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের সঙ্গ নিয়ে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মুসলিমদের অবহিত করে কীভাবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ সাহাবী সালমান ফার্সী (র) পরিখা খননের পরামর্শ প্রদান করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের নিকট বিষয়টি অভিনব ও অপরিচিত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হয় (শত্রু মোকাবিলায় পরিখা খনন যুদ্ধকৌশল হিসেবে আরবজাতি ইতিপূর্বে জ্ঞাত ছিল না)। অতঃপর মুসলিমগণ মদীনা থেকে বের হলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সৈন্যবিন্যাস করে পাহাড়ের এক প্রান্তরকে প্রতিরক্ষা অঞ্চল নির্ধারণ করে অপর প্রান্তরে শত্রুর মোকাবিলায় পরিখা খননে নেমে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সংখ্যায় তিন হাজার এবং বিরোধী শক্তি কুরাইশ এবং অন্যান্য সব গোত্র ও দল মিলে প্রায় দশ হাজার[২]।

মুসলিমদের পরিখা খনন

আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাঁদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ (প্রতি দশ জনের ভাগে দশ হাত) পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজেও পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের সুনিদিষ্ট সময়ে ৫৫৪৪ মিটার দৈর্ঘ্য, ৪.৬২ মিটার প্রস্থ ও ৩.২৩ মিটার গভীর পরিখা খনন করেছিলেন[৩]। বরা বিন আযিব (র)'র বরাতে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত যে "আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আমি পরিখার মাটি সরাতে দেখেছি। তাঁর পেটের চামড়া ধুলার আবরণে ছিল এবং তিনি প্রচুর লোমশ ছিলেন"[৪]। সহীহ বুখারী শরীফের অপর একটি বর্ণনায় বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করে তাঁদের পিঠে করে মাটি সরাতেন এবং সুরে সুরে বলেন:

نحن الذين بايعوا محمدا * على الإسلام ما بقينا أبدا

আমরা যারা মুহাম্মদ (স)'র নিকট বায়আত করেছি যতদিন বেঁচে আছি ইসলামের ওপর থাকবো[৫]।

---

[১]) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত: ২/১৬৮ ও সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/৩২৪।

[২]) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত: ২/১৬৮ ও সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত: ২/৩২৪।

[৩]) আবু খলীল শওকী, আতলাস-আস-সীরাহ আল-নাবভিয়্যাহ, দারুস সালাম, কায়রো, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫৮।

[৪]) সহীহ বুখারী [৭২৩৬ ও ৪১০৬] এবং মুসলিম [১৮০৩]।

[৫])সহীহ বুখারী [৩৭৯৬] ও মুসলিম [১৮০৫]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের জবাব প্রদান করেন:

اللَّهُمَّ إنه لا خير إلا خير الآخرة * فبارك في الأنصار والمهاجرة

হে আল্লাহ! পরকালের কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। অতঃপর আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে তুমি বরকত দান করো[১]। সহীহ্ বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায়:

اللَّهُمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة * فاغفر الأنصار والمهاجرة

হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া কোনো জীবন নেই। অতঃপর তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করো[২]।

প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবির বিন আবদিল্লাহ (র)'র বরাতে সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমরা খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করেছিলাম, আমাদের প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়ে বসলো, আমরা তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাবার গ্রহণ করিনি। আল্লাহ'র রাসুল (স) ক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে ঘরে যওয়ার অনুমতি নিয়ে ঘরে এসে আমার স্ত্রীকে বললাম: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট ক্ষুধার যা অবস্থা দেখলাম তা দেখে আমার ধৈর্য ধরে রাখতে পারিনি। তোমার কাছে কী আছে? সে বললো: কিছু ময়দা ও একটি ছাগী আছে। অতঃপর ছাগীটি জবেহ করে মাংস পাতিলে চড়িয়ে ময়দার খামির করা হলো। তারপর আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট উপস্থিত হলাম। ঐদিকে ঘরে খামিরগুলো টুকরো করা হচ্ছে এবং মাংসের পাতিল চুলার ওপর চড়ানো হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে মাংস রান্না হয়ে যাবে। অতঃপর আমি ফিরে এসে বললাম: আমার কাছে সামান্য খাবার আছে, হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি আসুন সাথে একজন অথবা দুজন নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: খাবারের পরিমাণ কত? আমি তাঁকে জানালাম, তিনি বললেন: অনেক। অতঃপর তুমি তাকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত মাংসের ও রুটির পাতিল চুলা থেকে যেন নামানো না হয়। তারপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের আওয়াজ দিলেন: হে পরিখাবাসী! জাবির খাবার তৈরী করছে, তোমরা সবাই চলো। জাবির (র) স্ত্রীর কাছে পৌঁছে বললেন: সর্বনাশ আল্লাহ'র রাসুল (স) মুহাজির ও আনসার যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন সবাইকে নিয়ে এসেছেন! তাঁর স্ত্রী বললেন: তিনি কী আপনাকে খাবাবের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তাঁর স্ত্রী বললেন: তাহলে চিন্তা কী? আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) ভালোই জানেন[৩]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আগমন করেন; অতঃপর বলেন: তোমরা প্রবেশ করো এবং ঠেলাঠেলি করো না। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) রুটি ছিড়ে এবং মাংসের পাতিল থেকে মাংস নিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে এগিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে সবাই তৃপ্তিসহকারে খাবার গ্রহণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: এগুলো তুমি খাও এবং তোমার প্রতিবেশীদের হাদিয়া দাও। মানুষের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অতঃপর জাবির (র) বলেন: আল্লাহ'র শপথ! তাঁরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে চলে গেলেন, অথচ আমাদের খাবার যা ছিল তাই রয়ে গেল[৪]।

---

[১])সহীহ বুখারী [৪১০০] ও মুসলিম [১৮০৫]।

[২])সহীহ বুখারী [৩৭৯৫] ও মুসলিম [১৮০৪]।

[৩])সহীহ বুখারী [৪১০১]।

[৪]) সহীহ বুখারী [৪১০১]। আরো বিস্তারিত দেখুন:ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/২৭৯-২৮০।

পরিখা খননে মুনাফিকদের অবস্থান

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, পরিখা খননের সময় কোনো প্রয়োজনে কোথাও যেতে হলে মুসলিমগণ আল্লাহ’র রাসুল (স)’র অনুমতি নিয়ে যেতেন এবং সঠিক সময়ে তাঁরা ফিরে আসতেন। কিন্তু মুনাফিকরা নানা অজুহাতে কাজ ফেলে অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যেত এবং অনেক বিলম্বে ফিরতো এবং নানা ছলনার আশ্রয় নিতো। অতঃপর কুরআন করীমের নিম্মোক্ত আয়াত তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়:{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং রাসুলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ’র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, অতীব মেহেরবান][১]।

বনু কুরাইযাহ’র চুক্তি ভঙ্গন

বনু নাযীরের দলপতি হুয়াই বিন আখতাব বনী কুরাইযাহ’র দলপতি কাআব বিন আসাদের কাছে এসে তাকে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার কুপ্রেরণা জুগিয়ে বললো: তোমার কাছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এসেছি, আরো নিয়ে এসেছি গাতফান নেতৃবৃন্দকে। তারা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের সমূলে বিনাশ না করে তারা থামবে না। অতঃপর কাআব বিন আসাদ হুয়াই বিন আখতাবকে বলল: তুমি আমার কাছে সমগ্র জীবনের অপমান নিয়ে এসেছ... হে হুয়াই বিন আখতাব দুঃখিত! আমি যেভাবে আছি সেভাবে থাকতে দাও। আমি মুহাম্মদ (স)’র পক্ষ থেকে সর্বদা সততা ও বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করে আসছি এর ব্যতিক্রম কিছুই পাইনি। অবশেষে হুয়াই বিন আখতাব কাআব বিন আসাদকে বারবার কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট এই দুঃসংবাদ পৌঁছালে আউস (ইসলাম পূর্বে ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযাহ’র সাথে আউসগোত্রের মিত্রতা ছিল) গ্রোত্রের নেতা সাআদ বিন মুআয (র) কে খবরের সত্যতা যাচাই করতে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি খবর সত্যি হয় তা চেপে যেতে; যাতে জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচার না পায়। আর যদি সংবাদ মিথ্যা হয়; তা যেন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার-প্রসার করা হয়। সাআদ বিন মুআয (র) সঠিক খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং তিনি জানতে পারলেন যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতঃপর তিনি আল্লাহ’র রাসুল (স) কে

---

[১]) সূরাহ আন-নূর:৬২।

ঘটনার সত্যতা জানালে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আল্লাহু আকবর হে মুসলিম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ করো[১]।

বনু কুরাইযাহ'র চুক্তি ভঙ্গনে মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া

বনু কুরাইযাহ'র চুক্তি ভঙ্গনের সংবাদ মুসলিমদের মধ্যে পৌঁছালে মুনাফিকরা বিভিন্ন রকমের গুজব ছড়াতে থাকে যে, মুসলিমদের ওপর-নীচে চারিদিকে শত্রুরা অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং তারা বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (স) আমাদেরকে রোম-পারস্য সম্রাজ্যের সম্পদ ভক্ষণের অঙ্গীকার প্রদান করছে অথচ এখন লোকজন একা শৌচাগারে যেতেও নিজেদের নিরাপদ ভাবছে না[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিমদের কঠিন অবস্থা উপলব্ধি করে আউসগোত্রের প্রধান সাআদ বিন মুআয (র) ও খাযরাজগোত্রের প্রধান সাআদ বিন উবাদাহ (র) কে ডেকে বললেন যে, মদীনার উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের বিনিময়ে গাতফানগোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ফিরে যাবে এই মর্মে তাদের সাথে চুক্তি করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার পরামর্শ চাইলে তাঁরা দুজনই বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স) এটি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে বলে থাকেন তাহলে সেখানে আমাদের কারো হাত নেই, অথবা এটি যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আমরা বিনা বাক্যে তা করবো; কারণ আমরা সর্বদা আপনার পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে আসছি। নাকি এটি আপনি আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে করতে চাচ্ছেন? আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হ্যাঁ। কারণ আমি দেখলাম সমগ্রআরব তোমাদেরকে এক ধনুক থেকে নিশানা বানাচ্ছে এবং তারা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। সুতরাং এর মাধ্যমে তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তোমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার লক্ষ্যে আমি এই প্রস্তাব করছি। তখন সাআদ বিন মুআয (র) বললেন: আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এক সময় আমরাও এদের (মিত্র বাহিনী) মতো মুশরিক ছিলাম এবং প্রতিমার পূজা করতাম। আল্লাহ'র ইবাদাত করতাম না এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাও ছিল না। তখন তারা বিক্রয় অথবা অতিথি আপ্যায়ন ব্যতীত আমাদের কোনো শস্য ভক্ষণের কামনা করারও সাহস পেত না। আর এখন আমরা আপনার মাধ্যমে ইসলামের সন্ধান পেয়েছি এবং মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিব? আল্লাহ'র শপথ! আমরা তাদেরকে তরবারী ছাড়া কিছুই দিব না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করেন। সাআদ বিন মুআয (র)'র উত্তর শুনে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং বললেন: আমি তোমাদের কাছে এটিই আশা করেছিলাম[৩]।

অন্যদিকে মুশরিকদের সম্মিলিত মিত্রশক্তি মদীনায় পৌঁছে পরিখা দেখে বিস্মিত হলো এবং বলতে লাগলো এটি এমন এক রণকৌশল যার সাথে আরবজাতি পূর্ব পরিচিত নয়।

---

[১]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম,প্রাগুক্ত:২/২২৩ ও তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/৩৪৬।

[২]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম,প্রাগুক্ত:২/২২৩।

[৩]) সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/২২৩ ও তারীখে তাবারী, প্রাগুক্ত:২/৫৭৩। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভ্যিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৬২-৫৬৩।

অতঃপর তারা পরিখার চারিদিকে সৈন্যবিন্যাস করে মুসলিমদের অবরুদ্ধ করে রাখলো। সুতরাং বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ব্যতীত কোনো যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি। যেমন পরিখার কোনো সঙ্কীর্ণ অংশে মুশরিকরা প্রবেশ করতে প্রচেষ্টা করেছিল; মুসলিমগণ তা বন্ধ করে দিলে কিছু ফিরে যায়, আর কয়েকজন ওখানেই মারা পড়েছে। যারা মারা পড়েছে তাদের মধ্যে আমর বিন উৎবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাকে আলী বিন আবী তালিব (রা) হত্যা করেন[১]। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ছয়জন শহীদ হন এবং মুশরিকদের দশজন নিহত হয়[২]।

বিনা যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়

আল্লাহ'র অশেষ মেহেরবানী, বিনা যুদ্ধে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বিজয় সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুটি পন্থায় মুশরিকদের পরাজয় নিশ্চিত করলেন যাতে মুসলিমদের কারো কোনো হাত ছিল না।

প্রথমত: গতাফান গোত্রের নুআইম বিন মাসউদ নামের এক লোক আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে প্রস্তাব করেন যে, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে মুসলিমদের এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমি কিছু করতে চাই, আমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছি আমার গোত্রের লোকজন জানে না; সুতরাং আপনি আমাকে নির্দেশ করুন। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তুমি এখন আমাদের একজন, তবে তারা তোমাকে এখনো তাদের লোক মনে করে। যদি তুমি পারো সেই রকম কিছু একটা করতে পারো, কারণ যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র[৩]।

অতঃপর নুআইম বিন মাসউদ বের হয়ে বনু কুরাইযাহ'র (তারা তখনো তাঁকে মুশরিক ভেবেছিল) কাছে এসে তাদের আশ্বস্ত করতে সক্ষম হলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুরাইশদের ওপর আস্থা রাখা সঠিক হচ্ছে না যতক্ষণ তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কোনো কিছু বন্ধক রাখা না হয়, যেন তারা তোমাদের একা রেখে পালাতে না পারে। যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে তোমরা মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে মদীনায় একা হয়ে পড়বে। তখন তারা বললো: সঠিক তো এটি ভালো বুদ্ধি... তারপর তিনি কুরাইশদের নিকট আগমন করে তাদের বললেন যে, বনী কুরাইযা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পুনরায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে গোপনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কুরাইশ ও গতফানীদের অভিজাত পরিবারের কিছু সদস্যকে অপহরণ করে হত্যা করার জন্যে মুসলিমদের হাতে তুলে দিবে। ইহুদীরা যদি তোমাদের নিকট বন্ধক হিসেবে তোমাদের কিছু যুবকদের তাদের কাছে রাখতে চায় খবরদার! তোমাদের কোনো লোক তাদের হাতে দিবে না। তারপর তিনি গতফানীদের কাছে এসে একই পন্থায় তাদেরকেও

---

১) সাঈদ রমাদ্বান বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২১৬।

২) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৫।

৩) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত: ৪/১১৩।

সর্তক করলেন। ফলে মিত্র বাহিনীর মধ্যে বিশ্বস্ততার ঘাটতি দেখা দেয় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করতে লাগলো[১]।

দ্বিতীয়ত: সম্মিলিত আরব মিত্রবাহিনী মুসলিমদের দশ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখার পর প্রচন্ড ঠান্ডা ও অন্ধকার রাত্রে ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় প্রবাহিত হয় যাতে তাদের তাবুর রশি ছিড়ে গিয়ে সব উল্টে-পাল্টে যায় এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফাহ বিন ইয়ামানের বরাতে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, তিনি বর্ণনা করেন:"আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে আহযাবের রাতে অবস্থান করেছিলাম, প্রচন্ড ঝড়োহাওয়া ও ঠান্ডায় আমরা কাতর হয়ে পড়ি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: কে শত্রুপক্ষের সংবাদ নিয়ে আসতে পারবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে থাকবে? আমরা সবাই চুপ, আমাদের মধ্যে কেউ এর উত্তর দিল না। এভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স) তিনবার বললেন, তারপর তিনি আমার নাম ধরে বললেন: হুযাইফাহ উঠো শত্রুপক্ষের সংবাদ নিয়ে এসো, তবে আমাদের বিপদে ফেলো না। আমার নাম ধরে বলার পর আমার কোনো উপায় ছিল না। অতঃপর আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে পিছনে রেখে খুব সতর্কভাবে যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে হাঁটছি এভাবে তাদের কাছে পৌছালাম। অতঃপর কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ানকে পিঠে ও পার্শ্বদ্বয়ে আগুনের উষ্ণতা নিতে দেখলাম। তারপর আমি ধনুকে একটি তীর রেখে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে ইচ্ছা করলে আসার পথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সতর্কবাণী "আমাদের বিপদে ফেলো না" স্মরণ করলাম। তবে আমি তীর ছুড়লেই তাকে আঘাত করতে পারতাম। অতঃপর আমি খুব ধীরে ধীরে ফিরে এসে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে শত্রুপক্ষের খবর জানালাম। আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে তাঁর আলখেল্লা পরিয়ে দিলেন যা পরে তিনি নামায পড়তেন। আমি সকাল পর্যন্ত তাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। সকালে আল্লাহ'র রাসুল (স) উঠো হে ঘুমকাতুরে বলে জাগিয়ে দিলেন"[২]।

উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আরো কিছু বৃদ্ধি করে এভাবে ঘটনার বিবরণ প্রদান করেন যে, অতঃপর হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (র) বলেন:"আমি শত্রুদের মাঝে প্রবেশ করলাম, ঠান্ডা বাতাস ও আল্লাহ'র সেনানী তাদের সাথে এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে, তীব্র বাতাসে চুলায় তাদের পাতিল, আগুন এবং তাবু স্থির থাকছে না। অতঃপর আবু সুফয়ান দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: হে কুরাইশ! প্রত্যেকে লক্ষ্য রেখো কে তার সঙ্গী? হুযাইফাহ বললেন: অতঃপর আমি আমার ডান পাশের ব্যক্তির হাত ধরে বললাম তুমি কে? সে বললো: আমি মুআভিয়াহ বিন আবী সুফয়ান, তারপর বাম পাশের ব্যক্তির হাত ধরে বললাম তুমি কে? সে বললো: আমি আমর বিন আল-আস[৩]। এভাবে

---

[১]) আকরম আল-উমরী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ আস-সহীহা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা, সৌদি আরব, ১৪১২ হি:/১৯৯২ইং:২/৪৩০। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভ্যিয়াহ: আরয অকায়ে, তাহলীল আহদাস, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৬২-৫৬৩।

[২]) সহীহ মুসলিম [১৭৮৮]। তবে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় [কিতাবুল জিহাদ: ২৮৪৬ ও ২৮৪৭ এবং কিতাবুল মাগাযী: ৪১১৩] হুযাইফাহ (র)'র স্থলে যুবাইর (র)'র নাম উল্লেখ করা হয়। সম্ভবত অন্য ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) যুবাইর (র) কে বনু কুরাইযাহ'র সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রেরণ করেছিলেন। আহযাবের রাত্রি শত্রু পক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে হুযাইফাহ (র) কেই প্রেরণ করেছিলেন। যেমন সকল সীরাত গ্রন্থ ও ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩]) শারহু আয-যুরকানী, প্রাগুক্ত: ২/১১২।

তিনি বিচক্ষণতার সাথে তাৎক্ষণিক সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করে নিলেন। তারপর আবু সুফয়ান বললো: হে কুরাইশ! তোমরা এমন এক অবস্থায় আছো যে, রসদ ফুরিয়ে গেছে, ইহুদী গোষ্ঠী বনু কুরাইযাহ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাসের আক্রমণ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ... অতঃপর তোমরা সকলেই চলো আমি চললাম"[১]। পরের দিন সকালে মুশরিকরা ফিরে গেলে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসেন।

আল্লাহ'র রাসুল (স) আহযাবের যুদ্ধে দিবা-রাত্রী মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য পার্থনা ও মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের দোয়ায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর দোয়ার ভাষা ছিল: "হে আল্লাহ তুমি কিতাব (কুরআন করীম) অবতরণকারী, দ্রুত জবাবদানকারী, মিত্রশক্তিকে পরাজিত করো, হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরাজিত করো এবং তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করো"[২]।

এই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আসরের নামায ছুটে যায়। অতঃপর তিনি নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর কাযা হিসেবে নামায আদায় করেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত: আহযাবের যুদ্ধে উমর (র) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর কুরাইশদের গালি দিতে দিতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বললেন:"হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! সূর্য ডুবে গেল আমি তো আসর পড়তে পারলাম না!... আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমিও পড়িনি। অতঃপর তিনি এক পাশে গিয়ে নামাযের অযু করলেন আমরাও অযু করলাম এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসর পড়লাম। তারপর কিছুক্ষণ পর মাগরিব পড়লাম"[৩]। তবে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আরেকটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: "আহযাবের দিন সালাতে উসতা অর্থাৎ আসরের নামায আমাদের ছুটে যায়, আল্লাহ তাদের ঘর ও কবর আগুনে পরিপূর্ণ করুন, তারপর তিনি মাগরিব ও ইশা'র মাঝে আসর আদায় করেন"[৪]।

আহযাব যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা

আহযাব যুদ্ধের উপরিউক্ত বিবরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অন্যান্য যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধও মূলত ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার কারণেই সংঘটিত হয়। তারা কুরাইশসহ বিভিন্ন আরবজাতি ও গোত্রকে মুসলিমাদর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানী ও উৎসাহ যুগিয়ে তাদের সংঘটিত করেছে।

বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার কারণে মদীনা থেকে ইতিপূর্বে বহিষ্কৃত ইহুদীগোত্র বনু নাযীরই নয়, বরং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণায় মদীনায় অবস্থানরত অপর ইহুদীগোত্র বনু কুরাইযাহও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে যা যুদ্ধের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ তারা মুসলিমদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ ছিল

---

[১]) সহীহ মুসলিম [১৭৮৮] ও মুসনাদ আহমদ[২৩৩৩৪]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/২৩১।

[২]) সহীহ বুখারী [৩০২৪] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৩৮৪৩]।

[৩]) সহীহ বুখারী [৫৯৬] ও সহীহ মুসলিম [৬৩১]।

[৪]) সহীহ বুখারী [৬৩৯৬] ও সহীহ মুসলিম [৬২৭]।

এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের কোনো কারণ ব্যতিরেকে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এই যুদ্ধে মুসলিমদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) এই যুদ্ধে সমগ্র আরবজাতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে সংঘটিত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, এটি মূলত এক প্রকার অসমযুদ্ধ যা মুসলিমদের পক্ষে মুকাবিলা করা খুবই দূরহ ও দুঃসাধ্য বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) গাতফানগোত্রকে মদীনার উৎপাদিত ফসলের একতৃতীয়াংশ প্রদান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলিমদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও তাঁদের প্রচন্ড ঈমানী মনোবল দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স) সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তার বাস্তব প্রমাণও দিয়েছেন। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টা, মানসিক দৃঢ়তা ও মনোবল অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবকে বিজয় করতেও সহযোগিতা করে।

২) যেহেতু এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি বাস্তবতার আলোকে সম্ভব ছিল না; তাই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রবীণ সাহাবী সালমান ফার্সী (র)'র পরামর্শে এক অভিনব রণকৌশল গ্রহণ করলেন যার অভিজ্ঞতা যুদ্ধবাজ আরবজাতিরও ইতিপূর্বে ছিল না এবং এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি বলতে পরিখা খনন ব্যতীত অন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না। আরবজাতি ও মুসলিমদের ইতিহাসে এটি প্রথমযুদ্ধ যেখানে পরিখা খননকে সামরাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমগণ বিনা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধে শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয় না অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সামরাস্ত্র ব্যবহার ব্যতীত যুদ্ধ জয় করা যায়। যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অমর বাণী{الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أحق بها}[প্রজ্ঞা মুসলিমদের হারানো সম্পদ যেখানেই পাওয়া যায় সেই তা গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশী অধিকার রাখে][১]'র বাস্তব প্রমাণ। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের সর্বদা প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে সজাগ ও সচল রাখা অতীব প্রয়োজন।

৩) পূর্বে আলোচিত যুদ্ধের বর্ণনায় পরিখা খননে সাহাবীদের সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সক্রিয় অংশগ্রহণের বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) ইচ্ছা করলে তাঁর সাহাবীদের পরিখা খননে নির্দেশ প্রদান করে ঘরে বসে বিশ্রাম নিতে পারতেন অথবা তিনি কোদাল বা বেলচা হাতে পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করে সাহাবীদের খননকাজ তদারকী করতে পারতেন এবং এটিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে সশরীরে কোদাল বা বেলচা হাতে পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁর সাহাবীদের উৎসাহ জুগিয়েছেন, ক্ষুধায় কাতর ও ক্লান্ত সাহাবীদের সাথে গুনগুনিয়ে কাজে চাঞ্চল্য ফিরিয়ে এনে সমগ্র মানবজাতির সামনে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন যা ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কারণ ইসলামে সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার মূল উদ্দেশ্য মহান রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের বহিপ্রকাশ যাতে সম্মান ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাজা-প্রজা সকলেই সমান। এতে রয়েছে পরবর্তী পর্যায়ের

---

[১]) জামে তিরমিযী [২৬৭৮]।

মুসলিম শাসকবৃন্দের জন্য এক প্রাণবন্ত আদর্শ যার মাধ্যমে খুব সহজেই সাধারণ জনগণের মনের কুঠিরে স্থান লাভ করা সম্ভব।

৪) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও তাঁর সাহাবীদের সাথে প্রাণবন্ত আচরণের কারণে তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালোবাসতেন বিধায় ক্ষুধায় কাতর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পেটে পাথর বাঁধা দেখে বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র) নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুমতি নিয়ে ঘরে গিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে কীভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আপ্যায়ন করা যায় তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং যা আছে তা দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আপ্যায়ন করতে ব্রতী হন। আল্লাহ'র রাসুল (স) রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ সাহাবীর আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেন। তবে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায়ও তাঁর অন্যান্য ক্ষুধার্থ সাহবীদের কথা ভুলে যাননি এবং সকল সাহাবীদের সাথে নিয়ে জাবির (র)'র বাড়ী রওনা দেন।

৫) আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবী জাবির (র)'র ঘরে খাবারের আয়োজন ও পরিমাণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন বিধায় পূর্বেই তাঁকে কী করতে হবে তার নির্দেশ দেন; যেন অধিক অথিতির আগমনে আয়োজক বিব্রত না হয়। এখানে জাবির (র)'র স্ত্রীর দৃঢ়তা বেশ লক্ষণীয় যে, স্বামীর উদ্বেগের জবাবে তিনি বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত কিনা। উত্তরে স্বামী যখন বলেন যে, তিনি অবগত। তখন জাবির (র)'র স্ত্রীর উত্তর "চিন্তার কোনো কারণ নেই; কেননা আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স) উক্ত বিষয়ে জ্ঞাত আছেন"। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কঠিন ও চ্যালেঞ্জের সময় সুযোগ-সুবিধা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সকলে ভাগা-ভাগি করে ভোগ করাই বাঞ্ছনীয়, তাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন মযবুত হয় এবং একে অপরের প্রতি সহানুভতিশীল হয়ে পড়েন।

৬) এই যুদ্ধে মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র একাধিক মুজিযা বা অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায় যে, সাহাবী জাবিরের ছোট্ট একটি ছাগীর মাংসে কয়েকশ লোক তৃপ্তি সহকারে আহারের পরেও খাবার যা তাই রয়ে যায়; যা যুক্তির মাধ্যমে বিবেচনা করা অসম্ভব। তাছাড়া অবশিষ্ট খাবার আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মাঝে হাদিয়া দিতে পরামর্শ প্রদান করে সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অগাধ ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটালেন। পাশাপাশি অসহায়, অনাথ ও প্রতিবেশীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন।

৭) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আউসগোত্রের নেতা সাআদ বিন মুআয (র) ও খাযরাজ গোত্রের নেতা সাআদ বিন উবাদাহ (র)'র সাথে মদীনার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের বিনিময়ে গাতফানগোত্রকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার পরামর্শ গ্রহণের তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের সাধারণত অসহায় অবস্থার মুখোমুখী করতে চাননি বিধায় তিনি কখনো আগবাড়িয়ে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে যাননি; বরং তাঁর সাহাবীদেরকে যুদ্ধ কামনা করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া সমগ্র মুশরিক আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে হঠাৎ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় একটু বিচলিত হয়েছেন বটে তবে যুদ্ধ বিজয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের ওপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের কোনো প্রকার ঘাটতি ছিল না

বিধায় তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন:{الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم}[এখন আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করবো, তারা আমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে না এবং আমরা তাদের দিকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হবো][১]। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। পরবর্তীতে তারা কখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করতে সাহস করেনি। তারপরেও বনী কুরাইযাহ'র চুক্তি ভঙ্গন আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ভাবিয়ে তুলেছে; যেন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশার বিস্তার না ঘটে। তাই তিনি বনী গাতফানের সাথে এই চুক্তি করতে চেয়েছিলেন।

৮) আল্লাহ'র রাসুল (স) এই অসমযুদ্ধে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুতি ও বিনয়সহকারে প্রার্থনার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছেন যেমন তিনি বদরযুদ্ধে করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর রাসুল (স) কে বিনা যুদ্ধে বিজয় প্রদান করেন। অথচ যখন চারিদিক থেকে মুশরিকরা মুসলিমদের অবরুদ্ধ করে রাখে তখন মুসলিমদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল যা কুরআন করীমে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا}[হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন। যখন তারা তোমাদের

[১]) সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, আহযাব যুদ্ধ অধ্যায় [৪১১০]।

নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরিববাসী! এটা স্থির থাকার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতো, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করতো এবং তারা মোটেই বিলম্ব করতো না। অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ'র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ'র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। তারা কমই যুদ্ধ করে। তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ'র জন্যে সহজ। তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিতো, তবেই ভালো হতো। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করতো। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহ'র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখলো, তখন বললো, আল্লাহ ও তার রাসুল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাঁদের ঈমান ও আত্মসমর্পনই বৃদ্ধি পেল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ'র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী][১]।

---

১) সূরাহ আল-অহযাব:৯-২৫।

এই প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস কোত্থেকে আসলো যা শুধুমাত্র মুশরিকদের আঘাত করলো, তাদের হাড়ি-পাতিল উল্টিয়ে দিল, তাদের তাবু উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তাদের অন্তরে এক অজানা ভয় পেয়ে বসলো; অথচ তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিম শিবিরে তা উপলব্ধিই হলো না। মূলত তা ছিল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মুজিযা বা অলৌকিক শক্তি; যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী-রাসুলগণের কঠিন সময়ে সংকট উত্তরণে সাহায্য করেন, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

৯) যুদ্ধ পরিস্থিতি সরাসরি তদারকী করতে গিয়ে এই যুদ্ধে আসরের নামায আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ছুটে গিয়েছিল এবং তা সূর্যাস্তের পর কাযা হিসেবে আদায় করেছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় একাধিক নামায ছুটে গিয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহর রাসুল (স) নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে কাযা নামায আদায় করা বৈধ প্রতীয়মান হয়; অথচ শরীয়তের বিধান মতে প্রতিটি ইবাদতের সময় নির্ধারিত এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা আদায় করতে হবে।

যেহেতু মহান রাববুল আলামীন মানবজাতিকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে, আল্লাহ রাববুল আলামীনের প্রদত্ত নীতিমালানুসারে সেই ইবাদত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তিনি প্রতিটি ইবাদতের সুনির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অথবা তাঁর প্রেরিত রাসুল (স)'র জীবন বা সীরাত থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। অতঃপর তিনি প্রতিটি ইবাদতের যেমন পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং কোনো ইবাদত তাঁর প্রণিত পদ্ধতির আলোকে সম্পন্ন না হলে তা ইসলামে বিদআহ বা কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি প্রতিটি ইবাদতের সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং নির্ধারিত সময়ের বাহিরে কোনো ইবাদত সম্পন্ন করা যায় না। যেমন সময়ের পূর্বে নামায আদায় করা যায় না কারণ কুরআন করীমে নামায সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}[নিশ্চয়ই নামায মুসলিমদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে]।[১] অনুরূপভাবে রমাদ্বানের সিয়াম রমাদ্বান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে আদায় করা যাবে না এ সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণনা এসেছে{شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[রমাদ্বান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সিয়াম পালন করবে][২] অনুরূপভাবে যাকাত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পদের যাকাত আদায় করতে হয় এবং অনুরূপ হজ্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আদায় করে নিতে হয় অন্যথায় তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না। তবে যে ইবাদত সম্পর্কে কুরআন করীমে বা হাদীসে অনুমোদন আছে তা অন্য সময়ে কাযা হিসেবে আদায় করা যাবে, যেমন রমাদ্বানের সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে{ومن كان مريضا أو على

---

[১]) সূরাহ আন-নিসা:১০৩।

[২]) সূরাহ আল-বাকারাহ:১৮৫।

{سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر- ولا يريد بكم العسر-}[আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সিয়াম পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা ইচ্ছা করেন না][১]।

তাছাড়া কুরআন করীমে নামাযের পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকলেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে জিবরীলে আমীন (আ)'র মাধ্যমে নামায আদায় করার পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিতঃ হাদীসের ভাবার্থ [জিবরীলে আমীন (আ) প্রথম দিন নামাযের সময় শুরু হওয়া মাত্র আল্লাহ'র রাসুল (স) কে নিয়ে নামায আদায় করেন এবং দ্বিতীয় দিন একেবারে শেষ সময়ে একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করে বলেনঃ এটি পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের নামাযের সময়, এবং এই দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময় আপনি এবং আপনার উম্মাতের নামায আদায় করার নির্ধারিত সময়][২]। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অথবা পরে নামায আদায় করার কোনো সুযোগ নেই। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোনো সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণে নামায আদায় করা না হয় অন্যান্য ইবাদতের (রমাদ্বানের সিয়াম, ফরয যাকাত ও হজ্ব) ন্যায় কাযা হিসেবে নামায আদায় করা যাবে কী না সেই বিষয়ে ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে।

কাযা নামায আদায়ে ফিকহী বিধান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামায আদায়ের শর্তাবলী পূর্ণ করা ব্যতীত নামায আদায় সঠিকভাবে পরিশুদ্ধ নয়, যেমন শরীর, স্থান ও পোষাকের পবিত্রতা, নর-নারীর শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে পরিধেয় থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। যদি প্রবিত্র হওয়ার পানি অথবা মাটি পাওয়া না যায় তাহলে শরয়ী বিধান হলো উক্ত নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর পানি অথবা মাটি প্রাপ্ত না হলে শেষ সময়ে অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করে নিতে হবে। অনুরূপভাবে কারো পরিধেয় পোষাক না থাকলে নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর শেষ সময় পর্যন্ত সতর ঢাকার পরিধেয় কোনো বস্তু প্রাপ্ত না হলে নগ্নাবস্থায় বসে নামায আদায় করে নিতে হবে। অনুরূপভাবে নামাযের অভ্যন্তরীণ শর্তাদির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য, যেমন দাড়িয়ে নামায আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে, বসেও নামায আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি শুয়ে নামায আদায় করবে, শুয়েও নামায আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি ইশারা-ইঙ্গিতে নামায আদায় করবে। তাও যদি করতে না পারে তাহলে নামায আদায়ে সে বিরত থাকবে। এ বিষয়ে ফিক্হী মাযহাবের সকল ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেন, এতে কারো দ্বিমত নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ফরয সিয়াম ও হজ্বের মতো কাযা হিসেবে নামাযও আদায় করার সুযোগ থাকতো তাহলে কেন অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায়ের বিধান এসেছে।

---

[১]) সূরাহ আল-বাকারাহঃ১৮৫।

[২]) জামে তিরমিযী [১৪৯] ও সুনান আবী দাউদ [৩৯৩]।

অনুরূপভাবে নগ্নাবস্থায় বসে নামায আদায় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের সুনির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নামায আদায় করার কোনো বিধান নেই।

কাযা নামায সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

চার মাযহাবের ইমামগণসহ অধিকাংশ ফকীহগণ সঙ্গত কোনো কারণে নামায ছুটে গেলে তা কাযা হিসেবে আদায় করার ব্যপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁদের অভিমতের সপক্ষে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন:{من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك}[যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে ছিল অথবা নামায আদায় করতে ভুলে গিয়েছিল তার প্রতি বিধান হলো যখনই ঘুম থেকে জেগে উঠবে অথবা স্বরণ হবে তখনই নামায আদায় করে নিবে, এটি ব্যতীত তার অন্য কোনো বিকল্প নেই][১]। আলোচিত হাদীসের মূল বিষয়বস্তু হলো ঘুমের কারণে অথবা ভুলে নামায ছুটে গেলে তা স্মরণ হওয়া মাত্র নামায আদায় করার নির্দেশনা প্রতীয়মান হয়। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ফিকহী গ্রন্থে "ওমরী কাযা" বা আজীবন কাযা আদায় করার বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করা হয়[২]। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে কাযা হিসেবে নামায আদায় করার বিষয়টি সহজেই অনুমেয় বিধায় কাযা নামাযের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কাযা নামাযের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনে এই রকম ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। প্রথমত আহযাবের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য, মদীনায় বসবাসরত ইহুদীগোত্র বনু কুরাইযাহ'র চুক্তি লঙ্ঘন এবং মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে যুদ্ধপরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারণ করছিল যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) সরাসরি পরিস্থিতি তদারকী করতে গিয়ে এই যুদ্ধে আসরের নামায আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ছুটে যায় এবং তা সূর্যাস্তের পর আদায় করেছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণানায় একাধিক নামায ছুটে গিয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ'র রাসুল (স) নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেছিলেন।

তাছাড়া বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ (র) ও বেলাল (র) থেকে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণীত যে, কোনো এক যুদ্ধ থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের নিয়ে রাতে মদীনায় ফিরেছিলেন এবং দীর্ঘ সফর ও নির্ঘুমের কারণে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) একটু বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবু হুরাইরাহ (র) অথবা বেলাল (র) কে নামাযের সময় জাগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। ঘুমানোর কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় নামাযের সময় জাগিয়ে দিতে ব্যর্থ হন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পর ঘুম ভাঙ্গলে আল্লাহ'র রাসুল (স) দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: এখানে শয়তানের

---

[১]) সহীহ বুখারী [৫৯৭] ওসহীহ মুসলিম [৬৮৪]।

[২]) নিযামুদ্দীন আল-বালখী ও অন্যান্য, ফাতোয়া আলমগিরী, দারুল ফিকহ বৈরুত, ১৩১০ হিজরী: ২/৩৫৮।

উপস্থিতি ঘটেছে। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পৌঁছে আযান-ইকামাহসহ ফজরের নামায আদায় করেছিলেন[১]।

উপরিউক্ত দুটো ঘটনা থেকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নামায আদায় করা বৈধ প্রতীয়মান হয়। অথচ শরীয়তের বিধান মতে প্রতিটি ইবাদতের সময় নির্দিষ্ট করা আছে এবং নির্ধারিত সময়ের বাহিরে কোনো ইবাদত করা যায় না। তাছাড়া নামায সম্পর্কে কুরআন করীমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করার বিধান আছে:"নিশ্চয় নামায মুসলিমদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে"[২]। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নামায আদায় করতে হবে।

শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ বলেন যে, যেহেতু কাযা নামাযের শরীয়তে কোনো বিধান নেই তাই নামায কাযা হিসেবে আদায় করা যাবে না; বরং গাফলতীর কারণে নামায ছুটে যাওয়ায় বেশী বেশী নফল নামায পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করাই উত্তম[৩]। কারণ তাওবাহ'র কারণে গাফলতি করে যে নামায সঠিক সময়ে আদায় করা হয়নি তা ক্ষমা হয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছেন{التائب من الذنب كمن لا ذنب له}[অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহকারী যার কোনো অপরাধ নেই তার মতো][৪] তাছাড়া তাওবাহকারী সম্পর্কে কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে:{إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما}[কিন্তু যারা তওবা করে যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু][৫]।

আহযাব যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নামায ছুটে যাওয়া ও রাত্রিবেলা সফরের সময়ে ঘুমের কারণে নামায ছুটে যাওয়ার উভয় ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীস{من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك}[যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে ছিল অথবা নামায আদায় করতে ভুলে গিয়েছিল তার প্রতি বিধান হলো যখনই ঘুম থেকে জেগে উঠবে অথবা স্বরণ হবে তখনই নামায আদায় করে নিবে, এটি ব্যতীত তার অন্য কোনো বিকল্প নেই][৬]এর সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত হাদীসে গাফলতি নয় যৌক্তিক কোনো কারণে নামায ছুটে গেলে তা আদায় করার বিধানের কথা বলা হয়েছে। যেমন আহযাব যুদ্ধে মুসলিমদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল সেই রকম কঠিন সময়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সরাসরি যুদ্ধপরিস্থিতি তদারকী করা ফরয রহিত হওয়ার মতো কারণ বলা যেতে পারে। তাছাড়া এই ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ক্ষেত্রে বিশেষায়িতও বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সফরের ঘটনাও একই সূতিকায় অন্তর্ভূক্ত বিধায় স্বাভাবিকভাবে সবার ক্ষেত্রে এই রকম তুলনা করা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

---

১) সহীহ মুসলিম [৬৮০]।
২) সূরাহ আন-নিসা:১০৩।
৩) ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ২/৪৭ ও নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত:২/২৭।
৪) সুনান ইবন মাজাহ [৪২৫০]।
৫) সূরাহ আল-ফুরকান:৭০।
৬) সহীহ বুখারী [৫৯৭] ও সহীহ মুসলিম [৬৮৪]।

তবে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ ও ইমাম ইব্ন কাইউম ব্যতীত অধিকাংশ ফকীহগণের মতে নামায কোনো কারণে ছুটে গেলে তা কাযা হিসেবে আদায় করা আবশ্যক বলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের ওপর ভিত্তি করে অভিমত প্রদান করেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক সময়ে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সচেতনতা দান করুন! আমীন।

বনু কুরাইযাহ'র বিরুদ্ধে অভিযান

বনু কুরাইযাহ অভিযানের প্রেক্ষাপট

বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ইতিপূর্বে মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদীগোত্র বনু নাযীরের দলপতি হুয়াই বিন আখতাব'র কুপ্রেরণায় প্রথমে গড়িমসি করলেও পরে বনু কুরাইযাহ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে কুরাইশদের সহযোগিতার কারণে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন।

বনু কুরাইযাহ'র অবরোধ

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) খন্দক থেকে ফিরে সামরাস্ত্র রেখে গোসল করছিলেন এমতাবস্থায় জিবরীলে আমীন (আ) উপস্থিত হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বললেন: আপনি সামরাস্ত্র রেখে দিয়েছেন অথচ আমি এখনো রাখিনি, ওদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ুন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: কোন দিকে? তিনি উত্তরে বললেন: ঐদিকে বলে বনু কুরাইযাহ'র দিকে ইশারা করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন[১]। আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোনো অবস্থাতেই বনী কুরাইযাহ'র অঞ্চলে ব্যতীত আসরের নামায না পড়ে; সুতরাং সাহাবীগণ আসরের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেন। কেউ কেউ আসরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে বিধায় পথেই আসরের নামায আদায় করে নিলেন, আবার কেউ কেউ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মতো বনু কুরাইযাহ'র অঞ্চলে পৌঁছে সূর্যাস্তের পর আসরের নামায আদায় করেন। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তা অবগত করার পর তিনি কাউকে তিরষ্কার করেননি[২]। আল্লাহ'র রাসুল (স) বনু কুরাইযাহকে পঁচিশ দিন অপর বর্ণনায় পনের দিন তাদের দূর্গে অবরুদ্ধ করে রাখার পর মহান রাব্বুল আলামীন তাদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি সঞ্চার করে দিলেন।

প্রখ্যাত সীরাতপ্রণেতা ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন যে, বনু কুরাইযাহ'র দলপতি কাআব বিন আসাদ যখন দেখলো যে, মুসলিমগণ অবরোধ প্রত্যহার করছেন না তখন সে ইহুদীদের বললো: হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের ওপর যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি তার যে কোনো একটি তোমরা গ্রহণ করতে পারো। তারা উত্তরে বললো: সেগুলো কী? অতঃপর সে বললো: আমরা এই লোকের (আল্লাহ'র রাসুল) আনুগত্য করি এবং তাঁকে স্বীকার করে নিই। আল্লাহ'র শপথ! তোমাদের সকলের নিকট স্পষ্ট যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ'র প্রেরিত নবী, অবশ্যই তোমরা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের গ্রন্থে (তাওরাত) সংবাদ পেয়েছ। অতঃপর তোমরা নিজেদের রক্ত, সন্তান ও নারীদের নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। তারা বললো: আমরা কখনো তাওরাতের বিধান ত্যাগ করবো না। কাআব বললো: তাহলে এসো আমরা আমাদের সন্তান ও নারীদের হত্যা করে পিছুটান ত্যাগ করে মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর স্বসস্ত্র আক্রমণ করে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আমাদের ও মুহাম্মদের

[১]) সহীহ বুখারী [৪১১৭ ও ২৮১৩]।
[২])সহীহ বুখারী [৪১১৯] ও সহীহ মুসলিম [১৭৭০]।

মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকি; তখন আমরা যদি ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে আমরাই নিঃশ্বেষ হয়ে যাবো আমাদের পিছনে আর কোনো প্রজন্ম থাকবে না যাদের নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। তারা বললো: অসহায়দের (শিশু ও নারী) কী অপরাধ? কাআব বললো: এটা যদি তেমরা না মানো আজ শনিবার রাত্রি, সম্ভবত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ এই রাত্রে আমাদের নিরাপত্তা ঘোষণা করতে পারে। অতঃপর তোমরা দূর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ো; সম্ভবত আমরা ভালো কিছু পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু তারা তাও মানতে সম্মত হলো না।

শেষ পর্যায়ে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সালিস'র মাধ্যমে দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। বনু কুরাইযাহ মদীনার অধিবাসী আউসগোত্রের মিত্র বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইচ্ছা ছিল কোনো আউসী সাহাবীকে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা। অতঃপর তিনি আউস নেতা সাআদ বিন মুআয (র) কে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সালিস নির্বাচন করেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেখানেই একটি তাবুতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন তাঁকে বনু কুরাইযাহ'র ব্যাপারে সালিস নির্বাচন করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন এবং তিনি একটি গাধায় আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের[১] পাশে আসলেন তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তোমারা তোমাদের নেতাকে (তিনি যেহেতু অসুস্থ) দাঁড়িয়ে সাহায্য করো[২]। তারপর তিনি বললেন: এরা (বনু কুরাইযাহ) তোমার সালিসের ওপর আস্থা রেখে দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের বন্দী (দাস-দাসি) করার সিদ্ধান্ত দিলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তুমি আল্লাহ'র বিচারেই সিদ্ধান্ত দিয়েছ[৩]।

তারপর সাআদ (র) বললেন: হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আপনার রাসুল (স) কে যারা অস্বীকার করে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছুই নেই। আমি মনে করি হে রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধ সমাপ্ত করেছেন। যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন আমি যেন আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। আর যদি আপনি যুদ্ধ সমাপ্ত করে থাকেন তাহলে আমার এই আঘাতে মৃত্যু প্রদান করুন। মহান রাব্বুল আলামীন সাআদ (র)'র দোয়া কবুল করলেন এবং আহযাবের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতে আহতাবস্থায় রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন[৪]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরাইশ আর কখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করেনি; বরং মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন যেমনটি আল্লাহ'র রাসুল আহযাব যুদ্ধ শেষে মদীনার পথে আসার প্রাক্কালে (স) বলেছিলেন:{ لَا يَغْزُونَكُمْ بَعْد هَذَا أَبَدًا ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ

---

[১]) এখানে মসজিদে নাবভী উদ্দেশ্য নয় বরং বনু কুরাইযাহ'র অঞ্চলে মুসলিমদের নামাযের জন্য যে অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল তা বুঝানো হচ্ছে।

[২]) সহীহ বুখারী [৬২৬২]।

[৩]) সহীহ বুখারী [৪১২১]ও সহীহ মুসলিম [১৭৬৮]।

[৪]) সহীহ বুখারী[৪১২২] ও মুসলিম [১৭৬৯]।

تَغْزُونَهُمْ}[এর পরে তারা (কুরাইশ) কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না, তবে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে][১]।

তারপর সাআদ (র)'র সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর বনু কুরাইয়াহকে দূর্গ থেকে বের করে মদীনার খন্দকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তাদের পুরুষদের (প্রকৃত সংখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ৬১৮ জন যোদ্ধাকে) হত্যা করা হয় এবং তাদের শিশু ও নারীদের বন্দী (দাস-দাসী) করা হয়[২]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনার খন্দকের দিকে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হুয়াই বিন আখতাব (বনু নাযীরের দলপতি)ও ছিল, যে বনু কুরাইযাহকে চুক্তি ভঙ্গে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় আশ্বস্ত করেছিল। তাকে দুহাত গর্দানের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সম্মুখে আনা হলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তার দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহ'র শপথ! তোমার শত্রুতায় আমার মনে কোনো প্রকার দ্বিধা নেই। তবে আল্লাহ যাকে অপমান করেন সে অপমানিত হয়, তারপর তাকে হত্যা করা হয়।

বনু কুরাইযাহ'র অভিযানের শিক্ষা

হাদীস বিশেষজ্ঞ ও সীরাতবিদগণ বনু কুরাইযাহ'র ঘটনা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী বিধান উদ্ভাবন করেছেন যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) চুক্তি ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতকের হত্যা বৈধ: ইমাম মুসলিম এই বিধানকে বনু কুরাইযাহ'র যুদ্ধের শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সন্ধি, চুক্তি ও পারস্পরিক নিরাপত্তা প্রদানকে যথাযথ সম্মান পরিদর্শন করা ইসলামী বিধানে বাঞ্ছনীয়; যতক্ষণ না অপর দল এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং সন্ধি বা চুক্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ না করে। তবে অপর পক্ষ যদি চুক্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামী বিধানে সম্পূর্ণ বৈধ যা উপরিউক্ত আলোচিত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,এ বিধান ইহুদীদের পালনীয় ধর্মগ্রন্থ তাওরাতেও রয়েছে[৩]।

২) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সালিস নির্বাচন বৈধ: ইমাম নাভভী বলেন যে, মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সালিশ নির্বাচন করার বৈধতা বনু কুরাইযাহ'র ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে সালিসকে অবশ্যই মুসলিম ন্যায়পরায়ণ ও সালিসের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায় ব্যতীত অধিকাংশ ইসলামী গবেষকগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। কারণ খারেজীরা আলী (র)'র সালিস নির্বাচনকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছিল[৪]।

---

[১]) সহীহ বুখারী[৪১০৯]।

[২]) ইহুদীগোত্র বনু কুরাইযাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক প্রতিরক্ষাচুক্তির লঙ্গন ও খন্দকের যুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুলত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জিবরীল আমীন (আ)'র নির্দেশে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের ১৫/২৫দিন অবরোধ করার পর তারা তাদের পুরানো মিত্র বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী সাআদ বিন মুআয (র) কে সালিস মনোনীত করে। তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস/দাসী হিসেবে গণ্য করার পক্ষে রায় প্রদান করলে তাদের ৬১৮ জন পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। তবে এই হত্যাকান্ড যুদ্ধের হত্যাকান্ড বলা যাবে না। তাঁর এই রায় ঘোষণার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছিলেন: তুমি আল্লাহ'র রায় প্রদান করেছো।

[৩]) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৬৩-৩৬৪।

[৪]) ইমাম নাবভী'র শরহে সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত:১২/৯২।

৩) **বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইজতিহাদের বৈধতা:** আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিদের্শের "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনু কুরাইযাহ'র অঞ্চলে পৌঁছা ব্যতীত আসরের নামায না পড়ে" অর্থ বুঝতে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ার কারণে আসর নামায আদায়ে সাহাবীদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি কোনো দলকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তিরস্কার না করার কারণে ইসলামের ফরয়ী বা শাখা বিষয়াদিতে ইজতিহাদের বৈধতা প্রতীয়মান হয়। তবে একদল সঠিক ও অন্যদল অবশ্যই সঠিক না হওয়া সত্ত্বেও কোনো দলই পুরস্কৃত বা তিরিস্কৃত নয়।

৪) **মুহাম্মদ (স)'র নুবুওয়্যত সম্পর্কে ইহুদীরা জ্ঞাত:** বনু কুরাইযাহ'র দলপতি কাআব বিন আসদের সাথে তার গোত্রের কথোপকথন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীরা তাওরাতের মাধ্যমে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নুবুওয়্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মেনে নিতে পারেনি।

৫) **আগমনকারীকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গ:** বনু কুরাইযাহ'র ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে সাআদ বিন মুআয (র) আগমন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসারদের তাঁকে বাহন থেকে নামতে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেন; কারণ তিনি আহযাব যুদ্ধে পায়ের রগে তীর লেগে মারাত্মকভাবে আহত হন। উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ইসলামী গবেষক বিভিন্ন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের বৈধতার প্রতি মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে হাদীসে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন[১]। তাছাড়া তাঁরা এ বিষয়ে আরো কিছু বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেন, যেমন মা আয়েশা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহ'র রাসুলের মতো করে কথা বলতে, আলোচনা করতে ও বসতে ফাতেমা অপেক্ষা আর কোনো মানুষকে দেখিনি। তিনি আরো বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন তাঁকে আসতে দেখেতেন তখন তিনি তাঁকে স্বাগত জানাতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিজ আসনে বসাতেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর কাছে আগমন করলে তিনিও আল্লাহ'র রাসুল (স) কে স্বাগত জানাতেন এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে চুম্বন করতেন[২]।

তবে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত ওলামা উক্ত হাদীসকে কেন্দ্র করে ইসলামে এক ধরনের কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন যার সাথে উপরিউক্ত হাদীস বা অন্য কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের কোনো রকমের বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ততা নেই। মূলত ইবাদত ও আদতের (সামাজিক রীতিনীতি) মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। ইবাদতের বৈধতার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'র সমর্থন অপরিহার্য। কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র সমর্থন না থাকলে তা কখনো ইবাদত হিসেবে পূণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে আদায় করা যাবে না; বরং তা বিদআহ বা কুসংস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে আদতের (সামাজিক রীতিনীতি) ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'র সমর্থন নয়; বরং এ ক্ষেত্রে

---

[১]) ইমাম নাভভী'র শরহে সহীহ মুসলিম:১২/৯৩।

[২]) জামে তিরমিযী [৩৮৭২] ও সুনান আবী দাউদ [৫২৭১] এবং ইমাম বুখারী আদাব মুফরাদ গ্রন্থে মা আয়েশার বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

কুরআন-সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তা বৈধ।

তাছাড়া তিনি আহযাব যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণেই আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসারদের তাঁকে বাহন থেকে নামতে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেন যা হাদীসের মূল টেক্সট (قوموا إلى سيدكم) থেকে প্রতীয়মান হয়। আরবী ব্যাকরণের আলোকে قوموا(Verb) পর إلى(Preposition) ব্যবহার হলে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার অর্থ বুঝানো হয় এবং উপরিউক্ত হাদীসে তাই ঘটেছে। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ বুঝানো হয় না। তাছাড়া যেখানে আল্লাহ'র রাসুল (স) স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন সেখানে অন্যজনকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই যা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ তাঁর উপস্থিতিতে সাআদ (র) কে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেননি বরং তাকে সহযোগিতা করতে দাঁড়িয়েছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট

ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে যুলকা'দাহ মাসে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিকট ঘোষাণা করেন যে, তিনি ওমরাহ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের বড় একটি দল তাঁর সাথে ওমরাহ পালনের সঙ্গী হতে আগ্রহী হলেন। তাঁদের সংখ্যা ধীরে ধীরে প্রায় চৌদ্দশতে দাঁড়ালো। আল্লাহ'র রাসুল (স) পথেই ওমরাহ'র জন্য ইহরামের পোষাক পরিধান করেন এবং কোরবানীর পশুও পাঠিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে যেন মক্কাবাসী তাঁর মক্কাহ আগমনকে যুদ্ধের আগমন মনে না করে। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ'র ঘরের উদ্দেশ্যেই মক্কাহ আগমন করেছেন তা যেন বুঝে নেয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স) যুল হুলাইফাহ নামক স্থানে অবস্থানকালে খুযাআহ গোত্রের বিশ্‌র বিন সুফয়ানকে মক্কাবাসীর খবরা-খবর সংগ্রহ করতে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। গাদীরুল আশতাত নামক স্থানে পৌঁছালে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র গুপ্তচর যাকে তিনি পূর্বে পাঠিয়েছিলেন তিনি খবর নিয়ে আসেন এবং বলেন: কুরাইশ আপনার বিরুদ্ধে বিশাল সমাগম ঘটিয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য হাবশীদের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা আল্লাহ'র ঘরের উদ্দেশ্যে আপনার আগমন রুখে দিবে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন...। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি এই ঘরের (আল্লাহ'র ঘর) উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, কাউকে হত্যা করতে বা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নয়; তাই আপনি এগিয়ে যান এবং যে আমাদের প্রতিরোধ করবে তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করবো এবং তিনি বলেন: আল্লাহ'র নামে চলুন[১]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: আমাদের মধ্যে কে আছে যে তাদের (কুরাইশ) পথ পরিহার করে অন্য পথে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? বনু আসলাম গোত্রের এক লোক বললেন: আমি পারবো হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! অতঃপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে উপত্যকার একটি সংক্ষীর্ণ সরু পথ দিয়ে রওনা হলেন। কাফেলা হুদাইবিয়া অঞ্চলের নিকটে পৌঁছালে সেখানেই কাফেলা থামিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) জিজ্ঞাসা করলেন: কাফেলা থামল কেন? উত্তরে জানানো হলো যে, এই পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আল্লাহ'র সম্মান প্রদর্শনে তারা যা দাবি করে তাতে আমার সম্মতি আছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়া প্রান্তরের ছোট্ট পানির কূপের নিকটে অবস্থান করেন। হুদাইবিয়ায় সাহাবীগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করলে তিনি তাঁর তীরদান থেকে একটি তীর বের করে পানির কূপে গেড়ে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন এবং তীরটি পানির মধ্যে গেড়ে দেওয়ার পর ফুল্কী মেরে পানি বেরিয়ে আসলো এবং সকলে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন[২]।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪১৭৮ ও ৮১৭৯]।

[২]) উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী [২৭৩১ ও ২৭৩২] কিতাবুশ শুরুত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। মাগাযী অধ্যায়ের বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) শান্ত পানিতে তাঁর হাত রাখলেন এবং আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ফুল্কী মেরে পানি বেরিয়ে আসলো, তারপর তিনি পাত্র আনালেন। অতঃপর তিনি মুখে পানি নিয়ে

আল্লাহ'র রাসুল (স) ও কুরাইশদের মধ্যে দূত বিনিময়

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাফেলা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারাত ও ওমরাহ'র আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে মদীনায় ফিরে আসার শান্তিপূর্ণ বার্তা নিয়ে কুরাইশদের বুঝানোর জন্য তাদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনে প্রথমে তিনি খারাশ বিন উমাইয়্যাহ খুযায়ীকে মনোনীত করে ছালাব নামক এক উটের ওপর আরোহী করে প্রেরণ করেন। তিনি মক্কাহ প্রবেশ করলে কুরাইশ তাঁর বাহনের পা কেটে দেয় এবং তাঁকে হত্যা করার প্রয়াস চালায়। তবে কিনানাহ গোত্রের লোকজন কুরাইশদেরকে তাঁকে হত্যার চেষ্টা থেকে বিরত রাখে। অতঃপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট ফিরে আসে ঘটনার বিবরণ প্রদান করলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আরেক জনকে তাঁর শান্তিপূর্ণ বার্তা নিয়ে দূত হিসেবে পাঠানোর ইচ্ছে পোষণ করেন এবং এইবারে প্রথমে উমর (র) কে মনোনীত করলে তিনি এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যে, আপনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে আমার শক্ত অবস্থানের বিষয়ে অবগত আছেন। তারা সুযোগ পেলে আমাকে হত্যা করবে এবং আমাকে রক্ষা করার মতো আদীগোত্রের [উমর (র)'র নিজ গোত্র] উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। এরপরেও আপনি পছন্দ করলে আমি যাবো। তবে আপনাকে এমন একজনের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারি যিনি মক্কাহ নগরীতে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ও স্বজনধারী এবং অপ্রতিরুদ্ধ, তিনি হলেন উসমান বিন আফফান (র)। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উসমান বিন আফফান (র) কে ডেকে বললেন: তুমি কুরাইশদের নিকট আমার শান্তিপূর্ণ বার্তা নিয়ে যাও এবং তাদেরকে জানাও যে, আমরা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি, পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারাত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি, পশু কুরবানী করবো এবং ফিরে যাবো।

অতঃপর উসমান বিন আফফান (র) মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে বালদাহ পৌঁছালে কুরাইশদের পেয়ে যান এবং তার গন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর মক্কাহ আগমনের শান্তিপূর্ণ বার্তা কুরাইশদেন নিকট পৌঁছালে তারা বললো তোমার কথা শুনলাম। তবে এটা হবার নয়; সুতরাং তোমার বন্ধুর নিকট ফিরে যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, তিনি আমাদের কাছে আসতে পারবে না।

অতঃপর তাঁর কাছে আব্বান বিন সাআদ বিন আল-আস এসে স্বাগত জানালো এবং বললো: আসুন আপনার প্রয়োজন নিয়ে ব্যাস্ত হবেন না। তারপর তিনি মক্কাহ প্রবেশ করেন এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যক্তি ব্যক্তি দেখা করলেন। কারো সাথে বালদাহে সাক্ষাত করেছেন, কারো সাথে মক্কাহ নগরীতে সাক্ষাত করেছেন। তাদের মধ্যে আবু

গড়গড়া করলেন এবং আল্লাহ'র নিকট দোয়া করলেন, তারপর পাত্রে পানি ভরে নিলেন। অতঃপর বললেন: কিছুক্ষণ এভাবে থাকুক। অতঃপর সাহাবীগণ পিপাসা নিবারণ করলেন। হাফিয ইবন হাজর আল-আসকালানী দুটো দুই ঘটনা উল্লেখ করে বুখারীর দুই বর্ণনার সমন্বয় করেন। এটি ছিল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

সুফয়ান বিন হার্ব ও সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তারা সকলেই এক বাক্যে বলছে যে, মুহাম্মদ (স) কখনো মক্কাহ প্রবেশ করতে পারবে না[১]।

মুশরিকরা উসমান বিন আফফান (র) কে বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেননি। মূলত তিনি এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ'র রাসুল (স) ব্যতীত তাওয়াফ করতে রাজী হননি[২]। অতঃপর তিনি বিভিন্ন কারণে মক্কাহ নগরীতে আটকে পড়া দুর্বল মুসলিমগণের খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে খুব শীঘ্রই তাদের মুক্তি হবে বলে সুসংবাদ প্রদান করেন। তাঁরাও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি মৌখিকভাবে সালাম পৌঁছান এবং প্রত্যাশা করেন যেই সত্তা তাঁকে হুদাইবিয়ায় নিয়ে এসেছেন তিনি অবশ্যই তাঁকে মক্কাহ প্রবেশের তাওফিক প্রদান করবেন[৩]।

বায়আতুর রিদওয়ান

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, উসমান বিন আফ্ফান (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দূত হিসেবে কুরাইশদের সাথে আলোচনা করতে মক্কাহ আগমন করেছেন। তবে কুরাইশ যদিও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশে কঠোর ছিল কিন্তু তারা যুদ্ধ এড়িয়ে মুসলিমদের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী একটি সন্ধি সম্পাদনের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যচ্ছিল। সন্ধির ব্যপারে এক পা এগিয়ে আসলে পরবর্তীতে দুই পা পিছিয়ে যায়। কারণ এই ব্যপারে কুরাইশদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক কঠিন ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশ ক'দিন লাগলো এবং উসমান বিন আফ্ফান (র) তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। এমতাবস্থায় মুসলিম শিবিরে খরব রটে গেল মক্কাহ নগরীতে উসমান (র) কে হত্যা করা হয়েছে। দূতকে হত্যা করা খুবই নেক্কারজনক ও ভয়াবহ সংবাদ যা রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক বিষয় বিধায় মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলো।

যদিও পরবর্তীতে সংবাদটি সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে আল্লাহ'র রাসুল (স) বিষয়টি খুবই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে সাহাবীদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানালে জাদ্দ বিন কাইস ব্যতীত সেখানে উপস্থিত ১৪শ সাহাবী আল্লাহ'র রাসুল (স) হাতে হাত রেখে আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করলেন[৪]। সর্বপ্রথম আবু সিনান আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-আসাদী বায়আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর সাহাবীগণ প্রত্যেকে বায়আত গ্রহণ করলেও জাদ্দ বিন কাইস মুনাফিক হওয়ার কারণে সে বায়আত গ্রহণ করলো না। তবে বিশিষ্ট সাহাবী সালমাহ বিন আকওয়া প্রথমে, মাঝখানে এবং সর্বশেষ মোট তিনবার বায়আত গ্রহণ করলেন[৫]। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর ডানহাত সাহাবীদের হাতের ওপর রেখে বললেন: এটি উসমান (র)'র হাত। মহাগ্রন্থ কুরআন

---

[১]) ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২৯০ ও ইবন হিশাম,আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ,প্রাগুক্ত: ২/৩৪৪। বিস্তারিত দেখুন: আলী সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভ্যিায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৬২৩-৬২৪।

[২]) ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:২/৩৪৪।

[৩]) ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২৯১।

[৪]) সহীহ বুখারী [৪১৬৯]।

[৫]) ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২৯১। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: আলী সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভ্যিায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৬২৫-৬২৬।

করীমে বায়আতুর রিদওয়ান এভাবে চিত্রিত হয়েছে: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}[যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ'র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ'র হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহ'র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন][১]। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে অঙ্গীকারকারী ১৪শ সাহাবীদের আল্লাহ'র হাতে অঙ্গীকার করেছেন বলে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; তাদের জন্য আয়াতের শেষে মহা পুরস্কারের সুসংবাদও এসেছে।

বৃক্ষবাসীর অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদা

বায়আতুর রিদওয়ান কুরআনে উল্লেখিত বৃক্ষের নীচে সম্পন্ন হওয়ার কারণে অংশগ্রহণকারী ১৪শ সাহাবী ইসলামের ইতিহাসে বৃক্ষবাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কুরআন করীমে অঙ্গীকারকারী ১৪শ সাহাবীর মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার "আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জন" প্রাপ্তির ঘোষণা এসেছে: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}[নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করল। অতঃপর তিনি অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন][২]। উপরিউক্ত আয়াতে অঙ্গীকারকারী ১৪শ সাহাবীর জন্য আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি তাদের প্রতি মহান রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল ও আসন্ন মহা বিজয়ের সুসংবাদের ঘোষণা অবতীর্ণ হলো।

কুরআন করীমের পাশাপাশি একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে তাঁদের সম্পর্কে অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা এসেছে। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির বিন আবদিল্লাহ (র) থেকে বর্ণীত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়ার দিন আমাদেরকে বলেছিলেন: {أنتم اليوم خير أهل الأرض}[আজ তোমরা পৃথিবীবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ] সেদিন আমরা ১৪শ ছিলাম[৩]। জাবির বিন আবদিল্লাহ (র) থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আমাকে উম্মু মুবাশ্বির সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি উম্মু মুমিনীন হাফসাহ'র কাছে আল্লাহ'র রাসুল (স)কে বলতে শুনেছেন: {لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها}[বৃক্ষবাসীদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ইন শা আল্লাহ, যারা এর নীচে আনুগত্যের শপথ করেছিল][৪]।

---

১) সূরাহ আল-ফাতহ:১০।
২) সূরাহ আল-ফাতহ:১৮।
৩) সহীহ বুখারী [৪১৫৪] ও মুসলিম [১৪৮৫]।
৪) সহীহ মুসলিম [২৪৯৬ ও ৪৪৬০]।

আল্লাহ’র রাসুল (স)’র প্রতি কুরাইশদের দূত

দুই পক্ষ যুদ্ধের মুখোমুখী হওয়ার কারণে সমগ্র আরবাঞ্চলে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং দুই পক্ষকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পথে থাকার জন্য শান্তিপ্রিয় কিছু আরব গোত্রপ্রধান এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে কুরাইশরা যখন বায়আতুর রিদওয়ানের বিষয়ে অবগত হলো এবং মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে অটল থাকার শপথ গ্রহণের বিষয় জানলো, তখন তারা যুদ্ধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রপ্রধানকে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে সমঝোতা করার জন্য দূত হিসেবে প্রেরণ করলো।

১) বুদাইল বিন অরকাহ আল-খুযায়ী’র দূতালী

বুদাইল বিন অরকাহ আল-খুযায়ী একদল লোক নিয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট আগমন করে বললেন যে,আমি কাআব ও আমের বিন লুআইকে হুদাইবিয়া’র পানির নিকটে দেখে আসলাম যে, তারা আপনাকে আল্লাহ’র ঘরে আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মেষপাল নিয়ে ওখানে অবস্থান করেছে। অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স) বললেন: আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কুরাইশকে যুদ্ধ নিঃশ্বেষ করে দিয়েছে এবং যুদ্ধে তাদের ক্ষয় ধরেছে। তবে তারা যদি চায় আমি এখানকার অবস্থান দীর্ঘায়িত করি যাতে করে তারা আমার পথের প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে নিবে। আর তারা যদি তা অস্বীকার করে তাহলে যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার দায়িত্ব পালনে লড়াই করে যাবো; যতক্ষণ না মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন। অতঃপর বুদাইল বিন অরকাহ বলেন: আমি আপনার কথা তাদের নিকট পৌঁছে দিব। তারপর বুদাইল বিন অরকাহ কুরাইশদের নিকট গিয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট শুনা কথাগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করলো।

২) উরওয়াহ বিন মাসউদ’র দূতালী

তারপর উরওয়াহ বিন মাসউদ বুদাইল বিন অরকাহ’র কাছ থেকে শুনা আল্লাহ’র রাসুল (স)’র দাবি নিয়ে কথা বলার লক্ষ্যে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট যাওয়ার প্রস্তাব করলে কুরাইশরা তার প্রস্তাব সমর্থন করে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সাথে কথা বলার জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়।

অতঃপর সে রওনা হয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট পৌঁছালে তিনি উরওয়াহ বিন মাসউদকে একই কথা বললেন যা বুদাইল বিন অরকাহকে ইতিপূর্বে বলেছিলেন। অতঃপর সে মহানবী (স) কে বললো: আপনি কী মনে করেন যে, আপনি স্বজাতির মূলোৎপাটন করতে পারবেন, যা কখনো সম্ভব নয়? তাছাড়া আমি এমন কিছু চেহারা ও চরিত্র লক্ষ্য করছি যারা আপনাকে একা রেখে পালিয়ে যাবে। তখন আবু বকর (র) বললেন: লাতের ভগাঙ্কুর চাটতে থাকো আমরা তাঁকে রেখে পালিয়ে যাবো!...[১]

উরওয়াহ সেদিকে ফিরে বললো: কে? লোকজন জানালো: আবু বকর। অতঃপর উরওয়াহ বললো: আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকতো তাহলে তুমি পার পেতে

---

১) সহীহ বুখারী [২৭৩১ ও ২৭৩২] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৪৮৭২]।

না এবং আমি অবশ্যই এর জবাব দিতাম[১]। তারপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলো এবং যখনই সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে কথা বলেছে তখন সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাড়ি ছুঁইয়ে কথা বলছিল। মুগীরাহ বিন শুবাহ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পাশেই ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল তরবারী। যখনই সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাড়ি ধরেছে তরবারী'র হাতল দিয়ে তাকে আঘাত করেন এবং বলেছেন: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাড়ি থেকে তোমার হাত দূরে সরিয়ে রাখো। উরওয়াহ সেদিকে ফিরে বললো: এ কে? বলা হলো: মুগীরাহ বিন শুবাহ (তিনি মুখ ঢেকে রেখেছিলেন)। অতঃপর সে বললো: হে বিশ্বাসঘাতক! তোমার পোষাক থেকে রক্তের দাগ মুছে গেছে বেশি দিন হয়নি[২]।

তারপর উরওয়াহ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের প্রতি আড়চোখে দৃষ্টিপাত করলো এবং সে প্রত্যক্ষ করলো যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) নাক ঝেড়ে ময়লা অথবা কাঁশি দিয়ে থুথু ফেলেছেন তা সাহাবীদের কারো না কারো হাতেই পড়েছে এবং তা তাঁরা চেহেরায় ও শরীরে মেখেছে। যখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা সকলেই তাঁর নির্দেশ পালনে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। যখন তিনি অযু করেন তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। যখন তিনি কথা বলেন তাঁদের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায় এবং তাঁরা শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি চোখ তুলে থাকায় না। এই অবস্থা দেখে সে খুবই বিস্মিত হলো এবং কুরাইশদের নিকট গিয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করলো যে, হে আমার স্বজাতি বন্ধুরা! আমি অনেক রাজা-বাদশাহ'র দরবারে উপস্থিত হয়েছি। রোম-পারস্যের সম্রাট ও নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি। আমি কোনো প্রজা তাদের রাজাকে এই রকম সম্মান করতে দেখিনি যে রকম মুহাম্মদ (স)'র সাহাবীগণ তাঁকে সম্মান করতে দেখেছি। তোমাদের কাছে যে প্রস্তাবই দেওয়া হোক তা তোমরা গ্রহণ করো তাতেই তোমাদের মঙ্গল[৩]।

৩) হুলাইস বিন আলকামাহ'র দূতালী

পরবর্তীতে কুরাইশ হুলাইস বিন আলকামাহ কিনানী (আহাবীশের নেতা) কে পাঠালো। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে দেখার পর বললেন: এ ধার্মিক গোত্রের লোক এবং বায়তুল্লাহ'র প্রতি খুবই আসক্ত; সুতরাং তোমরা তার সামনেই হাদীগুলো (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দাও এবং উচ্চকণ্ঠে তালবিয়াহ পড়তে থাকো। অতঃপর হুলাইস বিন আলকামাহ কিনানী যখন মুসলিমদের দেখলো যে, তাঁরা ইহরাম পরিহত অবস্থায় আল্লাহ'র ঘরের উদ্দেশ্যে হাদী পাঠিয়ে উচ্চকণ্ঠে তালবিয়াহ পাঠে মগ্ন এবং দীর্ঘসময় ইহরাম অবস্থায় থাকায় এলোমেলো চুল ও পোষাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বুঝা যাচ্ছে। এই রকম একটি দলকে বায়তুল্লাহ'র যিয়ারতে কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা

---

[১]) আবু বকর (র) উরওয়াহকে তার খুনের রক্তপণ প্রদানে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন যা সে উল্লেখ করেছে।

[২]) উরওয়াহ মুগীরাহ বিন শুবাহ (র) কে ইসলাম পূর্ব তাঁর তের ব্যক্তি হত্যার রক্তপণ আদায়ে তার সহযোগিতার কথা স্বরণ করিয়ে দিল।

[৩]) ঘটনাটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে। যেমন: ইব্‌ন সাআদ তাঁর তাবকাত গন্থে, ইব্‌ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে, মুহাম্মদ আল-গাযালী তাঁর ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, ইবন কাসীর তাঁর বিদায়াহ নিহায়াহ গ্রন্থে, ইবন কাইউম তাঁর যাদুল মাআদ গ্রন্থে এবং হুসাইন হায়কাল তাঁর হায়াতে মুহাম্মদ গ্রন্থে। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী'র ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত:২৩১-২৩২।

করাকে ভালো চোখে দেখতে পারেনি এবং হুলাইস বিন আলকামাহ কিনানী কুরাইশদের এই আচরণ বাড়াবাড়ী মনে করে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে না এসে কোনো আলোচনা ছাড়াই ফিরে যায়[১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হুলাইস বিন আলকামাহ কিনানী সমগ্র আরবাঞ্চলে তার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও স্বজাতির মধ্যে তার ঈর্ষানীয় নেতৃত্ব নিয়ে সুপরিচিত এবং তিনি কুরাইশ ও আল্লাহ'র রাসুল (স) উভয়ের কাছেই সম্মানিত। কুরাইশদের আচরণে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে কুরাইশরা তাকে বারবার বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, আপনি মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাথীদের কাছে যা দেখেছেন তা সঠিক নয়, তাদের কৌশল মাত্র; সুতরাং আপনি আমাদেরকে বাধা দিবেন না, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।

আল্লাহ'র রাসুল (স) হুলাইস বিন আলকামাহ কিনানী'র ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র "এ ধার্মিক গোত্রের লোক" মন্তব্য থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং তিনি হুলাইসের বায়তুল্লাহ ও পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারতের পথে তাঁকে রুখে দেয়ার বিষয়টি প্রজ্ঞার সাথে তুলে ধরেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে হুলাইসের মতো সর্বজন সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করছেন, যেমন ইতিপূর্বে উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফীকেও প্রজ্ঞার সাথে প্রভাবিত করেছিলেন। স্বীকার না করলেও দুজনই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মিশরীয় সাহিত্যিক ও বিশষ্ট সিরাতবিদ আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ বলেন: কাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে হয় তা আল্লাহ'র রাসুল (স) নুবুওয়্যতী প্রজ্ঞার মাধ্যমে সর্বাধিক জ্ঞাত বিধায় যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাঁর সাথে আলোচনার পর প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। যদিও মুশরিকরা তা স্বীকার করতো না, যাদু বলে উড়িয়ে দিত[২]।

৪) মুকরিয বিন হাফস ও সুহাইল বিন আমর'র দূতালী

হুদাইবিয়ার যুদ্ধে কুরাইশদের দূতদের মধ্যে মুকরিয বিন হাফসও ছিল। সে ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে তাকে দূত হিসেবে আসতে দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছিলেন:{هذا مكرز وهو رجل فاجر}[এই মুকরিয একজন পাপিষ্ট]। অতঃপর সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে কথা বলতেছিল এমতাবস্থায় দূতালীর জন্য সুহাইল বিন আমরকে দেখে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: {لقد سهل لكم من أمركم}তোমাদের বিষয়টি কিছুটা সহজ হয়ে যাবে][৩] এবং তিনি আরো বলেছিলেন: তারা যখন এই লোক পাঠিয়েছে মনে হয় তারা সন্ধি চায়[৪]। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। নিম্নে সুহাইল বিন আমরের আগমন

---

১) সুলাইম হিজাযী, মানহাজ আল-ইলামু আল-ইসলামী ফী সুলহি আল-হুদাইবিয়াহ, দারুল মানারাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ ইঃ, পৃ:১০৮।

২) আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আবকরিয়্যাতু মুহাম্মদ (স), আল-মাকতাবাহ আল-মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ, কায়রো, ১৯৬৪, পৃ:৪৯।

৩) সহীহ বুখারী [২৭৩২]।

৪) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, সম্পাদনা; ড. মারসিদন জোন্স, আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৫ হিঃ/১৯৮৪ ইং:২/৬০২-৬০৪।

এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তার মধ্যকার সন্ধিনামা প্রণয়নের লক্ষে কথোপকথন উপস্থাপন করা হলো:

তারপর কুরাইশ সুহাইল বিন আমরকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিনামা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট প্রেরণ করে। তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে বলেন যে, আমাদের দুপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হোক। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) চুক্তিনামা লেখককে (সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে আলী (র) সন্ধিনামার লেখক ছিলেন) ডাকলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: লিখো "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" তখন সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো:"রাহমান" সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না সুতরাং তা লেখা যাবে না। তবে লিখো "বিসমিকা আল্লাহুম্মা", মুসলিমগণ বলে উঠলেন: আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ব্যতীত কিছুই লিখবো না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: লিখো "বিসমিকা আল্লাহুম্মা"। তারপর বললেন: এই সন্ধি যাতে সম্মত হয়েছেন মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (বলার) সাথে সাথেই সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো: যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ'র রাসুল (স) হিসেবে জানতাম তাহলে তো আপনাকে আমরা আল্লাহ'র ঘরে আগমনে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে লড়াই করতাম না। তবে লিখো "মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ" আল্লাহর' রাসুল (স) বললেন: তোমরা অস্বীকার করলেও আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)....লিখো"মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ"(সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়: তিনি আলী (র) কে তা মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলে আলী (র) তা মুছতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: স্থানটি আমাকে দেখিয়ে দাও তাঁকে দেখানো হলে তিনি নিজে মুছে ফেলেন) আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আল্লাহ'র ঘরের পথে আমাদের প্রতিবন্ধকতা করবে না আমরা আল্লাহ'র ঘরের তাওয়াফ করবো। সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো: আরবজাতি বলাবলি করবে যে, আমরা চাপের মধ্যে ছিলাম; তাই তা হবে না। হ্যাঁ, তবে আগামী বছর করা যাবে এবং সন্ধিনামা সম্পন্ন করা হলো[১]। নিম্নে সন্ধির প্রধান ধারাগুলো উল্লেখ করা হলো:

১) মুসলিমগণ এই বছর ওমরাহ পালন ব্যতীত মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর তাঁরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাহ আগমন করবেন। তবে তাঁরা তিন দিন মক্কাহ অবস্থান করতে পারবেন। মক্কাহ নগরীতে অবস্থানকালে আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত কোনো অস্ত্র বহন করা যাবে না।

২) কোনো মুসলিম হজ্ব অথবা ওমরাহ পালন অথবা জীবিকা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে মক্কাহ আগমন করলে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। অপর দিকে কুরাইশদের মধ্যে থেকে কেউ জীবিকা অন্বেষণে মিশর বা সিরিয়ার পথে মদীনা অতিক্রম করলে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে।

৩) কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে; তাঁকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে মুসলিমদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

---

[১]) সহীহ বুখারী [২৬৮৯] ও সহীহ মুসলিম [১৭৮৩]।

৪) প্রতিবেশী বেদুঈন গোত্রসমূহ তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো পক্ষের (মুসলিম বা মক্কাবাসী) সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। কেউ কোনোরূপ তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

৫) এই সন্ধি দশ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এই সময়কালে সকল প্রকার যুদ্ধ বা সামরিক উত্তেজনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে[১]।

৬) সন্ধিতে মুসলিমদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন আবু বকর (র), উমর (র), আবদুর রহমান বিন আউফ (র), আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর (র), সাআদ বিন আবী অক্কাস (র), মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ (র) এবং সন্ধিনামা'র লেখক আলী বিন আবী তালিব (র)। অপর দিকে মুশরিকদের পক্ষে মিকরায বিন হাফস ও সুহাইল বিন আমর স্বাক্ষর করে। সন্ধিতে উভয় পক্ষের মধ্যম হিসেবে ছিল কুরাইশদের মিত্র এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকটও সৎ হিসেবে পরিচিত আল-হুলাইস বিন আলকামাহ আল-হারেসী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দশ বছরের জন্য সন্ধি হলেও সন্ধি স্থায়ী ছিল শুধুমাত্র দুই বছর। এরই মধ্যে কুরাইশদের কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের মিত্র খুযাআহ গোত্রের বিরুদ্ধে বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে এবং তারা খুযাআহ গোত্রের ওপর এক রাতে অতর্কিত হামলা করে বিশ জন লোককে হত্যা করে। এই কর্মকান্ডকে সরাসরি সন্ধির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষে মক্কাহ বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করার পথ সুগম হয়। এই সন্ধি বা চুক্তি পরবর্তীতে ইসলামী চুক্তিসমূহের মৌলিক ভিত্তি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের জন্য বিরল আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক কঠিন ও কিছু অসঙ্গত শর্তও মেনে নিলেন। তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো যে, কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে তাঁকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে মুসলিমদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না। মুসলিমগণ বলতে লাগলেন: সুবহানাল্লাহ! মুসলিম হয়ে আগমন করার পর কীভাবে তাঁকে মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে? অতঃপর সবাই আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন: আমরা এটি লিখবো? আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: "হ্যাঁ। যে আমাদের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূর করবে এবং তাদের পক্ষ ত্যাগ করে যে আমাদের কাছে আসবে শীঘ্রই আল্লাহ তাঁর জন্য কোনো পন্থা বের করে দিবেন"[২]।

সন্ধির ফলাফল ও তাৎপর্য

প্রথম: এই সন্ধিস্থাপন থেকে প্রমাণিত হলো যে, মক্কাহ'র পৌত্তলিকরা মুসলিমদের ইতিপূর্বে কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা মুসলিমদেরকে পাত্তাই দেয়নি। তবে এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদেরকে সমকক্ষ শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪২৫১] ও সহীহ মুসলিম [১৭৮৩]।

[২]) সহীহ বুখারী[৪২৫১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবন কাইউমের যাদুল মাআদ, মুবারকপুরী'র আর-রাহীকুল মাখতুম এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী'র আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ।

কারণ সমকক্ষ ব্যতীত কখনো দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয় না। কুরাইশদের এই স্বীকৃতি প্রতিবেশী বেদুঈন আরব গোত্রগুলোর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়: এই সন্ধির ফলে মুশরিক ও মুনাফিকদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হয়; অনেকেই দিনশেষে মুসলিমদের বিজয়ের প্রতি আশ্বস্ত হয়। যার ফলে খালিদ বিন অলীদ ও আমর বিন আল-আস'দের মতো শক্তিধর কুরাইশ ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসেন এবং প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

তৃতীয়: এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) নির্বিঘ্নে চতুর্দিকে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে সুযোগ পান এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মদীনার বাইরের বিভিন্ন আরব গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। উপরন্তু এই সন্ধি প্রতিবেশী বেদুঈন আরব গোত্রগুলোকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সম্পর্ক ও মিত্রতা স্থাপন করার প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে খুযাআহ গোত্র মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন অপর পক্ষে বনু বকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

চতুর্থ: এই সন্ধির শর্তানুযায়ী মক্কাহ থেকে আগত নবদীক্ষিত মুসলিমদের আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাবাসীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন; সুহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল ও তাঁর সাথীরা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে এই নবদীক্ষিত মুসলিমগণ যেকোনো প্রকারে প্রহরীদের কাবু করে মক্কাহ ফেরত যাওয়ার পরিবর্তে লোহিত সাগরের (সাইফুল বাহর) তীরবর্তী "ইস" নামক এক জঙ্গলে আত্মগোপন করে সেখানে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের জীবন-জীবিকা পরিচালনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হতে প্রত্যাগত মক্কাহ'র ব্যবসায়ী দলের ওপর আক্রমণ করে দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করতে লাগলেন; যা মক্কাবাসীর জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী পর্যায়ে তারা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে এই ধারা বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উক্ত ধারা রহিত করা হয়। যার ফলে নবদীক্ষিত মুসলিমগণ মদীনায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পান।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রচেষ্টা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মক্কাহ নগরীকে সবার জন্য নিরাপদ শহর হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং উক্ত শহরে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রথম ঘর নির্মাণ করেছেন। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ }[নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কাহ) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়][১]। পৃথিবীর সকল প্রান্তরের মানুষের জন্য এই ঘরে আগমন উন্মুক্ত হলেও মুসলিমদের জন্য এই ঘরে আগমন উন্মুক্ত ছিল না। কুরাইশরা এই ঘরে মুসলিমদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে যার বর্ণনা কুরআন করীমে এসেছে:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ

---

১) সূরাহ আলে ইমরান:৯৬।

يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[তারা সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ'র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহ'র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা তারা পারে। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে; দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে][১]।

অনুরূপভাবে বায়তুল্লাহ'র সম্মান রক্ষা ও মক্কাহ নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ সম্পর্কে কুরআন করীমে আরো বর্ণিত হয়েছে:{ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ}[আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের ওপর আযাব প্রদান করবেন না; যারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধা প্রদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। আর কাবাহ'র নিকট তাদের ইবাদাত বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ছিল না। অতএব, এবার তোমরা নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ'র পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে][২]। অতঃপর মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করা কখনো সম্ভব নয়; তবে কুরাইশরা যদি মুসলিমদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং মসজিদে-হারামে যেতে বাধা প্রদান করে তখন বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যুদ্ধের অনুমোদন রয়েছে।

তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ হুদাইবিয়ায় যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র মসজিদে-হারামে আগমনের অবরোধ ভেঙ্গে ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক ছিলেন। মুসলিমগণ মুহরিম (ইহরাম পরিহিত) ছিলেন এবং তাঁরা কুরবানীর পশুও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও কুরাইশরা তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে জোরপূর্বক তাঁদের রুখতে প্রস্তুতি নিল এবং মুসলিমদের সামনে একদল যোদ্ধা দাঁড় করিয়ে দিল। আল্লাহ'র রাসুল (স) ভালোভাবে জানতেন পবিত্র মক্কাহ নগরীতে প্রবেশে বাধাসৃষ্টিকারী এই

---

১) সূরাহ আল-বাকারাহ:২১৭।

২) সূরাহ আল-আনফাল:৩৪-৩৬।

যোদ্ধাদের হটিয়ে পবিত্র মক্কাহ নগরীতে প্রবেশের অধিকার ও শক্তি দুটোই তাঁর রয়েছে। তবে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা শান্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত বিধায় তিনি অন্য পথ গ্রহণ করলেন; যাতে কুরাইশদের মুখোমুখী না হতে হয়। তাঁর সাহাবীদের কেউ তাঁকে এক কঠিন ও সঙ্কীর্ণ রাস্তার পথ দেখালেন যা হুদাইবিয়া অঞ্চল হয়ে পবিত্র মক্কাহ নগরী'র দিকে প্রসারিত; অথচ এখানেও কুরাইশরা তাঁদের বিরুদ্ধে মসজিদে-হারামে আগমনে বাধা সৃষ্টি করলো। এখানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সেই অপূর্ব বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) এরশাদ করেন:{يا ويح قريش!! لقد أهلكتكم الحرب}[ধ্বংস হে কুরাইশ!! তোমাদেরকে তো যুদ্ধ নিঃশ্বেষ করে দিয়েছে][১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই রকম অযৌক্তিক ও কঠিন শর্ত মেনে নেয়ায় মুসলিমদের ক্ষোভ চরমে পৌঁছে যায়; এমনকি কেউ কেউ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মানতে সহজভাবে সম্মত ছিল না। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) দুঃখ ও রাগ করে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমা'র তাবুতে প্রবেশ করে বলেন: "মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে; যারা তাঁদের নবীর নির্দেশ অমান্য করবে"[২]। অতঃপর সূরাহ "আল-ফাত্হ" অবতীর্ণ হলো এবং হুদাইবিয়া'র সন্ধির মাধ্যমে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো তাতে রয়েছে মুসলিমদের জন্য বড় বিজয় এবং উক্ত শান্তি প্রতিষ্ঠাকে কুরআন করীমে "প্রকাশ্য বিজয়" বলে বর্ণনা করা হয়, এরশাদ হচ্ছে:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا}[নিশ্চয় আমরা আপনার জন্যে একটা প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমসূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করেন][৩]। হুদাইবিয়া'র সন্ধি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধনীতি ও আদর্শ আমাদের প্রদান করে যা নিম্নরূপ:

১) যতদূর সম্ভব শত্রুর সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে চলা এবং যুদ্ধে জড়ানোর সম্ভবপর সকল বিকল্প পথ অবলম্বল করা প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) এরশাদ করেছেন "হে মানবজাতি তেমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার কামনা করো না; আল্লাহ'র কাছে নিরাপদে থাকার প্রার্থনা করো। তবে শত্রুর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রেখো তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত নিহিত"[৪]।

২) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে সম্ভবপর সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা তাতে নিজেদের সামান্য অসম্মান হলেও যদি তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়া'র সন্ধির প্রাক্কালে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের জোরালো আপত্তি সত্ত্বেও বেশকিছু অসম শর্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেনে নিয়েছিলেন।

৩) রক্তপাত এড়িয়ে যেতে সকল পন্থা গ্রহণ করা যদিও তা মুসলিম সেনাবাহিনীর মেনে নিতে কষ্ট হয়।

---

[১]) সহীহ বুখারী [২৭৩১] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৪৮৭২] আরো দেখুন: হুসাইন হায়কাল,হায়াতে মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত,পৃ: ৩৫৬।

[২]) সহীহ বুখারী [৪১৭৮] ও [২৫৮৩] এবং সুনান আবী দাউদ [২৭৬৫]।

[৩]) সূরার আল-ফাত্হ:১-২।

[৪]) বুখারী [২৯৬৫ ও ৩০২৪]।

৪) অবশ্যই শান্তিময় জীবন-যাপন রনাঙ্গনের রক্তপাতের ওপর সব সময় সকলযুগে প্রাধান্য পাবে।

৫) রক্তপাত ও যুদ্ধ এড়াতে শত্রুর সাথে শান্তি-চুক্তি করা ইসলামে শুধু বৈধ নয় উত্তমও বটে।

৬) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অথবা দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শান্তির দূতদের/প্রতিনিধিদের হত্যা শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে দেয়। প্রতিনিধিদের হত্যার কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়া অঞ্চলে সমগ্র মুসলিমদের পক্ষ থেকে বায়আত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেন যখন কুরাইশ কর্তৃক আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতিনিধি উসমান (র) কে হত্যার সংবাদ প্রচারিত হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরাইশদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে উসমান (র)'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও অতি ভদ্র হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে কুরাইশদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) উমর (র)'র পরামর্শে তাঁকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন[১]।

হুদাইবিয়ার সন্ধির উপদেশ ও শিক্ষা

১) হুদাইবিয়া'র সন্ধিকে মক্কাহ বিজয়ের চাবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক ইসলামী গবেষকের মতে হুদাইবিয়া'র সন্ধির মাধ্যমে মূলত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে মক্কাহ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিলেন। এটি মহান রাব্বুল আলামীনের চিরাচরিত নীতি যে, কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদিকে ভূমিকারূপে প্রকাশ করেন। পরে সঠিক সময়ে মূল বিষয়ের অবতারণা করা হয়; যেন উক্ত বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় যা ইসলামী দাওয়াতের মৌলিক পদ্ধতিও বটে[২]।

যদিও সাহাবীদের অনেকেই প্রথমত এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি; কারণ ভবিষ্যত তাঁদের সম্মুখে উহ্য ছিল; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। তবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবীদের নিকটও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। পাশপাশি এই সন্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ নিরাপত্তা অনুভব করেন এবং মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করার সুযোগ পান। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, তাদেরকে কুরআন করীম শুনান, তাদের সাথে ইসলাম সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিয়ে খোলা মনে পর্যালোচনা করার সুযোগ পান এবং যাঁরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এতদিন নিজেদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেননি তাঁরাও প্রকাশ্য হন।

ইব্ন শিহাব যুহরী'র বরাতে ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"হুদাইবিয়া'র সন্ধির পূর্বে ইসলামে এর চেয়ে বড় বিজয় সাধিত হয়নি;এর পূর্বে সর্বত্র যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল। উক্ত সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধাবস্থার সমাপ্তি ঘটে। সাধারণ জনগণ নিরাপত্তার স্বাদ উপলব্ধি করেন এবং মুসলিমগণ যেখানেই অমুসলিমদের সাথে

---

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন দেখুন: ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত: ২/১১৪ ও মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৩২৪।

[২]) ইব্নুল কায়উম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১১৫।

মিলিত হতেন ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরতেন। অমুসলিমরা বুঝে-শুনে ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করতে থাকে। এ দুবছরে ইসলামে প্রবেশকারীদের সংখ্যা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের চেয়ে কম নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রতীয়মান হয়"[১]। তাই কুরআন করীম উক্ত সন্ধিকে "সুস্পষ্ট বিজয়" বলে উল্লেখ করেছে:{ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا}[নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দেখানো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশকর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়][২]।

২) মহান রাব্বুল আলামীন এই সন্ধির মাধ্যমে অহী ও মানবকৌশলের মধ্যকার পার্থক্য উন্মোচন করেন। আল্লাহ'র প্রেরিত রাসুলের শক্তি ও প্রতিভা চিন্তানায়কের প্রজ্ঞার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করেন। ঐশী প্রত্যাদেশ ও পার্থিব কারণসমূহে নিহিত তৎপরতার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেন যে; মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে পৃথিবীর সকল চিন্তানায়কের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার উর্ধ্বে অবস্থান করে বিজয় প্রদানের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন:{ وينصرك الله نصرا عزيزا}[আল্লাহ আপনাকে এক বিরল বিজয়ে ভুষিত করবেন][৩]। সুতরাং অমুসলিমরা যা শর্ত দিয়েছে আল্লাহ'র রাসুল (স) সবই মেনে নিয়েছেন; যার মধ্যে কিছু অযৌক্তিক ও অসম শর্তও ছিল যা মেনে নেওয়ার কারণে উমর (র)'র মতো বায়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী'র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাময় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) এবং তাঁর অবাধ্য নই এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। তিনি উসমান (র) কে মক্কাহ নগরীতে কুরাইশদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণের সময় যে উপদেশ দিয়েছিলেন; এতে আরো স্পষ্ট হয় যে, তিনি মক্কাহ'র মুসলিম নর-নারীদের নিকট তাঁর আগমন বার্তা শুনিয়ে তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এমন অসম সন্ধি সম্পাদনে বিস্মিত হয়ে পড়েন; যা তাঁদের চিন্তা ও বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারেননি এবং অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী এই সন্ধিকে কুরাইশদের কাছে আল্লাহ'র রাসুল (স) তথা বাতিলের কাছে সত্যধর্মের এবং মিথ্যার নিকট সত্যের নত হওয়া বলে ধারণা করেছিলেন বিধায় বারবার আল্লাহ'র রাসুল (স) কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) এই সন্ধিকেই মুসলিমদের মহাবিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে সূরাহ আল-ফাত্হ পাঠ করে শুনানোর পর তাঁদের সকল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কেটে যায় এবং সকলেই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সম্পাদিত সন্ধির প্রতি আনুগত্য ও সম্মতি প্রদান করে ধন্য হন।

তবে বিশেষ করে সন্ধির এই ধারা "কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে তাঁকে

---

[১]) সীরতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/৮৫ ও সীরতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:৩/৩০৫।

[২]) সূরাহ আল-ফাতহ:২৭।

[৩]) সূরাহ আল-ফাতহ:৩।

কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুসলিমদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না" সম্পর্কে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমরের সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ঐকমত্য পোষণ করা সাহাবীদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। সেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো বৃদ্ধি পায় যখন আবু জান্দাল [কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমরের পুত্র] ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাহ থেকে পালিয়ে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দিকে এগিয়ে এসে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জামার অগ্রভাগ ধরে বলতে লাগলো: "হে মুহাম্মদ (স)! এ তোমার নিকট আসার পূর্বে আমার ও তোমার মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন তুমি সঠিক বলেছ এবং তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জামা ধরে ঝাঁকি দিতে লাগলো। অন্যদিকে আবু জান্দাল চিৎকার করে বলতে লাগলেন: হে মুসলিমগণ! আমার দ্বীনের বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলতে ও শাস্তি প্রদানের জন্য কী আমাকে মুশরিকদের হাতে তুলে দেয়া হবে? অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হে আবু জান্দাল! তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং মনে রেখো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার এবং তোমার সাথে আরো যারা অসহায় রয়েছে তাদের জন্য একটি পন্থা অবশ্যই বের করবেন। আমরা তাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছি। অসুতরাং আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না][১]। অতঃপর তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ এই দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন।

তারপর কী হলো? আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মদীনা পৌঁছার পর আবু বাসীর নামের আরো একজন কুরাইশ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা আগমন করলে কুরাইশ তাঁকেও ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দুজন লোক পাঠায়। অতঃপর তাঁকেও ফিরিয়ে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে আবু বাসীরকে নিয়ে কুরাইশদ্বয় যুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে পৌঁছলে আবু বাসীর তাদের অবচেতনে একজনের তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলে অপর জন পালিয়ে যায়। অতঃপর আবু বাসীর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট ফিরে এসে বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন। আপনি আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রতীরবর্তী 'সাইফুল বাহর' নামক স্থানের দিকে রওনা দিলেন[২]। অতঃপর সেই স্থান মক্কাহ ফেরত নবমুসলিমদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হলো এবং মক্কাবাসীর কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সে মক্কাহ ত্যাগ করে আবু বাসীর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতেন। এভাবে সেখানে এক বড় বাহিনী গড়ে উঠলে তাঁরা মক্কাহ'র বণিকদল সিরিয়া হতে মক্কাহ প্রত্যাবর্তনকালে তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে লাগলেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসী তাদের আচরণে অতীষ্ট হয়ে সন্ধির এই ধারা বিলুপ্ত করে তাঁদের মদীনায় অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ জানালে তাঁদেরকে মদীনায়

---

১) সহীহ বুখারী [৪০২৯]। সীরতে ইব্‌ন ইসহাক ও সীরতে ইব্‌ন হিশামসহ সকল সীরাহ গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী'র আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ও সফিউর রহমান মুবারকপুরী'র আর-রাহীকুল মাখতুম।

২) সহীহ বুখারী [৪৭৩২]।

ফিরিয়ে আনা হয়[১]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই আবু জান্দাল মক্কাহ বিজয়ের সময় তাঁর পিতার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাঁকে আশ্রয় প্রদান করা হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন[২]।

৩) হুদাইবিয়া'র সন্ধির তাৎপর্যসমূহের অন্যতম হলো যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মক্কাহ বিজয়কে তাঁর রাসুল (স)'র জন্য যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিজয় নয়; বরং শান্তি ও রাহমতের বিজয়রূপে নির্ধারণ করেছেন। যে বিজয়ে সাধারণ জনগণ প্রতিযোগিতার সাথে তাঁর দ্বীনের দিকে এগিয়ে আসবে এবং আরবাঞ্চলের প্রতিটি জাতি-গোত্র ইসলামের ছায়াতলে নিজ ধর্ম, জীবন, সম্মান, সম্পদ ও চিন্তা-চেতনার নিরাপত্তা উপলব্ধি করে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরও গ্রহণ করা হবে যারা অতীত জীবনে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে লাঞ্ছিত করেছে, অপমান করেছে, নিজের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং প্রবাসেও তাঁকে নিঃশ্বেষ করে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে এবং তারাও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি শান্তির বার্তা নিয়ে আসবে। অতঃপর তাঁর কাছে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের হাতকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করবে। অনুতপ্ত হয়ে কুরাইশ তাঁর মাঝে অনুপ্রেরণা ও জাগ্রত অনুভূতির সন্ধান করবে।

হুদাইবিয়া'র সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান

হুদাইবিয়া'র সন্ধির তাৎপর্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিষয়াদি রয়েছে যা দৃশ্যত স্বাভাবিক না হলেও আল্লাহ'র রাসুল (স) গ্রহণ করেছেন বিধায় পরবর্তীতে তা ইসলামী শরীয়াহ'র বিধানরূপে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর কিছু নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) যুদ্ধ ছাড়া অন্য বিষয়ে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ: আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশ্‌র বিন সুফয়ানকে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বিশ্‌র বিন সুফয়ান খুযাআহ গোত্রের একজন অমুসলিম যুবক ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। উক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, অমুসলিমদের সহযোগিতা অনেকটা স্থান-কাল ও ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার পর যুদ্ধ ব্যতীত অন্য বিষয়ে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন সংবাদ সংগ্রহ, সামরাস্ত্র দ্বার ও পথ প্রদর্শনের মতো বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ'র রাসুল (স) হিজরতের রাত্রি অতি স্পর্শকাতর সময়ে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত বা আরকাতকে আবু বকর (র)'র পরামর্শে পথপ্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন[৩]। তবে শান্তিপূর্ণ বিষয়াদিতে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণের বৈধতা ইসলামে অনুমোদিত; তবে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া গেলে যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে অনেক গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে হুনায়নের

---

[১]) সহীহ বুখারী [২৭৩১] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৪৮৭২]।

[২]) আল-ইসাবাহ, প্রাগুক্ত:৪/২৪।

[৩]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৪।

যুদ্ধে অনেক অমুসলিমও অংশ নিয়েছিল। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ হুনায়নের যুদ্ধের আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে, ইন শা আল্লাহ।

২) ইসলামে পরামর্শের ধরণ-প্রকৃতি: সকল প্রকার কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সকল প্রকার কার্যক্রমে পরামর্শের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বিধায় পরামর্শ বা "শুরা" ইসলামী শরীয়তে অপিরহার্যতা লাভ করেছে; তবে সমরনায়ক বা প্রশাসকের জন্য সবক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক নয়। কারণ পরামর্শ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন মতামত যাচাই-বাছাই করে কল্যাণকর একটি পন্থার অনুসন্ধান করা। সুতরাং পরামর্শের ভিত্তিতে বেরিয়ে আসা মতামতের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ'র আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি সমরনায়ক বা প্রশাসক আশ্বস্ত হতে পারেন তাহলে উক্ত পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে; অন্যথায় সমরনায়ক বা প্রশাসকের নিজের ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। তবে অবশ্যই তা সরাসরি কুরআন-সূন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐকমত্যের বিরোধী না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়া'র বিষয়ে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছেন। আবু বকর (র) পরামর্শ দিয়েছেন যে "নিশ্চই আপনি বায়তুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। অতঃপর আপনার উদ্দেশ্যে আপনি এগিয়ে চলুন। যে আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তার সাথে আমরা যুদ্ধ করবো"। আল্লাহ'র রাসুল (স) যাত্রার প্রথমার্ধে তা গ্রহণ করে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং যখন তাঁর উষ্ট্রী থেমে যায়; অতঃপর তিনি বুঝতে পারেন যে, এ যাত্রা প্রায় অসম্ভব। তখন তিনি আবু বকর (র)'র পরামর্শ ত্যাগ করে ঘোষাণা দেন "যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আল্লাহ'র অমর্যাদা না হয় মতো তারা যে শর্তই প্রস্তাব করুক তা আমি মেনে নিব"[১]। তখন বিষয়টি আবু বকর (র)'র পরামর্শের পরিবর্তে কুরাইশদের শর্তে সন্ধির দিকে মোড় নেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ'র রাসুল (স) কারো পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেননি এবং তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে কোনো ব্যাখ্যাও প্রদান করেননি। এটি হলো অহী বা বর্তমান যুগে কুরআন-সূন্নাহ'র আলোকে ইসলামী শরীয়তে পরামর্শ বা শুরা'র বিধান যা ইসলামী শরীয়তে বৈধতা পেয়েছে বিভিন্ন মতামত যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে, কোনো মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়।

৩) রাসুল (স)'র নিদর্শনকে পুণ্য জ্ঞান করা: উরওয়াহ বিন মাসউদ আড়চোখে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের দেখতে পেলো যে,{ فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له}[যখনই তিনি নাক ঝেঁড়েছেন তা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে পড়েছে এবং যার হাতেই পড়েছে সে তা মুখে ও শরীরে মেখে নিয়েছে। যখন তিনি নিদের্শ প্রদান করেন তারা সেই নিদের্শ পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যায়, যখন তিনি অযু করেন তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহে মহা প্রতিযোগিতা লেগে যায়। যখন তিনি কথা বলেন সকলেই তাদের স্বর নিচূ করে নেয় এবং

---

[১]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৬।

সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের লক্ষেই তাঁর দিকে নত চোখে তাকান]"[১]। এটি প্রাণবন্ত ও পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল দৃশ্য যা উরওয়াহ বিন মাসউদ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসা ও ভক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। এই বিরল ঘটনা মুসলিম জাতির জীবনের পাথেয় হিসেবে বেশ কিছু বার্তা বহন করে:

ক) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ভালোবাসা ছাড়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রদর্শন করা কখনো সম্ভব নয় এবং আনুগত্যহীন ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই; তবে আনুগত্য মানুষকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে বাধ্য করে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি তাঁর সাহাবীদের আনুগত্যসহকারে ভালোবাসার দৃশ্যের উরওয়াহ বিন মাসউদ বর্ণনা দিয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা আবু তালিব সারা জীবন তাঁকে আনুগত্যহীন ভালোবাসলেও ইসলামে সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

খ) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিদর্শনকে বরকতময় জ্ঞান করার বৈধতার বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবীদের অনেকেই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুল, ঘাম, অযুর ব্যবহৃত পানি, থুথু ও পানি পান করার পাত্র বরকতময় জ্ঞান করে সংরক্ষণ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুল-দাড়ি, থুথু, ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ করে আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করা ইসলামী শরীয়াহ মতে বৈধতার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। এ বিষয়ে আমাদের সমাজে ভিত্তিহীন বিভিন্ন কুসংস্কার চালু আছে; যার সাথে ইসলামী শরীয়াহ'র কোনো রকম সম্পৃক্ততা নেই। এ বিষয়ে শরীয়তের সঠিক বিধান নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

আল্লাহ'র নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যদি কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হয়; তবে তা অবশ্যই তাঁর প্রণীত নীতিমালা ও তাঁর প্রেরিত রাসুল (স)'র প্রদর্শিত পন্থার আলোকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون }[হে মুমিনগণ! আল্লাহকে তাকওয়া করো, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো][২] উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত "অসীলাহ"র অর্থ নির্ধারণে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরবিদগণ ও ইসলামী গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপরিউক্ত আয়াতে "অসীলাহ" সম্পর্কে কী বুঝানো হয়েছে তা অনুধাবন করার জন্যে নিম্নে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করা হলো:

প্রথমত: ব্যক্তি বিশেষকে অসীলাহ গ্রহণ

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত "অসীলাহ"থেকে ব্যক্তি বিশেষকে আল্লাহ'র নৈকট্য অন্বেষণের পন্থা (অসীলাহ) হিসেবে গ্রহণ করা যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) অথবা কোনো আল্লাহ'র অলী বা সৎ লোককে আল্লাহ'র নৈকট্যলাভে অসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে

[১]) সহীহ বুখারী [২৭৩১] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৪৮৭২]। সীরতে ইব্ন ইসহাক ও সীরতে ইব্ন হিশামসহ সকল সীরাত গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণীত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৩৭-২৩৯।

[২]) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৩৫।

কতটুকু স্বীকৃত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে এর পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

১) আল্লাহ'র নৈকট্য অন্বেষণে সৎ ও একনিষ্ঠ আল্লাহ'র বান্দাদের পন্থা (অসীলাহ) হিসেবে গ্রহণ করা সাহাবীদের মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং তা আরবসমাজে ইসলাম পূর্ববর্তী সময়েও বিদ্যমান ছিল। বিশেষকরে আরবজাতি অনাবৃষ্টির সময় সৎ ও একনিষ্ঠ আল্লাহ'র বান্দাদের অসীলাহ করে আল্লাহ'র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতো এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক সময় এই রকম দোয়ার কারণে বৃষ্টিও হয়েছে; যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর শিশু পৌপুত্র আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ করে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন[১]।

২) একদা আরবে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে কুরাইশরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বৃষ্টির প্রার্থনা করতে বললে তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিঠ কাবাহ'র সাথে লাগিয়ে অসীলাহ করে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আকাশে কোথাও কোনো মেঘ ছিল না। অতঃপর ধীরে ধীরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অতঃপর আবু তালিব নিম্নোক্ত পঙক্তি উচ্চারণ করেন:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل

[অনাথ-অসহায়দের তত্ত্বাবধায়ক ও বিধবাদের সম্ভ্রম রক্ষক পরিচ্ছন্ন চেহার'র মাধ্যমে বৃষ্টির প্রার্থনা করা হচ্ছে][২]।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পর অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রথমে ইসতিসকা'র দু'রাকআত নামায আদায় করেন, অতঃপর হাত তুলে বৃষ্টির প্রার্থনা করেন এবং প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন যে; আবু তালিব বেঁচে থাকলে খুবই খুশী হতেন এবং বললেন: কে আবু তালিবের পঙক্তিটি বলতে পারবে? আলী (র) উপরিউক্ত পঙক্তি উচ্চারণ করে বলেন যে, আপনি মনে হয় এই পঙক্তিটির কথা বলছেন[৩]।

৪) খলীফা উমর (র)'র খিলাফতকালে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা আব্বাস (র) কে অসীলাহ করে বৃষ্টির প্রার্থনা করেছিলেন{ أللّهمّ إنّا كنّا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقنا. قال: فيسقون }[হে আল্লাহ! আমাদের নবী (স)'র অসীলায় আমরা বৃষ্টির প্রার্থনা করতাম। অতঃপর তুমি আমাদের বর্ষাতে এবং আমাদের নবী (স)'র চাচার মাধ্যমে বৃষ্টির প্রার্থনা করছি; সুতরাং তুমি আমাদের বর্ষাও। বর্ণনাকারী বলেছেন: অতঃপর বৃষ্টিপাত হয়][৪]।

৫) বৃষ্টির প্রার্থনা ছাড়াও সরাসরি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করার ঘটনাও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপস্থিতিতে এক অন্ধ সাহাবী তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ করে আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁকে

---

[১]) ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:২/৩৮৯ এবং দালায়িলু আন-নুবুওয়্যাহ, প্রাগুক্ত:২/১২৬।

[২]) সহীহ বুখারী [১০০৮ ও ১০০৯] ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:২/৪৯৪।

[৩]) সহীহ বুখারী [৯৭৭]। ইরশাদুস-সারী, প্রাগুক্ত: ২/৩৩৮।

[৪]) সহীহ বুখারী [৯৫৪ ও ৩৪৩৪]।

নিষেধ করেননি{عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يكشف عن بصري ، فقال : فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قال: (اللّهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي}[উসমান বিন হুনাইফ থেকে বর্ণিত যে, এক অন্ধ সাহাবী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট উপস্থিত হলেন,তাঁর সাথে সহাবীগণের একটি দল ছিল। অতঃপর লোকটি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর অভিযোগ করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে ধৈর্যের পরামর্শ দেন। অতঃপর লোকটি বললেন: আমাকে পরিচালনা করার কেউ নেই এবং দৃষ্টি হারানোটা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) অযুর পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং লোকটি অযু করলেন তারপর দু'রকআত নামায আদায় করলেন, তারপর বললেন: হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ (স)'র [রাহমতের নবী] মাধ্যমে তোমার নিকট স্বরণাপন্ন হলাম। হে মুহাম্মদ (স)! আমি আপনার মাধ্যমে আমার পালনকর্তার নিকট স্মরণাপন্ন হলাম আমার সমস্যা নিয়ে যেন তা পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপরে তুমি তার সুপরিশ কবুল করো][১]। ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবী উসমান বিন হুনাইফ (র) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র শপথ! আমরা ঐ বৈঠক ত্যাগ করিনি লোকটি আমাদের বৈঠকে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে অন্তর্ভূক্ত হলেন[২]।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুকে অসীলাহ করা

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণীত "অসীলাহ" থেকে ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুকে আল্লাহ'র নৈকট্যলাভে অসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করা; যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) অথবা কোনো আল্লাহ'র অলী বা সৎ লোকের চুল, দাড়ি, নখ বা কারো ব্যবহৃত বস্তুবিশেষকে আল্লাহ'র নৈকট্যলাভে অসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে কতটুকু স্বীকৃত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে এর পর্যালোচনা করা হলো:

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হুদাইবিয়া'র সন্ধির প্রাক্কালে সংঘটিত ঘটনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণীত যে, কুরাইশ প্রতিনিধি উরওয়াহ বিন মাসউদ আড়চোখে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের দেখতে পেল যে,{فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له}[যখনই তিনি নাক ঝেঁড়েছেন তা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে পড়েছে এবং যার হাতেই পড়েছে তিনি তা মুখে ও শরীরে মেখে নিয়েছেন। যখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা সেই নির্দেশ পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন, যখন তিনি অযু করেন তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়, যখন তিনি কথা বলেন সকলেই তাঁদের স্বর নিচু করে নেন এবং সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যেই তাঁর দিকে নত চোখে তাকান][৩]। এটি পৃথিবীর

[১]) তিরমিযী [৩৫৭৮] ও নাসাঈ ও বায়হাকীসহ অনেক হাদীসবিদগণ নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধ বরাতে বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সত্যায়িত করেছেন।

[২]) সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৯-২৪১।

[৩]) সহীহ বুখারী [২৭৩১]। সীরতে ইব্ন ইসহাক ও সীরতে ইব্ন হিশামসহ সকল সীরাত গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৩৭-২৩৯।

ইতিহাসে একটি প্রাণবন্ত ও বিরল দৃশ্য যা উরওয়াহ বিন মাসউদ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসা ও ভক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। এই বিরল ঘটনা মুসলিম জাতির জীবনের পাথেয় হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুল-দাড়ি, থুথু অথবা ব্যবহৃত আসবাবপত্রকে অসীলাহ করে আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করা ইসলামী শরীয়াহ মতে বৈধতার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। এ বিষয়ে আমাদের সমাজে ভিত্তিহীন বিভিন্ন কতিপয় কুসংস্কারও চালু আছে যার সাথে ইসলামী শরীয়াহ'র কোনো রকম সম্পৃক্ততা নেই। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুল, ঘাম, অযুর ব্যবহৃত পানি, থুথু ও পানি পান করার পাত্র বরকতময় জ্ঞান করে সংরক্ষণ করার বৈধতা থাকলেও আল্লাহ'র নিকট কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এগুলোকে অসীলাহ করে প্রার্থনা করা ইসলামী বিধান মতে স্বীকৃত নয়। কারণ আসহাবে রাসুল (স)'র জীবনচরিত থেকে এর সমর্থনে কোনো প্রকার বর্ণনা ইতিহাসে নেই। তাছাড়া এ বিষয়গুলোর নিজস্ব কোনো শক্তিও নেই; যা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যাবে।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, মূসা (আ) ও হারুন (আ)'র স্মৃতি বিজড়িত কুরআন করীমে বর্ণীত "তাবুত"র যদি শক্তি থাকতে পারে তাহলে যাকে অসীলাহ করে বনু ইসরাঈল বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করে সফলকাম হয়েছিল, যেমন কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:{ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[বনু ইসরাঈলকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা (আ), হারুন (আ) এবং তাঁদের সন্তানবর্গের কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতাগণ। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিত পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে][১] যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুল-দাড়ি, থুথু অথবা ব্যবহৃত আসবাবপত্রকে অসীলাহ করে কেন আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করা যাবে না? সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে।

এর উত্তরে বলা যায় যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান; কোনো বিষয়কে এর অন্তর্ভূক্ত করতে হলে সেই বিধানের মূলভিত্তি অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর সমর্থন অপরিহার্য। সাধারণ কোনো বিষয়কে বিরল কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে ইসলামী শরীয়তের বিধান হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। কারণ বিরল কোনো ঘটনার সাথে কোনো বিধান সম্পৃক্ত হলে তা উক্ত ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অন্য কোনো বিষয় এর সাথে তুল্য নয়। তাছাড়া বনু ইসরাঈলের তাবুত সম্পৃক্ত বিষয়ে তাদের নবীর নির্দেশনা ছিল যা আল্লাহ'র নির্দেশরূপে প্রমাণিত ও গণ্য করা হয়েছে। এই রকম অনেক ঘটনা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবদ্দশাতেও ঘটেছে; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মুজিযা বা অলৌকিক শক্তি হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

---

[১]) সূরাহ আল-বাকারাহ:২৪৮।

শুধু তাই নয় সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ বস্তু "হাজরে আসওয়াদ" যার চুম্বন ও স্পর্শে মানবসন্তান পাপমুক্ত হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সেই পাথর সম্পর্কে খলীফা উমর (র)'র আকীদাহ ও বিশ্বাস; যা তিনি হজ্ব আদায়ের প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে গিয়ে বলেন:"আল্লাহর শপথ! আমি জানি তুমি একটি পাথর ব্যতীত কিছুই নয়, লাভ-ক্ষতি তুমি কিছুই করতে পারবে না; তবে আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তোমাকে চুম্বন করতে দেখেছি বিধায় আমিও তোমাকে চুম্বন করছি, না হলে তা করতাম না"[১]। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কারো স্মৃতি বিজড়িত বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ'র নিকট পার্থনা করা বা অসীলাহ করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।

তৃতীয়ত: মানবজাতির সৎ কর্মকে অসীলাহ করা

কুরআন করীমে আলোচিত অসীলাহ থেকে ব্যক্তি ও কোনো বস্তু নয়; বরং সৎকর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে "আমলে সালেহ বা পুণ্যময় কর্ম"কে বুঝানো হয়েছে যা অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের অভিমতও বটে। তাঁরা নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে অসীলাহ'র অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র একটি প্রসিদ্ধ হাদীসও উল্লেখ করেন। উক্ত হাদীসের ভার্বাথ "আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণীত তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির (বনু ইসরাঈলের) তিন জনের একটি দল জঙ্গলে গিয়েছিল, প্রচন্ড ঝড় শুরু হলে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ একটি পাথর পাহাড়ের ওপর থেকে ধসে পড়লে গুহার মূখ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তারা বললো এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়; তবে আমাদের সুকর্মকে অসীলাহ করে আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করলে হয়ত এই মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অতঃপর তাদের একজন বললো: হে আল্লাহ! আমি মেষ পালতাম। আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিল। আমি তাঁদের দুধ পান করানোর পূর্বে পরিবারের কাউকে দুধ পান করাতাম না। একদিন আমি আসার পূর্বে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুদার্থ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তাঁদেরকে জাগালাম না এবং তাঁরা ঘুম থেকে না জাগা পর্যন্ত পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অতঃপর ভোর হলো তাঁরা জাগলেন এবং তাঁদেরকে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এই কর্ম তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে থাকি, পাথরের কারণে যে মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছি তা তুমি দূর করে দাও। অতঃপর পাথর একটু হটে গেল; তবে গুহা থেকে বের হওয়ার মতো রাস্তা হয়নি। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: অপর জন বললো: আমার এক চাচাতো বোন ছিল; যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমি একদিন তাকে অর্থের বিনিময়ে ভ্যবিচারে রাজী করালাম এবং নির্জন স্থানে নিয়ে গেলাম। আমাদের মিলনে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল না। আমি তার সাথে মিলনে আগ্রহী হলে সে বললো: আল্লাহকে তাকওয়া করো এবং অবৈধভাবে এ কাজ করো না। অতঃপর আমি সরে আসলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এই কর্ম তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে থাকি পাথরের কারণে যে মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছি তা তুমি দূর করে দাও। অতঃপর পাথর আরেকটু সরে গেল; তবে গুহা থেকে বের হওয়ার মতো পরিপূর্ণ রাস্তা হয়নি। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তৃতীয় জন বললো:

---

[১]) সহীহ বুখারী [১৬০৫] ও সহীহ মুসলিম [১২৭০]।

আমি অনেক শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম এবং তাদের সঠিকভাবে পারিশ্রমিক দিতাম। তবে তাদের একজন তার পারিশ্রমিক নিত না। এভাবে সে একদিন তার পাওনা না নিয়েই চলে যায়। অতঃপর আমি তার অর্থ বিনিয়োগ করলাম তাতে প্রচুর সম্পদ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অনেক দিন পর সে এসে তার পাওনা দাবি করলে আমি তাকে একটি মেষপাল দেখিয়ে বললাম: সব তোমার তুমি নিয়ে যেতে পারো। সে বললো: আমার সাথে ঠাট্টা করো না। অতঃপর আমি তার অর্থ বিনিয়োগ করার কথা বললে সে সম্পূর্ণ মেষপাল নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আমি যদি এই কর্ম তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে থাকি পাথরের কারণে যে মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছি তা তুমি দূর করে দাও। অতঃপর পাথর সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে আসলো"[১]।

উপরিউক্ত হাদীসে আমলে সালেহ বা নিজের কোনো সুকর্ম যা শুধুমাত্র আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল তার মাধ্যমে আল্লাহ'র কাছে সংকট থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) এই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করেন যে, তোমরাও সংকটময় মুহূর্তে নিজেদের সুকর্মকে অসীলাহ করে আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা থাকলে সফলকাম হতে পারবে এবং তা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বীকৃত।

তবে উপরিউল্লেখিত বর্ণনাসমূহে যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য লাভের আশায় ব্যক্তিবিশেষকে যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) অথবা তাঁর চাচা আব্বাস (র) কে অসীলাহ বা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল; সেই বর্ণনাগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপস্থিতিতে তাঁকে অসীলাহ করে অন্ধ সাহাবী প্রার্থনা করেছিলেন এবং উমর (র)ও দোয়া করেছেন{أَللّهمّ إنّا كنّا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقنا}[হে আল্লাহ আমাদের নবী (স)'র অসীলায় আমরা বৃষ্টির প্রার্থনা করতাম অতঃপর তুমি আমাদের বর্ষাতে এখন আমাদের নবী (স)'র চাচার মাধ্যমে বৃষ্টির প্রার্থনা করছি; অতঃপর তুমি আমাদের বর্ষাও] থেকে "আমরা আমাদের নবী (স)'র অসীলায় আমরা বৃষ্টির প্রার্থনা করতাম" কিন্তু আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইন্তিকালের পর আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ করে দোয়া করেননি; বরং নবী (স)'র চাচা জীবিত আব্বাস (র) কে অসীলাহ করে দোয়া করেছেন। যদিও উমর (র)'র নিকট পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মূল্যায়ণই সবচেয়ে বেশি এবং যা অতুলনীয় তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) কে অসীলাহ করে দোয়া করেননি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিবিশেষকে অসীলাহ বা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে বৈধতা আছে যদি সেই ব্যক্তি জীবিত হন।

তাছাড়া সূরাহ আল-মায়িদাহ'র ৩৫ আয়াতে অসীলাহ{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ}[তোমরা আল্লাহ'র নৈকট্য অন্বেষণ করো] এবং উপরিউল্লেখিত হাদীসসমূহেও নৈকট্য অন্বেষণের পন্থা হিসেবে "আমল সালেহ" অর্থাৎ পুণ্যময় কর্মকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) বৃষ্টির প্রার্থনা করার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন।

---

১) সহীহ বুখারী [৩৪৬৫] ও সহীহ মুসলিম [২৭৪৩]।

খলীফা উমর (র)ও বৃষ্টির প্রার্থনা করার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন; এমন কি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপস্থিতিতে তাঁকে অসীলাহ করে অন্ধ সাহাবীকে দোয়া করার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করতে আল্লাহ'র রাসুল (স) নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং নামায আদায়ের পর দোয়া করেছেন। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, পুণ্যময় কর্মকে আল্লাহ'র নৈকট্য অন্বেষণের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করাই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; যার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। কুরআন করীমেও নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ এসেছে। এরশাদ হচ্ছে:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}[ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো][1]।

তবে ইসতিসকা (বৃষ্টির প্রার্থনা) ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবিত দ্বীনদার, মুত্তাকি ও সৎব্যক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। অধিকাংশ ফকীহগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন[2]।

[1]) সূরাহ আল-বাকারাহ:৪৫।

[2]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ২/৩৩৯, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত:২/৭, সুবুলুস-সালাম, প্রাগুক্ত: ২/১৩৪ ও আল-মুগনী, প্রাগুক্ত: ২/২৬৫।

খাইবার অভিমূখে অভিযান

খাইবার মদীনা থেকে একশ মাইল উত্তরে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত খুবই উর্বরভূমি ও দূর্গের বড় শহর। আল্লাহ'র রাসুল (স) সপ্তম হিজরীর শেষের দিকে খাইবার অভিযানে রওনা হন। এই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে চৌদ্দশত যোদ্ধা ছিলেন। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) বাহিনী নিয়ে খাইবারের উপকণ্ঠে পৌঁছার পর থেমে যেতে নির্দেশ দিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়েন{ اللّٰهُمَّ رب السماوات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها،ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اقدموا بسم الله}[হে আল্লাহ তুমি আকাশমন্ডলী ও যা সে ছায়া দেয় তার মালিক, যমীনসমূহ এবং যা সে ধারণ করে তার মালিক, বিতাড়িত শয়তান ও যা সে পথভ্রষ্ট করে তার মালিক। বাতাস ও যা সে প্রবাহিত করে তার মালিক। অতঃপর আমরা তোমার নিকট এই অঞ্চলের কল্যাণের প্রার্থনা করছি এবং আরো প্রার্থনা করছি তার অধিবাসীর কল্যাণের এবং তাতে আরো যা আছে তার কল্যাণের এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই অঞ্চলের মন্দ থেকে এবং তার অধিবাসী ও এর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ'র নামে অগ্রসর হও][১]।

সাধারণত আল্লাহ'র রাসুল (স) কোনো জাতির সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলে তাদের ওপর রাত্রে আক্রমণ করতেন না; বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যদি সেখানে আযানের ধ্বনি শুনেন তখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন এবং আযানের ধ্বনি না শুনলে তখন আক্রমণ করতেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) রাত্রি যাপন করেন এবং এগিয়ে গেলেন। খাইবারের শ্রমিকরা সকালে কোদাল, ভূমি জরিফের যন্ত্র ও কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে ক্ষেতে যাওয়ার সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে দেখে ঘাবড়ে যায় এবং চিৎকার দিয়ে উঠে: মুহাম্মদ (স) বাহিনী নিয়ে এসেছে; তারপর তারা পালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:{ الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين }[আল্লাহু আকবর খাইবার পরাভূত হয়েছে, আমরা যখন কোনো জাতির আঙ্গীনায় পৌঁছি তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হয় খুবই মন্দ][২]।

খাইবার অভিযানের বিবরণ

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ও ইতিহাসবিদ ইব্‌ন সাআদের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে তাঁদের মাঝে পতাকা বিতরণ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী ও খাইবারবাসীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পরে খাইবারের ইহুদীরা তাদের দূর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম যোদ্ধাগণ এক এক করে সব দূর্গ জয় করলেও গুরুত্বপূর্ণ দুটি দূর্গ: "আল-অতীহ" এবং "আল-সুলালাম" দূর্গদ্বয় জয় করতে সক্ষম

---

[১]) সহীহ ইবন হিব্বান [২৭০৯], সহীহ ইবন খুযাইমাহ [২৫৬৫], সুনান নাসায়ী আল-কুবরা [৮৭৭৬] ও মুস্তাদরাক হাকিম [২৪৮৮]। শায়খ আলবানী উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইবন হিশাম, খাইবার অধ্যায়, প্রাগুক্ত।

[২]) সহীহ বুখারী [৪১৯৭ ও ৩৭১]।

হচ্ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রায় দশাধিক দিন দূর্গদ্বয় অবরোধ করে রাখলেন[১]।

বুরাইদাহ বিন আল-খতীব থেকে বর্ণিত যে,"খাইবারের যুদ্ধে প্রথমে আবু বকর (র) পতাকা গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচেষ্টা করে ফিরে আসেন দূর্গ বিজয় হয়নি। পরদিন উমর (র) পতাকা গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচেষ্টা করে তিনিও দূর্গ বিজয় ব্যতীত ফিরে আসেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: আগামী কাল সকালে এমন একজনকে আমার পতাকা প্রদান করা হবে যাঁর হাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর্গ বিজয় করবেন, যাকে আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স) ভালোবাসেন। সকলেই উত্তেজনার মধ্যে রাত কাঠান; কার হাতে আগামী কাল আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজ পতাকা তুলে দিবেন। যখন সকাল হলো সকলেই আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট উপস্থিত হন এবং প্রত্যেকেই আশা রাখেন তাঁকেই যেন পতাকা প্রদান করা হয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আলী কোথায়? বলা হলো হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন। তিনি বললেন: তোমরা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠাও। অতঃপর তাঁকে নিয়ে আসা হলো। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর চোখে থুথু দিলেন এবং আরোগ্যের দোয়া করলেন অতঃপর তিনি আরোগ্য লাভ করলেন; মনে হলো যেন তাঁর চোখে কোনো সমস্যাই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন, আলী বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো মুসলিম হয় আমি যুদ্ধ করে যাবো। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তুমি তোমার মতো চালিয়ে যাও, তাদের আঙ্গীনায় গিয়ে তাদের ইসলামের দওয়াত দাও এবং তাদেরকে আল্লাহ'র অধিকার সম্পর্কে অবগত করো। আল্লাহ'র শপথ তোমার মাধ্যমে আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে হেদায়ত করলে তোমার জন্য তা উন্নত উটের চেয়ে অনেক উত্তম হবে। তারপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছ থেকে বেরিয়ে লড়াই করেন এবং তাঁর হাতেই দূর্গদ্বয় বিজয় হলো[২]। দূর্গসমূহের সম্পদ মুসলিম বাহিনী গনীমতপ্রাপ্ত হলেন।

তবে যে দু'টি দূর্গ প্রথমার্ধে জয় করা সম্ভব হয়নি সেগুলোকে মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে রেখেছিলেন। অতঃপর দূর্গবাসী যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য তখন তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট প্রার্থনা করলো যে, তাদেরকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে নির্বাসন দেয়া হলে তারা তাদের যাবতীয় সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হাতে ছেড়ে চলে যাবে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং দূর্গদ্বয় থেকে অবরোধ তুলে নিলে তারা বেরিয়ে আসে। তারপর তারা আবার আবেদন করলো যে, তারা খাইবারের ভূমি সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাই খাইবার মুসলিম বাহিনীর হাতেই থাকবে; তবে তারা সেখানে চাষাবাস করবে এবং উৎপাদিত ফসলাদির সুনির্দিষ্ট একটি অংশ তাদের প্রদান করা হবে। মুসলিমগণ যখনই চাইবেন তাদের বের করে দিতে পারবে এই শর্তে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের এই আবেদনও গ্রহণ করলেন[৩]।

---

১) তাবকাত ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত: ২/৩৭ ও বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৫৮৭। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৪৩।

২) সহীহ বুখারী [২৯৪২ ও ৪২১০] ও সহীহ মুসলিম [২৪০৬]।

৩) সুনান আবী দাউদ [৩০১৭]।

আল্লাহ’র রাসুল (স) যখন যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পর স্থির হলেন তখন ইহুদী সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যায়নব বিন্তে হারিস আল্লাহ’র রাসুল (স)’র কাছে একটি ভূনা ছাগল হাদিয়া পাঠায় এবং পূর্বে জিজ্ঞাসা করে সে জেনে নেয়, ছাগলের কোন অংশ আল্লাহ’র রাসুল (স)’র বেশি পছন্দ। বলা হলো সামনের পা (রান)। অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স)’র পছন্দ অংশে বেশি করে বিষ দিয়ে গোটা বিষাক্ত ভূনা ছাগলটি নিয়ে আসলো। অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স)’র সামনে রাখলো, তিনি সামনের পা নিয়ে মুখে দিয়ে চিবানোর পর বিষাক্ত বুঝতে পেরে ফেলে দিলেন এবং বললেন: এই হাড় আমাকে অবগত করলো যে, সেটি বিষাক্ত। তবে তাঁর সাথে বিশিষ্ট সাহাবী বিশ্‌র বিন বরা বিন মাআরুরও ভূনা ছাগলের এক টুকরো মূখে দিয়ে তিনি চাবিয়ে গিলে ফেলার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মহিলাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে সে বিষ দেয়ার কথা স্বীকার করলো। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন সে এই কাজ করেছে? উত্তরে সে বললো: আমার স্বজাতির কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে যা জেনেছি তা আপনার অজানা নয়। অতঃপর আমি চিন্তা করলাম আপনি যদি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বিষের কারণে মৃত্যুবরণ করবেন এবং আমরা আপনার কাছ থেকে মুক্তি পাবো। আর যদি নবী হন তাহলে আপনি বিষ সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবেন। আল্লাহ’র রাসুল (স) ঐ মহিলাকে বিশ্‌র বিন বরা (র)’র কিসাসে হত্যার নির্দেশ দেন[১]।

ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী ও সুলাইমান আত-তায়মী উভয়ে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, মহিলাটি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে ইসলাম গ্রহণের পর বিশ্‌র বিন বরা’র হত্যাকান্ডের স্বীকারোক্তির কারণে তাকে কিসাসে হত্যা করা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইব্‌ন সাআদ বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনানুসারে বলেছেন যে, আল্লাহ’র রাসুল (স) বিশ্‌র বিন বরা’র উত্তরসূরীদের নিকট মহিলাকে হস্তান্তর করেন এবং তাঁরা তাকে হত্যা করেছিলেন[২]। তবে সঠিক হচ্ছে যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন “আল্লাহ’র রাসুল (স) তাকে বললেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে হত্যা করার সামর্থ্য তোমাকে প্রদান করেননি। সাহাবীগণ বললেন: আমরা কী তাকে হত্যা করবো না? আল্লাহ’র রাসুল (স) বললেন: না”[৩]।

আল্লাহ’র রাসুল (স) খাইবার যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের সম্পদ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে (যোদ্ধার এক অংশ ও ঘোড়ার দুই অংশ) বন্টন করে দিলেন এবং নাফেই তার ব্যাখ্যা দিলেন যে, যদি কোনো যোদ্ধার সাথে ঘোড়া থাকে তিনি তিন অংশ পাবেন[৪]। খাইবারের বন্দিদের মধ্যে ইহুদীদের নেতা হুওয়াই বিন আখতাবের কন্যা সফিয়্যাহও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ’র রাসুল (স) তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। তাঁর মুক্তি প্রদান তাঁর দেন-মোহর হিসেবে গণ্য করা হয়[৫]।

---

১) সুনান আবী দাউদ [৪৫১২]।

২) তাবকাত ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত: ২/৪৬।

৩) সহীহ বুখারী [২৬১৭] ও সহীহ মুসলিম [২১৯০]।

৪) সহীহ বুখারী [৪২২৮] ও সহীহ মুসলিম [১৭৬২]।

৫) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৪৪।

হাবশাহ থেকে জাফর বিন আবী তালিবের আগমন

আল্লাহ'র রাসুল (স) খাইবারে অবস্থানকালে বিশিষ্ট সাহাবী ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচাতো ভাই জাফর বিন আবী তালিব (র) হাবশাহ থেকে সতের জন নারী-পুরুষ ও আরো যাঁরা ইয়েমেনে অবস্থান করেছিলেন তাঁদের নিয়ে আগমন করেন। তাঁর আগমনে আল্লাহর রাসুল (স) খুবই আনন্দিত হলেন এবং মুসলিম বাহিনীর সম্মতিক্রমে তাঁদেরকেও গনীমতের সম্পদের একটি অংশ প্রদান করা হয়। ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে "জাফর বিন আবী তালিব (র) আগমন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁকে জড়িয়ে ধরে দুচোখের মাঝখানে চুম্বন করেন এবং বলেন: আমি জানি না কোনটি আমাকে বেশি আনন্দিত করেছে, খাইবার বিজয় নাকি জাফরের আগমন"[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনার উদ্দেশ্যে খাইবার ত্যাগকালে আদী গোত্রের সেওয়াদ বিন গযিয়্যাহ আনসারীকে খাইবারের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে খাইবারের"জুনাইব খেজুর"(উন্নতমানের খেজুর) উপস্থাপন করা হলে আল্লাহ'র রাসুল (স) জিজ্ঞাসা করেন: খাইবারের সব খেজুরই কি এই রকম? উত্তরে বলা হলো: না, হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমরা এই খেজুরর এক ছা (সে যুগের পরিমাপের পাত্র) অন্যান্য খেজুরের দুই ছা অথবা তিন ছা'র সমপরিমাণে বিনিময় করি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: এই রকম করো না; বরং প্রথমে দিরহামের মাধ্যমে বিক্রয় করে পরে তা দিয়ে "জুনাইব খেজুর" ক্রয় করো"[২]।

খাইবারের ইহুদীরা ভূমি চাষাবাদ করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে উমর (র)'র খিলাফতকাল পর্যন্ত খাইবারে অবস্থান করেছিল। পরে তারা ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে এবং একজন আনসারীকে হত্যা করে। আবদুল্লাহ বিন উমর (র) কে আঘাত করে হাত ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর খলীফা উমর (র) মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন: "আল্লাহ'র রাসুল (স) ইহুদীদের খাইবারে চাষাবাদ করে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, যখনই আমরা চাইব তাদের বের করে দেয়া হবে। এখন তারা মুসলিমদের ওপর বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। তারা ব্যতীত উক্ত অঞ্চলে আমাদের কোনো শত্রু নেই। অতঃপর খাইবারের ইহুদীদের সাথে কারো কোনো লেন-দেন থাকলে তারা যেন তা সমাপ্ত করে নেয়। আমি তাদেরকে বের করে দিব। তাদের বাড়াবাড়ি ও অপকর্মের কারণেই এভাবে ইহুদীদের আরবাঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়[৩]।

খাইবার যুদ্ধের শিক্ষা

খাইবার যুদ্ধের আলোচনায় সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, দৃশ্যত কোনো প্রেক্ষাপট ব্যতীত আল্লাহ'র রাসুল (স) এই অভিযানে বের হন; যা ইতিপূর্বে পর্যালোচিত যুদ্ধসমূহ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতিপূর্বে পর্যালোচিত সকল অভিযান বা যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক ছিল। মুশরিকদের কোনো না কোনো আচরণে আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রতিরক্ষামূলকভাবে যুদ্ধের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে অভিযানে বের হন; তবে

---

১) মুস্তাদরাক হাকিম [২/৬৮১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/২৬৫।

২) সহীহ বুখারী [২২০১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন:ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/৩৪৭।

৩) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৯-২৫০।

এই যুদ্ধে সেই রকম কোনো প্রেক্ষাপট দৃশ্যত ছিল না তা সত্ত্বেও কেন আল্লাহ'র রাসুল (স) অভিযানে বের হন তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

মূলত খাইবার যুদ্ধ বনু কুরাইযা'র যুদ্ধ ও হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। যার চরিত্র ও পরিবেশ ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের চরিত্রের চেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াত নতুন একটি পর্যায়ে পর্দাপণ করে। হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সুযোগ পান। আল্লাহ'র রাসুল (স) বিভিন্ন আরবগোত্র ও উপজাতিদের ইসলামের দাওয়াত দেন। পূর্বে পর্যালোচিত ইহুদীদের সাথে সংঘটিত তিনটি অভিযানের [বনু কাইনুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযাহ'র বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহ] কারণ ব্যাখ্যা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীরা মদীনায় ও মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকা সত্ত্বেও যখনই সুযোগ পেয়েছে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কুরাইশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দিয়েছে এবং একাধিকবার আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে; যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে অহীর মাধ্যমে অবগত করেছেন। তাদের ঘৃন্য অপরাধের কারণে কখনো তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে আবার কখনো হত্যা করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ প্রাচীন ও আধুনিক যুদ্ধনীতির আওতায় পড়ে।

হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াতের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা যেন পুনরায় কলুষিত করতে না পারে সেই সুযোগ না দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) হঠাৎ করে খাইবার অভিযানে বের হন এবং সেখানে পৌঁছার পর ইসলামী রীতি অনুসারে তাদেরকে অবহিত না করে এক রাত্রি অবস্থান করে আযানের ধ্বনির অপেক্ষা করেন। অতঃপর আযানের আওয়ায না পেয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। এই অভিযানেও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয় ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা তা যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানের পর আলী (র)'র প্রশ্নের [হে আল্লাহর রাসুল (স)! আমি কি যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো মুসলিম হয় আমি যুদ্ধ করে যাবো?] উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বক্তব্য [তুমি তোমার মতো করে চালিয়ে যাও, তাদের আঙ্গিনায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দওয়াত দাও এবং তাদেরকে আল্লাহ'র অধিকার সম্পর্কে অবগত করো। আল্লাহ'র শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে হেদায়াত করলে তোমার জন্য তা উন্নত উটের চেয়ে অনেক উত্তম হবে][১] থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

খাইবার যুদ্ধে উদ্ভাবিত শরয়ী বিধানসমূহ

খাইবার যুদ্ধে অনেক ইসলামী শরীয়তের বিধান উদ্ভাবিত হয়; যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১) পূর্বসতর্ক করা ব্যতীত আক্রমণের বৈধতা: যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে এবং যারা ইসলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত; তাদেরকে পূর্বসতর্ক করা বা নতুনভাবে দাওয়াত প্রদান ব্যতীত আক্রমণ করার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। উপরিউক্ত বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ফকীহগণ ঐকমত্য

---

[১]) ইমাম বুখারী [৩৭০১] ও সহীহ মুসলিম [২৪০৬]।

পোষণ করেছেন; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র খাইবার অভিযান থেকে সহজেই অনুমেয়। তবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ও ইসলামের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানো আক্রমণের পূর্বশর্ত। ইহুদীরা আল্লাহ'র রাসুল (স) ও ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বযুগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ও এখনো রয়েছে বিধায় পূর্বে সতর্ক করা ব্যতীত তাদের ওপর আক্রমণ চালানো সম্পূর্ণ বৈধ ও যুক্তিযুক্ত।

২)**কুরআন করীমের বর্ণনার ভিত্তিতে গনীমতের বন্টন**: আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরআন করীমের বর্ণনার ভিত্তিতে গনীমতের সম্পদ বন্টন করেন এবং তা চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেছেন; পদাতিক যোদ্ধা এক অংশ এং অশ্বারোহী তিন অংশ (এক অংশ যোদ্ধার এবং দুই অংশ ঘোড়ার)[১] অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ কুরআন করীমে বর্ণিত নির্দেশনানুসারে বন্টন করা হয়, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ}[আর এ কথাও জেনে রাখো যে, কোনো বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ'র জন্য, রাসুলের জন্য, তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং ইয়াতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর][২]।এই পঞ্চমাংশ থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অংশ তাঁর পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের জাতীয় স্বার্থে ব্যয় করা হয় যেমনটি অভিমত ব্যক্ত করেন হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণ; তবে ইমাম আবু হানীফাহ'র অন্য একটি ভিন্ন মতানুসারে এই অংশ খলীফার হাতে সংরক্ষিত থাকবে তিনি ইচ্ছেমতো তা ব্যয় করতে পারবেন।

৩) **যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতদের গনীমতের অংশীদারিত্বের বৈধতা**: যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতদের গনীমতের অংশীদারিত্বের বৈধতা স্বীকৃত;তবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) হাবশাহ ও ইয়েমেন ফেরত মুহাজির জাফর বিন আবী তালিব (র) ও তাঁর সঙ্গীদের মুসলিমদের সম্মতিক্রমে গনীমতের সম্পদের একটি অংশ প্রদান করেছিলেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় তাঁদের গনীমতের অংশীদারিত্বে মুসলিমদের সম্মতির শর্তের প্রয়োজন নেই। ইমাম বায়াহকী তাঁর বর্ণনায় এই শর্ত বৃদ্ধি করেছেন; কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদেরকে গনীমতের অংশীদার করার পূর্বে মুসলিমদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা অধিক যৌক্তিকও বটে। এই শর্তের কারণেই হয়তো আল্লাহ'র রাসুল (স) আব্বান বিন সাঈদ (র) কে খাইবারের গনীমতের অংশীদার করেননি; যাঁকে তিনি ইতিপূর্বে নাজদের একটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খাইবারে ফিরে এসে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট খাইবারের গনীমতের অংশীদার করার আবেদন করলেও তাঁকে অংশীদার করা হয়নি। দুটো ঘটনায় এভাবে সমন্বয় করা যায়; জাফর বিন আবী তালিব (র) ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের

---

[১]) ইমাম আবু হানীফাহ'র মতে গনীমতের সম্পদের বন্টন পদাতিক যোদ্ধা এক অংশ এবং অশ্বারোহীর দুই অংশ [এক অংশ নিজের অন্য অংশ ঘোড়ার] তবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র খাইবার যুদ্ধের গনীমত বন্টনের মাধ্যমে তা রহীত হয়েছে। সহীহ বুখারী [৪২২৮] ও সহীহ মুসলিম [১৭৬২]।

[২]) সূরাহ আল-আনফাল:৪১।

সম্মতি ছিল বিধায় অংশীদার করা হয়েছে। আর আব্বান বিন সাঈদ (র)'র ক্ষেত্রে মুসলিমদের সম্মতি ছিল না বিধায় অংশীদার করা হয়নি[১]। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, জাফর বিন আবী তালিব (র) ও তাঁর সঙ্গীগণ সদ্য হিজরত করে ফেরার কারণে সময়মত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এবং খুবই হতদরিদ্র অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু আব্বান বিন সাঈদ (র)'র অবস্থা সেই রকম ছিল না।

৪) **ভূমি বর্গাপ্রদানের চুক্তির বৈধতা:** ভূমির মালিক অন্যের সাথে উৎপদিত ফসলের সুনির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে ভূমির বৃক্ষাদি ও ক্ষেতের সেচ প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি সম্পাদন ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ বৈধ। খাইবারের ইহুদীদের সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ উপরিউক্ত বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফাহ'র একটি বিরল অভিমত রয়েছে, তা হলো বিষয়টি তিনি বৈধ মনে করেন না, তাঁর এই অভিমতের স্বপক্ষে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণীত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীস{أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمواجرة}[আল্লাহ'র রাসুল (স) ভূমি বর্গা প্রদানের নিষেধ করেছেন এবং শ্রমিক দ্বারা চাষ করার নির্দেশ প্রদান করেন][২]। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে, খাইবার যুদ্ধের হাদীসে ভূমি বর্গা প্রদানের চুক্তির বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই; কারণ খাইবার যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে বিধায় খাইবারবাসী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ'র রাসুল (স) যা গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ তাঁর মালিকনার অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে যা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাও তাঁর মালিকানার অন্তর্ভূক্ত বিধায় এখানে চুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। তবে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমতই ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত ও গৃহীত পন্থা বলে প্রতীয়মান হয় এবং ইমাম আবু হানীফাহ'র দুই শিষ্য ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদও তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি।

অধিকাংশ ফকীহগণ ইমাম আবু হানীফাহ'র স্বপক্ষে বর্ণীত হাদীসের উত্তরে বলেন যে, ভূমি বর্গা প্রদানের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ইসলামের প্রাথমিক যুগের যখন মুসলিমদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণের ভূমি ছিল না এবং মুহাজিরগণ ছিলেন নিঃস্ব। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসারদেরকে সাম্যের ভিত্তিতে মুহাজিরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (র) থেকে বর্ণীত সহীহ মুসলিমে বর্ণীত অন্য হাদীস{من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه}[যার ভূমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে অথবা তাঁর ভাইকে প্রদান করে][৩] থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়; যা পরবর্তিতে মুসলিমদের অবস্থা ভালো হলে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শেষ যুগে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বর্গা প্রদানের ভিত্তিতে চাষাবাদ করেন বলে বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত[৪]।

---

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/৩৪০ ও ৩৪৯।

[২]) সহীহ মুসলিম [১৫৪৯]।

[৩]) সহীহ আল-জামে [৬৫] ও সুনান আবী দাউদ [৩৩৯৫]।

[৪]) সুনান আবী দাউদ [২৯৯৩]।

৫) **আগমণকারীকে জড়িয়ে ধরা ও চুম্বন প্রদানের বৈধতা:** স্বাভাবিকভাবেই কেউ দূর থেকে আগমন করলে তাকে জাড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করা আমাদের সমাজেও প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে পড়ে। হাবশাহ ফেরত মুহাজির ও নিকটাত্মীয় জাফর বিন আবী তালিব (র) কে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জড়িয়ে ধরে তাঁর ললাটে চুম্বন প্রদানের কারণে এটি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুন্নাতের মর্যাদা লাভ করেছে[১]। মা আয়েশা (র) থেকে বর্ণীত অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে,"যায়দ বিন হারেছাহ (র) আগমন করলেন তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) আমার বাড়ীতে ছিলেন। অতঃপর তিনি আমার বাড়ীতে এসে দরজায় আঘাত করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করে তাঁকে কপালে চুম্বন করেন"[২]। উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে এটি বৈধ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত।

খাইবার যুদ্ধে প্রকাশিত দুটি মুজেযাহ :আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দুটি মুজেযাহ বা অলৌকিক ঘটনা খাইবার যুদ্ধে প্রকাশিত হয়:
১) আলী'র চোখে সমস্যা দেখা দিলে আল্লাহ'র রাসুল (স) ডেকে তাঁর চোখে থুথু দিলে চোখের সমস্যা এমনভাবে প্রশমিত হয় যেন আদৌ তাঁর চোখে কোনো সমস্যাই ছিল না।
২) বিষাক্ত খাবার (ভূনা ছাগল) ভক্ষণের পর বিষের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত না হওয়া; অথচ একই খাবার আল্লাহ'র রাসুল (স)'র "বিষাক্ত খাবার" বলার পূর্বে সাহাবী বিশ্‌র বিন বরা বিন মারুর (র) ভক্ষণের সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। এটি মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাঁর রাসুল (স) কে অঙ্গীকারের প্রতিফলন যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন][৩]। তবে বিষের প্রতিক্রিয়া তাঁর দেহে বিদ্যমান ছিলো। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন:{ يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم}[হে আয়েশা! আমি খাইবারে যে খাবার খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা আমি এখনও অনুভব করি এবং এই সময়ই আমি অনুভব করি সেই বিষ থেকে আমার ধমনী কেটে গেছে]।[৪]

---

১) সুনানে আবী দাউদ [৪৬৮৪]।।
২) সুনান তিরমিযী [২৭৩২]।
৩) সূরাহ আল-মায়িদাহ:৬৭।
৪) সহীহ বুখারী [৪৪২৮]।

বিভিন্ন আরব উপ-জাতির বিরুদ্ধে অভিযান

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াত নতুন একটি পর্যায়ে পর্দাপণ করে। হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সুযোগ পান। আল্লাহ'র রাসুল (স) বিভিন্ন আরবগোত্র ও উপজাতিদের ইসলামের দাওয়াতের অংশ হিসেবে আরবাঞ্চলে বিস্তৃত বিভিন্ন আরবগোত্র ও উপজাতিদের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। অতঃপর যারা এই আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়; তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাহাবী'র নেতৃত্বে সপ্তম হিজরী জুড়ে সতেরটি অভিযান পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে ঐ সময়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ইসলামের আহবান জানিয়ে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর প্রতিও পত্র পাঠান।

ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদ ইব্ন সাআদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) ষষ্ঠ হিজরী'র জিলহজ্ব মাসে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ'র নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে পত্র লিখেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বলা হলো যে, রাজা-বাদশাহগণ সীল স্বাক্ষর ব্যতীত পত্র গ্রহণও করেন না। তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন যাতে তিন লাইনে{محمد رسول الله}অংকিত ছিলো এবং পত্র লিখে তা দিয়ে সীলযুক্ত করতেন। অতঃপর সপ্তম হিজরী'র কোনো একদিন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পত্র নিয়ে ছয়জন প্রতিনিধি রওনা হন, যাঁদের প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল।

আল্লাহ'র রাসুল (স) আমর বিন উমাইয়্যাহ আল-দ্বামরী (র) কে প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে হাবশাহ'র শাসক নাজ্জাশী'র নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পত্র গ্রহণ করে অতি সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর মাথায় রাখেন এবং নিজ আসন থেকে নেমে বিনয়ের সাথে মাটিতে বসে পড়েন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কালিমা শাহাদাহ উচ্চারণ করে বলেন:"আমি যদি তাঁর কাছে আসতে পারি তাহলে অবশ্যই আসবো"[১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বিশিষ্ট সাহাবী দিহইয়াহ কালবী (র) কে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেন। দিহইয়াহ কালবী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পত্র তার দরবারীর মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস অনুবাদকের সাহয্যে পত্র পাঠ করেন, তাতে লেখা ছিল{بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[২]পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ'র নামে শুরু করছি, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (স)'র পক্ষ থেকে রুমের মহামান্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন

---

১) তাবকাতে ইব্ন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/২৩ (সংক্ষেপে)।

২) সূরাহ আলে ইমরান:৬৪।

নিরাপদে থাকবেন, ইসলাম গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যদি অমান্য করুন তাহলে আপনার অনুগতদের অপরাধও আপনার ওপর বর্তাবে, । হে আহ্‌লে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া একজন আরেকজনকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে ফিরে যায়, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা 'স্বাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম][১]।

ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদ ইব্‌ন সাআদ বর্ণনা করেন যে,"হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠের পর তার দরবারীদের বললো: হে রোমবাসী! তোমরা কি তোমাদের সফলতা ও কল্যাণ চাও এবং তোমাদের রাজত্বের অস্তিত্ব ও ঈসা বিন মরয়মের বর্ণিত পথের অনুসারী হিসেবে থাকতে চাও? রোমবাসী বললো: তা আবার কি হে মহামান্য সম্রাট? সে বললো: তোমরা এই আরবী নবীর অনুসারী হও, তারা তখন বন্যপশুর ন্যায় ক্রস উঁচিয়ে দরজার দিকে পালাতে লাগলো। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তা দেখে তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং নিজের জীবন ও রাজত্ব হারানোর ভয় তাকে পেয়ে বসলো, তখন সে তাদেরকে চুপ করিয়ে বললো: আমি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চাইলাম; তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে কতটুকু দৃঢ় আছ, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে যা দেখেছি তাতে আমি অভিভূত। অতঃপর তারা তাকে আনুগত্যের নির্দর্শন স্বরূপ সিজদাহ করলো[২]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) আবদুল্লাহ বিন হুযাফাহ আল-সাহমী (র) কে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র নিয়ে পারস্যের সম্রাট কিসরা'র নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন: আমি তাকে পত্র হস্তান্তর করলে পত্রটি তার সামনে পাঠ করা হয়; তারপর সে পত্র নিয়ে তা টকুরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে পারস্যের সম্রাট কিসরা'র আচরণের সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন: আল্লাহ তার রাজত্ব টকুরো টুকরো করবে। তারপর পারস্যের সম্রাট কিসরা ইয়ামেনে নিযুক্ত তার গভর্নর বাযানের কাছে পত্রে নির্দেশ প্রদান করে যে, তোমার কাছ থেকে দুজন শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির -আল্লাহ'র রাসুল (স)- নিকট পাঠানো হোক তারা যেন তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর ইয়ামেনের গভর্নর বাযান আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে পত্র নিয়ে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তারা মদীনায় পৌঁছে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে বাযানের পত্র হস্তান্তর করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) মুচকি হেসে বলেন:তোমরা আজকে যাও আগামী কাল তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সংবাদ প্রদান করবো। অতঃপর পরের দিন তারা আসলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদেরকে বললেন:{ أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها}[তোমাদের গর্ভনরকে গিয়ে বলো যে আমার পালনকর্তা তার মালিক কিসরাকে গত রাতে সাত ঘন্টা পূর্বে হত্যা করেছেন][৩] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স)'র সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে তার পুত্রকে তার ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ করলে সে তার পিতাকে হত্যা করে। অতঃপর বাযানের প্রতিনিধিদ্বয় তার কাছে ফিরে

---

১) সহীহ বুখারী [২৯৪১]।
২) সহীহ বুখারী [৭]।
৩) আস-সহীহ আল-মুসনাদ [১১৮৪]।

উপরিউক্ত ঘটনার বর্ণনা দিলে বাযান ও ইয়ামেনে অবস্থানরত তাঁর সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করেন[১]।

অনুরূপভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স) হারিস বিন উমাইর আল-ইয়েযদী (র) কে রোমের পক্ষের গর্ভনর শুরাহবীল বিন আমর আল-গাসসানী'র নিকট প্রেরণ করেছিলেন। শুরাহবীল বিন আমর তাঁকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে হত্যা করে। হারিস বিন উমাইর ব্যতীত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কোনো দূত হত্যার শিকার হননি[২]।

এভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স) আরবাঞ্চলের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও আরব গোত্র প্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রচুর প্রতিনীধি ও পত্র প্রেরণ করেছিলেন। যার ফলে তাদের অনেকেই ইসলামের সুন্দর ও নিরাপদ ছায়াতলে এসে সম্মানিত হন; তবে কিছু দূর্ভাগা ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে এই সময়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকটও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরবগোত্র প্রধানগণও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং ইতিহাসখ্যাত যোদ্ধা ও বীর খালিদ বিন আল-অলীদ ও বিশিষ্ট আরব কূটনৈতিক আমর বিন আল-আস এই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের তালিকাভূক্ত হয়ে ধন্য হন।

এই সময়ের অন্যান্য প্রতিনিধি ও সরিয়্যাহগুলো (যেই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স) সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি) প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিনিধি ও সরিয়্যাহসমূহ প্রেরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর সুফল এবং উদ্ভাবিত বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) ইসলামী দাওয়াতের নবযুগে পদার্পনের উপকরণ: বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরবগোত্র প্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রেরিত প্রতিনিধি ও সরিয়্যাহসমূহের অভিযান এবং পত্রের আদান-প্রদান আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবদ্দশাতেই ইসলামী দাওয়াতের নতুন যুগের যাত্রা শুরু হয়; যা হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি'র পর দাওয়াতের পন্থা থেকে কিছুটা ভিন্ন। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হিজরতের পর থেকে হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতের পন্থা সঙ্গত কারণেই অনেকটা শান্তিপূর্ণ ও প্রতিরক্ষামূলক ছিল; যা ঐ সময়ে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের পর্যালোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়। সেই সময়ে [হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত] আল্লাহ'র রাসুল (স) আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা আক্রমণ করেননি। অনুরূপভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পর কেউ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধেও কোনো অভিযান পরিচালনা করেননি।

তবে মদীনাবাসী ও কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়া'র সন্ধি সম্পাদন হওয়ার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমগণ নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হন।

---

[১]) কিসরা'র নিকট আল্লাহর রাসুল (স)'র পত্রের বিবরণ তাবকাতে ইব্‌ন সাআদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারীও [৪৪২৪] সংক্ষেপে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যেখানে কিসরা'র ওপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অভিশাপের কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী বাক্যসমূহের উল্লেখ নেই। যেমন শায়খ আলবানী মুহাম্মদ আল-গযালীর ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে উল্লেখিত বর্ণনা সম্পর্কে বলেন যে, ইমাম বুখারীর বর্ণনার অতিরিক্ত বাক্যসমূহ তাবকাতে ইব্‌ন সাআদের বর্ণনা নয় বরং তা ইব্‌ন জরীর'র বর্ণনা।

[২]) ঘটনাটি আল-ওয়াকেদী উমর বিন হাকিমের বরাতে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হাজর আসকলানী বলেন: ইব্‌ন শাহীনও মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদের বরাতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

পাশাপাশি কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও অবাঞ্ছিত আচরণ থেকেও মুক্তি পান। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে ইসলামী দাওয়াতের নতুন যুগে পদার্পণ করার পথ সুগম হয় এবং তা হলো যে জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন [ইসলামী শরীয়াহ'র প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন] সরাসরি এর জন্য কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছার পরও ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা ও সর্বাত্মক যুদ্ধ করে তাদের ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

এই নবযুগের মাধমে আল্লাহ'র রাসুল (স) বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে পৌঁছিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের উপযোগী জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মনোনিবেশ করেন। তদুপরি তাঁর মিশন পূরণে যা করণীয় তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও মুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে এখনো তা অব্যাহত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নে সরাসরি যুদ্ধে অবতরণ ব্যতীত কোনো পন্থা নেই। যেমন হাদীসে এসেছে "ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে, ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযয়াহ প্রদান করতে হবে, নয়তো তরবারীই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে" অর্থাৎ "ইসলাম গ্রহণ, জিযয়াহ অথবা তরবারী"এই নীতি নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এই যুগে পদার্পনের পর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরবগোত্র প্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে যে চিঠি-পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে বেশ কিছু শরয়ী বিধান পরিলক্ষিত হয়, যা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১) আল্লাহ প্রদত্ত যেই বার্তা নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রেরিত হয়েছেন তা কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আল্লাহ'র বার্তা নিয়ে দল, মত, কাল ও অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বকালের জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছেন বিধায় তিনি পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হন। বিশিষ্ট সাহাবী আনস বিন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে{أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله تعالى}[আল্লাহ'র রাসুল (স) কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশী ও প্রতিটি স্বৈরশাসককে আল্লাহ'র প্রতি আহবান জানিয়ে পত্র লিখেন][১]।

২) আল্লাহ'র রাসুল (স) যখন এই মর্মে অবগত হলেন যে, রাজা-বাদশাহগণ সীলস্বাক্ষর ব্যতীত পত্র পাঠ করেন না, তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) তিন লাইনে{محمد رسول الله}অংকিত একটি রূপার আংটিও বানিয়ে নেন। উপরিউক্ত ঘটনার আলোকে অধিকাংশ ওলামা-মশায়েখ আঙ্গুলে রূপার আংটি পরিধান করা সুন্নাত মনে করেন যা বৈধ হিসেবে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

৩) সত্যদ্বীনের আবির্ভাবের পরও অধিকাংশ আহলে কিতাবদের অবস্থান ক্ষমতার লোভ ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের কারণে অভিন্ন। যেমন হিরাক্লিয়াস ও তার অনুগতদের অবস্থান যারা নিজেদেরকে ঈসা বিন মরয়মের দ্বীনের ওপর আছে বলে ধারণা করে। প্রথমে

[১]) সহীহ মুসলিম [১৭৭৪] ও জামে তিরমিযী [২৭১৬]।

হিরাক্লিয়াসকে মনে হয়েছিল যে, সে সত্যধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে। পরে যখন ইসলাম গ্রহণে তার জীবন ও রাজত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সাথে সাথে নিজের ক্ষমতা ও রাজত্ব রক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

৪) ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে কুরআন-সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক নয়; এমন সকল সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ করা শুধু বৈধ নয় আবশ্যকও বটে। যেমন ইসলামী দাওয়াতের প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাজ্ঞান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। সপ্তম হিজরীতে আল্লাহ'র রাসুল (স) যে ছয়জন প্রতিনিধিকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শাসকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রেরিত জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল।

৫) ইসলামী দাওয়াতের জন্য সময় নির্বাচন করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সময় ব্যতীত ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে বিঘ্নতা আসতে পারে তা লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) হুদাইবিয়া'র সন্ধির পূর্বে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শাসকদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ থেকে বিরত ছিলেন। হুদাইবিয়া'র সন্ধির কারণে যখন মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কুরাইশদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অনুভব করেন তখনই তিনি ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি প্রেরণের কাজ শুরু করেন।

উমরাতুল কাযা

পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) ষষ্ঠ হিজরীতে উমরাহ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং কুরাইশদের বাধা সৃষ্টির কারণে যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়াতে সাহাবীদের প্রচন্ড অসন্তোষের মধ্যেও আল্লাহ'র রাসুল (স) তা মুলতবী করে কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, যা ইতিহাসে "সুল্হে হুদাইবিয়াহ" বা হুদাইবিয়া'র সন্ধি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে এই সন্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরাসীম। সন্ধির শর্তমতে সেই অসম্পূর্ণ উমরাহ আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স) সপ্তম হিজরী'র জুলকাদাহ মাসের শেষের দিকে পবিত্র মক্কাহ নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদ ইব্ন সাআদ'র বর্ণনা মতে দুই হাজার সাহাবী আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে উমরাহ আদায়ের সঙ্গী ছিলেন। বিশেষ করে যাঁরা হুদাইবিয়া'য় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সঙ্গে ছিলেন তাঁদের কেউ বাদ পড়েননি। তবে হুদাইবিয়া'য় সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণ করেন অথবা যারা খাইবার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাঁরা সঙ্গত কারণে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই সফরে অনুপস্থিত ছিলেন। হুদাইবিয়া'য় অংশগ্রহণ করেননি এমনো কিছু সাহাবীও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন বিধায় সফরসঙ্গী দুই হাজারে উন্নীত হয়[১]।

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কাহ আগমন করার পর কুরাইশ দারুন নাদওয়াহ'র (তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র) কাছে সমবেত হয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীদের দেখতে লাগলো এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় দুঃখ ও কষ্টে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মসজিদে প্রবেশ করে ডানপাশের বাহু বের করে ইহরামের চাদর শরীরে জড়িয়ে নিলেন। তারপর বললেন: আল্লাহ তাদের দয়া করুন যারা নিজেদের শক্তিশালী মনে করে। তারপর রুকন ইয়ামানী স্পর্শ করে রমল করতে (ঘন কদমে দ্রুত চলা) লাগলেন। তাঁর সাথে সাহাবীগণও রমল শুরু করেন। এভাবে তিন চক্কর তাওয়াফ করে অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে চলে তাওয়াফ সামাপ্ত করেন[২]। ইব্ন আব্বাস (র) বলেন: মুসলিমদের অনেকে মনে করতেন যে, তাওয়াফে রমল সুন্নাত নয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের মন্তব্যের উত্তরে রমল করেছেন। কিন্তু দেখা গেল আল্লাহ'র রাসুল (স) বিদায়ী হজ্বের সময়ও তাওয়াফুল কুদুম'র প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন বিধায় তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই[৩]।

আব্বাস (র) [আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা] নিজের শ্যালিকা মায়মুনার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) মুহরিম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর

---

১) তাবকাতে ইব্ন সাআদ,প্রাগুক্ত:৩/১৬৭।

২) সহীহ বুখারী [১৬০২], সহীহ মুসলিম [১২৬২] ও সুনান আবী দাউদ [১৮৯১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/৩৭০।

৩) সহীহ বুখারী [১৬০২], সহীহ মুসলিম [১২৬২]।

মক্কাহ থেকে ফেরার পথে তানঈমের পার্শ্ববর্তী (সারিফ নামক) স্থানে মায়মুনার সাথে বাসর উৎযাপন করেন[১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরাইশরা আলী (র)'র নিকট এসে বললো: তোমার বন্ধুকে মক্কাহ থেকে বেরিয়ে যেতে বলো। সন্ধির শর্ত মতে মক্কাহ নগরীতে অবস্থানের সময় শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর জিলহজ্ব মাসে আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন[২]।

উমরাতুল কাযার উপদেশ ও শিক্ষা

উমরাতুল কাযা মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীদের দেয়া মক্কাহ প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ সম্পন্ন করার অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন। হুদাইবিয়া'র সন্ধি সম্পাদনের প্রাক্কালে উমর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে প্রশ্ন করেছিলেন:"আপনি কি আমাদের বলেননি আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ'য় আগমন করবো এবং এর তাওয়াফ করবো? আল্লাহ'র রাসুল (স) উত্তরে বলেন: অবশ্যই; তবে আমি কি তোমাকে এই বৎসরই বায়তুল্লাহ'য় আসবো বলে সংবাদ দিয়েছিলাম? উত্তরে উমর (র) বলেন: না। আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: তুমি বায়তুল্লাহ'য় আসবে এবং তাওয়াফ করবে। সাহাবীদের দেয়া আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا}[নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দেখানো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশকর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়][৩]।

তাছাড়া ইতিহাসে এই উমরাহকে মক্কাহ বিজয়ের ভূমিকারূপে বর্ণনা করা হয়। কুরাইশদের ধারণা ছিল যে, ইয়াছরিবের (মদীনার পূর্ববর্তী নাম) জ্বর মুসলিমদের দুর্বল করে ফেলেছে। এই ধারণা নিরসনে আল্লাহ'র রাসুল (স), মুহাজেরীন ও আনসারগণ তাওয়াফ ও সাঈসহ উমরাহ'র সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে নির্ভয়ে আদায় করতে দেখে কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো:"তোমরা ধারণা করেছিলে যে, ইয়াছরিবের জ্বর তাদের দুর্বল করে ফেলেছে?! .. কই তারা তো শক্তিশালী ও মযবুত"[৪]।

উমরাতুল কাযায় উদ্ভাবিত ফিকহী বিধান

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উমরাতুল কাযা আদায়ে বেশ কিছু ফিক্হী বিধান উদ্ভাবিত হয় যার অন্যতম:

---

১) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: উয়ুনুল আছার, প্রাগুক্ত:২/১৪৮।

২) সহীহ বুখারী [২৫৮০]।

৩) সূরাহ অল-ফাতহ:২৭।

৪) সহীহ মুসলিম [১২৬৬]।

১) তাওয়াফে পুরুষের ক্ষেত্রে ইহরামের চাদর ডানপাশের বাহু বের করে বগলের নীচ দিয়ে চাদরের দুই প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে প্রথম তিন চক্করে রমল করা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুন্নাত; তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

২) হজ্ব অথবা উমরাহ'য় মুহরিম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ। তবে অধিকাংশ ফকীহগণ উপরিউক্ত বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণীত হাদীস{إن المحرم لا ينكح ولا ينكح}[মুহরিম বিয়ে করতে ও বিয়ে দিতে পারবে না][1] প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ উপরিউক্ত হাদীসের এভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, হাদীসে উল্লেখিত{ينكح}শব্দ থেকে "বিয়ের আক্‌দ" নয় বরং{الجماع}সহবাস'র অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) মায়মুনা (র) কে মুহরিম অবস্থায় "আক্‌দ" করেন, তবে মক্কাহ থেকে মদীনা ফেরার পথে তানঈমের পার্শ্ববর্তী (সারিফ নামক) স্থানে বাসর উৎযাপন করেন।

[1]) সহীহ মুসলিম [১৪০৯] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৪১২৪]।

মূতাহ অভিমূখে অভিযান

মূতাহ সিরিয়ার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি অঞ্চল যার বর্তমান নাম কুর্‌ক, এবং এই অঞ্চলের একটি অংশ বর্তমান জর্দানের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত যা মূতাহ নামে এখনো বিদ্যমান। আল্লাহ'র রাসুল (স) অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে মূতাহ অভিমূখে মুসলিম যোদ্ধাদের প্রেরণ করেছিলেন।

মূতাহ্ অভিযানের প্রেক্ষাপট

পূবেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দূত হারিস বিন উমাইর আল-ইয়েযদী (র) কে রোমানদের নিযুক্ত গর্ভনর শুরাহবীল বিন আমর আল-গাস্‌সানী হত্যা করেছিল এবং হারিস বিন উমাইর (র) ব্যতীত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আর কোনো দূত হত্যার শিকার হননি। অতঃপর মুসলিমদের মধ্যে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আওয়াজ উঠে এবং খুব দ্রুত প্রায় তিন হাজারের মতো যোদ্ধা সমবেত হয়ে মূতাহ'র উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে এই অভিযানে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি বিধায় এটি বাস্তবে গাযওয়াহ নয়, বরং এটি সারিয়্যাহ'র অন্তর্ভূক্ত; তবে এই অভিযানে মুসলিমদের শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণে সকল সীরাতবিদ ও গবেষকগণ এই যুদ্ধকে গাযওয়াহ হিসেবে নাম করণ করেন।

এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স) তিন জন সাহাবীর নাম ঘোষণা করে বলেন: এই অভিযানে মুসলিম যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিবে যায়দ বিন হারিছাহ (র), সে যদি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে জাফর বিন আবী তালিব (র) মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে, সে যদি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র) মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। অতঃপর সেও যদি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে মুসলিমগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে[১]। আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিম যোদ্ধাদের উপদেশ দেন যে, প্রথমে প্রতিপক্ষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কোনো যুদ্ধ নয়, আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহ'র ওপর ভরসা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

মূতাহ'র যুদ্ধের বিবরণ

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মুসলিম যোদ্ধারা মদীনা থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের বিদায় দেন এবং এই সময় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কান্না শুরু করলে মুসলিমগণ তাঁকে বললেন: তুমি কাঁদছ কেন? উত্তরে তিনি বললেন: আল্লাহ'র শপথ! আমি পৃথিবীর মায়া অথবা তোমাদের ভালোবাসার বিচ্ছিনতার কারণে কাঁদছি না; বরং আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে কুরআন করীমের একটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি যাতে জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا}[তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪২৬১]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ইরওয়াউ আল-গালীল, প্রাগুক্ত:৫/২৪৫।

আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা][১] এই ভয়ে আমি কাঁদছি কারণ, আমি জানি না ওখানে পৌঁছার পর আমার কী অবস্থা হবে?

মুসলিমগণ যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলেন যখন যোদ্ধাগণ রওনা দেন: তোমাদের সাথে আল্লাহ আছেন তিনি তোমাদের প্রতিরক্ষা প্রদান করবেন এবং আমাদের কাছে তোমাদের নিরাপদে ফিরিয়ে দিবেন। তাঁরা মদীনা অতিক্রম করার পর শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে অবগত হলে তারা বড় ধরনের সমাগম করলো: হিরাক্লিয়াস রোম থেকে লক্ষাধিক যোদ্ধা প্রেরণ করে এবং এই দিকে শুরাহবীল বিন আমর লাখম, জুযাম, কাইন ও বাহরা গোত্রসমূহ থেকে আরো এক লক্ষ যোদ্ধার সমাবেশ ঘটায়[২]।

মুসলিমগণ শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি শুনে মাআন নামক স্থানে দুই দিন অপেক্ষা করলো এবং বলতে লাগলো: আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি ও সংখ্যা সম্পর্কে পত্র লিখি তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধাদের উৎসাহ প্রদান করে বলেন: হে বন্ধুগণ আল্লাহ'র শপথ! যা তোমরা অপছন্দ করো তার জন্যে তোমরা বেরিয়ে এসেছ; তোমরা শাহাদাতের প্রার্থনা করো। আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি ও সংখ্যাধিক্য নিয়ে যুদ্ধ করি না, আমরা যুদ্ধ করি শুধুমাত্র দ্বীনের উদ্দেশ্যে যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর এগিয়ে চলো আমাদের সামনে দুই কল্যাণের একটি অবশ্যই রয়েছে: বিজয় অথবা শাহাদাত।

মুসলিম বাহিনী কুর্‌ক পৌঁছার একটু পূর্বেই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এদের কারো ইতিপূর্বে এতবড় শত্রুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। অতঃপর যায়দ বিন হারিছাহ (র) পতাকা গ্রহণ করে যুদ্ধ শুরু করেন। মুসলিম যোদ্ধাগণ তাঁর সাথে যুদ্ধে নেমে যান এবং তিনি তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলে জাফর বিন আবী তালিব (র) পতাকা গ্রহণ করে বড় কঠিন অবস্থায় যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধ যখন প্রচন্ড ভয়াবহ রূপধারণ করে তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে আরো কঠিন যুদ্ধে লেগে যান এবং কবিতার ছন্দে ছন্দে মুসলিম যোদ্ধাদের উৎসাহিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। এক রোমান যোদ্ধা তাঁর শরীর দু'টুকরো করে ফেলে। তাঁর শরীরে পঞ্চাশের অধিক আঘাত পাওয়া যায়। অপর বর্ণনানুযায়ী নব্বইয়ের অধিক আঘাত পাওয়া যায়; তবে কোনো আঘাতই তাঁর পিঠে ছিল না। বরং সব আঘাতই শরীরের সম্মুখভাগে ছিলো[৩]।

তারপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে পতাকা গ্রহণ করেন এবং তিনিও কবিতার ছন্দে ছন্দে মুসলিম যোদ্ধাদের উৎসাহিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তারপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) কে যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নেতা নির্বাচন করা হয়। অতঃপর তিনি নেতৃত্ব গ্রহণের পর মুসলিম যোদ্ধাদের নতুনভাবে সাজালেন। ডানপাশের যোদ্ধাদের বামপাশে নিয়ে আসলেন আর বামপাশের

---

[১]) সূরাহ মরয়ম: ৭১।

[২]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৮-২৬০।

[৩]) সহীহ বুখারী [৪২৬০ ও ৪২৬১]।

যোদ্ধাদের ডানপাশে নিয়ে যান। এই পরিবর্তনের ফলে শত্রুপক্ষ মনে করলো মুসলিম বাহিনীর নতুনভাবে সাহায্য এসেছে এতে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। এই সুযোগে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) নিজের রণকৌশলে শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকেন এবং পরিশেষে তারা পরাজিত হয়। শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পরে তাদের ধাওয়া না করে তিনি শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্যের কথা চিন্তা করে মুসলিম যোদ্ধাদের গুছিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন[১]।

বিশিষ্ট সাহাবী আনাস (র) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, মদীনায় সংবাদ আসার পূর্বেই আল্লাহ'র রাসুল (স) যায়দ বিন হারিছাহ, জাফর বিন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা'র শাহাদাত বরণের সংবাদ দেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: যায়দ পতাকা গ্রহণ করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে, তারপর জাফর পতাকা গ্রহণ করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে, তারপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে-আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দুচোখে দিয়ে অশ্রু ঝরছে-অতঃপর আল্লাহ'র তরবারীসমূহের এক তরবারী পতাকা গ্রহণ করেছে এবং মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাতে বিজয় প্রদান করেছেন[২]।

সহীহ বুখারীর বর্ণীত হাদীস থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম বাহিনীকে একেবারে শেষ পর্যায়ে বিজয় প্রদান করেন। কিছু কিছু সীরাত গবেষকদের অভিমত যে, মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, পরে মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিমত সঠিক নয়; বরং শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পর মুসলিম যোদ্ধাগণ তাদের ধাওয়া না করার কারণে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। সমরনায়ক খালিদ বিন আল-অলীদ (র) এই কারণে শত্রুপক্ষের ধাওয়া করেননি, পাছে না শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে জেনে যায় এবং তারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করে বসে। শত্রুদের এই সুযোগ না দিয়ে তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের গুছিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটি ছিল বিশ্বখ্যাত যোদ্ধা সমর বিশেষজ্ঞ খালিদ বিন আল-অলীদের অভিনব রণকৌশল।

মুসলিম যোদ্ধাগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছালো আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের সাথে সেখানে গিয়ে সাক্ষাত করেন এবং শিশুরা এগিয়ে আসলে আল্লাহ'র রাসুল (স) শিশুদের নিতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: জাফর বিন আবী তালিবের শিশুটি আমাকে দাও। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন জাফরকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি শিশুটি তাঁর দুহাতে তুলে নিলেন... মুসলিমগণ যোদ্ধাদের দেখে পলায়ণকারী বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো ..তোমরা আল্লাহ'র রাস্তায় পালালে... অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তাঁরা পলায়ণকারী নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অভিযানের তিন নেতৃবৃন্দের [যথাক্রমে: যায়দ বিন হারিছাহ (র), জাফর বিন আবী তালিব (র) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র)] শাহাদাতের সংবাদ শুনে মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিমগণ যোদ্ধাদের দেখে পলায়ণকারী বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) তা সংশোধন করে দিলেন।

---

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৭/৩৬১-৩৬২।

[২]) সহীহ বুখারী [৪০১৪]।

মূতাহ'র যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা

প্রথমত: এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্যের কারণে শুরুতেই মুসলিম যোদ্ধাদের অন্তরে অনেকটা ভয়-ভীতি কাজ করেছে। ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন সাআদসহ সকল সীরাত গ্রন্থকারগণ শত্রুপক্ষের সংখ্যা প্রায় দুলক্ষের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন[১] অথচ মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি নয়। অর্থাৎ শত্রুপক্ষ মুসলিম যোদ্ধাদের পঞ্চাশগুণ! তাছাড়া শত্রুপক্ষের অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি, অস্ত্র-সস্ত্র ও রসদের কোনো কমতি ছিল না। অন্য দিকে মুসলিম যোদ্ধাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি, অস্ত্র-সস্ত্র ও রসদের ঘাটতি ছিল।

দ্বিতীয়ত: মুসলিম যোদ্ধাদের অন্তরে ভয়-ভীতির অন্য কারণ হলো এটি মূলত গাযওয়াহ নয় সারিয়্যাহ। যেখানে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স) সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। শত্রুপক্ষের জনসমুদ্রের সামনে মুসলিম যোদ্ধাদের কোনো রকমের তুলনা চলে না, তা সত্ত্বেও মুসলিম যোদ্ধাগণ অগ্রগামী ছিলেন, পলায়ণকারী ছিলেন না; যা প্রমাণ করে একে একে নেতৃত্ব প্রদানকারী তিন সমরনায়কের শাহাদাতের পরও তাঁরা রণাঙ্গন ছেড়ে পলায়ণ করেননি দেখে শত্রুপক্ষের অনেক যোদ্ধাদের মনেও ভয়-ভীতি ভর করে বসে। পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা খালিদ বিন আল-অলীদ (র)'র রণকৌশল শত্রুপক্ষের অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ মুসলিম যোদ্ধাগণ-যেমন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র) এই যুদ্ধের শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুসলিম যোদ্ধাদের উৎসাহ প্রদান করে বলেছিলেন-শত্রুর বিরুদ্ধে সংখ্যা, শক্তি ও সংখ্যাধিক্য নিয়ে যুদ্ধ করেন না, তাঁরা অবশ্যই যুদ্ধ করেন শুধুমাত্র দ্বীনের উদ্দেশ্যে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন।

মূতাহ যুদ্ধে উদ্ভাবিত শরয়ী বিধান

এই যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সরাসরি উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর দিক-নির্দেশনা মতে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার কারণে বেশ কিছু ফিক্‌হী বিধান এই অভিযানে উদ্ভাবিত হয় যার অন্যতম:

১) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশনা ও উপদেশ মতে খলীফা অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান ইচ্ছা করলে এক অভিযানে একাধিক সমরনায়ক বা প্রধান নিয়োগ প্রদান করতে পারেন; যারা পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন, যেমনটি আল্লাহ'র রাসুল (স) এই অভিযানে তিন জন সমরনায়কের নাম ঘোষণা করেছিলেন; তাঁরা হলেন যথাক্রমে: যায়দ বিন হারিছাহ (র), জাফর বিন আবী তালিব (র) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র)। অধিকাংশ ফকীহগণের মতে এই অবস্থায় একই সময়ে সকলেই সমরনায়কের দায়িত্বে থাকবেন; তবে দায়িত্ব একসাথে নয় পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে[২]।

২) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশনা ও উপদেশ মতে রণাঙ্গনে সমরনায়কের অনুপস্থিতিতে সমরনায়ক নির্বাচনে মুসলিম যোদ্ধাদের ইজতিহাদ করার অধিকার ইসলামী

[১]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/১৭৫ ও সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত:২/৩৭৬।

[২]) ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৭/৩৬১।

বিধান মতে স্বীকৃত। পাশাপাশি মুসলিমদের নেতার অনুপস্থিতিতে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করে নেয়া অপরিহার্য ও আবশ্যক।

৩) পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যোদ্ধারা মদীনায় ফিরে আসার পূর্বে বরং যুদ্ধকালীন সময়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) অশ্রুসজল হয়ে মদীনায় তাঁর সাহাবীদের অভিযানের তিন সমরনায়ক যথাক্রমে: যায়দ বিন হারিছাহ (র), জাফর বিন আবী তালিব (র) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র)'র শাহাদাতের সংবাদ প্রদান করেন; অথচ মদীনা ও রণাঙ্গনের দূরত্ব অনেক। এই অস্বাভাবিক দূরত্বের সংবাদ প্রদান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স)'র সম্মানার্থে ভূমি সংকুচিত করে নিজের চোখের সীমানায় নিয়ে আসেন এবং তিনি রণাঙ্গনের চিত্র স্বচক্ষে দেখে অশ্রুসজল হয়ে একে একে অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানকারী তিন সমরনায়কের শাহাদাতের বর্ণনা দেন। পরে মুসলিম যোদ্ধাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত নতুন সমরনায়কের যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণের সুসংবাদ দিয়ে ঘোষণা দেন যে, এই সমরনায়কের হাতেই উক্ত অভিযানের বিজয় পতাকা উড়বে। এটি ছিল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসংখ্য মুজিযাহ বা অলৌকিক ঘটনাসমূহের একটি যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে অসংখ্যবার সম্মানিত করেছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অশ্রুসজল কান্নায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

৪) তিন সমরনায়কের শাহাদাতের হৃদয় নিঙড়ানো বর্ণনার পর "আল্লাহ'র তরবারীসমূহের এক তরবারী যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাঁর হাতে বিজয়ের সুসংবাদ" প্রদান বিশ্বখ্যাত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা খালিদ বিন আল-অলীদ (র)'র জন্য বিশেষ মর্যাদা বহণ করে। এটি ছিল সমরনায়ক খালিদ বিন আল-অলীদ (র)'র ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম রণাঙ্গনের অংশগ্রহণ; যেখানেই তিনি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষ থেকে "সাইফুল্লাহ" বা আল্লাহ'র তরবারী উপাধিতে ভূষিত হন। তাছাড়া এই যুদ্ধে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে "এই যুদ্ধে তাঁর হাতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গে যায়"[১]।

৫) এত বড় বিজয়ের পরেও বিজয়ী দল মদীনায় পৌঁছালে মুসলিমগণ তাদের পলায়নকারীদল হিসেবে আখ্যা দিয়ে চিৎকার শুরু করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অভিযানের তিন নেতৃবন্দের [যথাক্রমে: যায়দ বিন হারিছাহ (র), জাফর বিন আবী তালিব (র) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (র)] শাহাদাতের সংবাদ শুনে এবং শত্রুপক্ষকে ধাওয়া না করার কারণে মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিমগণ যোদ্ধাদের দেখে পলায়ণকারী বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) তা সংশোধন করে দিলেন।

শত্রুপক্ষকে ধাওয়া না করে তিনি বরং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, কারণ শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে জেনে পুনরায় সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল। এই সুযোগ না দিয়ে তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের গুছিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং এটি ছিল বিশ্বখ্যাত যোদ্ধা খালিদ বিন আল-অলীদের অভিনব রণকৌশল।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪২৬৫] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৭০৮৯]।

মক্কাহ বিজয়ের অভিযান

মক্কাহ বিজয়ের অভিযানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরাইশদের সাথে মহানবী (স)'র হুদাইবিয়া'র সন্ধির অঙ্গিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। এই সন্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদান হলো "যারা মুহাম্মদ (স)'র সাথে থাকতে চান তারা তাঁর অঙ্গিকারের অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং অনুরূপভাবে যারা কুরাইশদের সাথে থাকতে চায় তারা তাদের অঙ্গিকারের অন্তর্ভূক্ত হবে"[১]। এর ভিত্তিতে খুযাআহ গোত্র মহানবী (স)'র দলে অন্তর্ভূক্ত হলেন এবং অন্যদিকে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের দলে অন্তর্ভূক্ত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খুযাআহ গোত্র ও বনু বকর গোত্রের মধ্যে পূর্ব থেকে যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল যা হুদাইবিয়া'র সন্ধির কারণে থেমে যায় এবং প্রতিটি দলই সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।

মক্কাহ বিজয় অভিযানের প্রেক্ষাপট

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, খুযাআহ গোত্র ও বনু বকর গোত্রের মধ্যে পূর্ব থেকে যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল, এরই পরিপ্রেক্ষিতে বনু বকর গোত্রের কিছু লোক কুরাইশদের কাছে খুযাআহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সামারস্ত্র ও লোক দিয়ে তাদের সাহায্য করার আবেদন করলে কুরাইশদের একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং তাতে বনু বকর গোত্রের সামনে খুযাআহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আসে। কুরাইশদের মধ্যে ইকরামাহ বিন আবী জাহ্লসহ কিছু নেতৃস্থানীয় লোক তাদের উৎসাহিত করে এবং সামারস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় কোনো এক রাতে খুযাআহ গোত্রের কিছু লোক "অথীর" নামক স্থানে নিরাপদে অবস্থান করেছিল। অতঃপর হঠাৎ বনু বকর গোত্রের লোকজন তাদের ওপর আক্রামণ করে খুযাআহ গোত্রের বিশজন লোককে হত্যা করলে খুযাআহ গোত্রের লোকজন ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পালিয়ে বুদাইল বিন অরকাহ'র ঘরে আশ্রয় নেয় এবং তারা তাঁকে কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের বিরুদ্ধে মহানবী (স)'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। পাশাপাশি আমর বিন সালিম খুযায়ী দ্রুত মদীনার পথে যাত্রা শুরু করে মহানবী (স)'র সামনে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (স) সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে নাবভীতে ছিলেন। আমর বিন সালিম খুযায়ী মহানবী (স) কে রাত্রে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর সহযোগিতা কামনা করলে মহানবী (স) বলেন "হে আমর বিন সালিম! তুমি বিজয়ী হয়েছ"[২]।

কুরাইশদের বিরুদ্ধে সন্ধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

বুদাইল বিন অরকাহও খুযাআহ গোত্রের ভীতসন্ত্রস্থ কিছু লোকজন নিয়ে মহানবী (স)'র সামনে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন এবং খুযাআহ গোত্রের ওপর কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের হামলার কথা উল্লেখ করেন। তখন মহানবী (স) বলেন কুরাইশ যা করেছে তা সরাসরি সন্ধি লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে এবং এর একমাত্র প্রতিদান মক্কাহ বিজয় ছাড়া আর

---

[১]) সীরতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত:৩/৩০৯ ও হুসাইন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৫৭।

[২]) ঘটনাটি ইব্ন সাআদ তার তাবকাত গ্রন্থে ও ইব্ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে অভিন্ন অর্থে (ভাষা ভিন্ন) বর্ণনা করেছেন।

কিছুই হতে পারে না। অতঃপর তিনি সমগ্রআরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত মুসলিমদের নিকট নির্দেশ প্রদান করে দিলেন তাঁরা যেন মক্কাহ বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে[১]।

সন্ধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খন্ডাতে কুরাইশদের প্রচেষ্টা

সন্ধি লঙ্ঘনের আনীত অভিযোগ খন্ডাতে কুরাইশদের বিজ্ঞজন ও বুদ্ধিজীবিরা ইকরামাহ বিন আবী জাহ্‌লসহ যুবকদের কৃতকর্মকে সরাসরি সন্ধির লঙ্ঘন হিসেবে ধরে নিল এবং তারা উপলব্ধি করলো যে, কুরাইশদের এই পদক্ষেপ আরব উপদ্বীপ তথা আরবাঞ্চলে মুহাম্মদ (স)'র গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে। পাশাপাশি শক্তি-সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাবে। যদি খুযাআহ গোত্রের ওপর কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের হামলার কারণে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রবিত্র নগরী আক্রমণ করে তা খুবই ভয়াবহ হবে বিধায় কুরাইশ অনেক ভেবে-চিন্তে চুক্তি আরো মজবুত ও দৃঢ় করতে এবং সময় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ানকে মদীনায় পাঠিয়ে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধি ও মজবুত করতে প্রচেষ্টা চালায়[২]।

কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং উসফান নামক স্থানে পৌঁছে বুদাইল বিন অরকাহ ও তাঁর সফরসঙ্গীদের মদীনা থেকে আসতে দেখে আবু সুফয়ানের আশঙ্কা হলো; তারা অবশ্যই মুহাম্মদ (স)'র কাছে গিয়েছিল এবং ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে; যদিও বুদাইল বিন অরকাহ মুহাম্মদ (স)'র সাথে তার সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে। এটি তার মদীনা যাত্রাকে আরো জঠিল করবে চিন্তা করে প্রথমে আবু সুফয়ান সরাসরি মহানবী (স)'র সাক্ষাতের পরিবর্তে তার কন্যা (নবীপত্নি) উম্মে হাবীবাহ'র ঘরের দিকে গেল[৩]।

নিজ কন্যার কাছে কুরাইশ দলপতি আশাহত

নবীপত্নি উম্মে হাবীবাহ (র) কুরাইশদের ব্যাপারে মহানবী (স)'র ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যদিও তিনি মক্কাহ বিজয়ের ব্যাপারে মহানবী (স)'র পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সম্ভবত মদীনার সকল মুসলিমই এ ব্যাপারে অন্ধকারে ছিলেন। অতঃপর আবু সুফয়ান মহানবী (স)'র বিছানায় বসতে চাইলে নবীপত্নি উম্মে হাবীবাহ (র) বিছানার চাদর গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফয়ান যখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলো: এই চাদর তোমার বাবার উপযোগী নয় মনে করে তুমি চাদর গুটিয়ে দিলে? উত্তরে নবীপত্নি উম্মে হাবীবাহ (র) বললেন: এটি আল্লাহ'র রাসুলের (স) চাদর আর আপনি মুশরিক অপবিত্র বিধায় আমি চাই না আপনি তাতে বসুন। এ উত্তর শুনার পর আবু সুফয়ান বললো: [হে আমার মেয়ে! আল্লাহ'র শপথ! আমার পরে তোমার মঙ্গল হবে না][৪] এই বলে তিনি রাগ করে মেয়ের ঘর থেকে বের হয়ে যান।

---

[১]) হাদীসটি (ভাবার্থ) ইব্‌ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, প্রাগুক্ত:২/৩০৮।

[২]) হুসাইন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৮।

[৩]) ঘটনাটি (ভাবার্থ) ইব্‌ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, প্রাগুক্ত:২/৩১২।

[৪]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৪/৪৭৯, শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্‌হাব, মুখতাসারু সীরাতে আর-রাসুল (স), প্রাগুক্ত:১৪৭, মুহাম্মদ আলী আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৬৯৮।

অতঃপর তিনি মহানবী (স)'র নিকট উপস্থিত হয়ে চুক্তি দৃঢ় করে মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কথা বললে মহানবী (স) এর কোনো উত্তর প্রদান করেননি। তারপর সে একই বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রধান সাহাবী আবু বকর (র)'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি অপরাগতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি অন্যতম সাহাবী উমর (র)'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি একটু কঠোরভাবে উত্তর দিয়ে বললেন "আমি তোমার জন্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে সুপারিশ করবো? আমি তোমাকে পিঁপড়ার মতোও জানি না; না হয় তোমার সাথে মোকাবিলা করতাম"। তারপর অতিপ্রিয় সাহাবী আলী (রা) কাছে গেল সেখানে ফাতিমা (র)ও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর আলী (র)'র কাছে তার মদীনায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে সুপারিশ করতে বললো। আলী (র) নম্রভাবে বললেন: মুহাম্মদ (স) কে কেউ রুখতে পারবে না যদি তিনি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

অতঃপর তিনি আলী (র)'র পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন যে, আমি এমন কিছু জানি না যা আপনাকে সাহায্য করবে। তবে আপনি কিনানাহ গোত্রের নেতা; তাদের কাছে যান এবং তাদের নিকট আপনার জনগণের আশ্রয় প্রার্থনা করুন। অতঃপর আপনার অঞ্চলে চলে যান। আমার মনে হয় না তা যথেষ্ট; তবে এটা ছাড়া আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারছি না। অতঃপর তিনি মসজিদে নাবভী'র দিকে যান এবং সেখানে তার জনগণের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনার ঘোষণা করলেন, তারপর তার বাহনে চড়ে মক্কাহ'র দিকে রওনা দিলেন। তার স্বীয় কন্যার কাছে অসম্মানিত হয়ে এবং যারা হিজরতের পূর্বে তার একটুখানি সহানুভূতি ও সন্তুষ্টির জন্য অধীর আগ্রহে থাকতো; তাঁদের হাতে অপমানিত হয়ে দুঃখ ও কষ্টে তার অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হয়[১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরাইশদের সরাসরি সন্ধি লঙ্ঘনের কারণে কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ানের চুক্তি দৃঢ়করণ ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কোনোটাই মহানবী (স) গ্রহণ করেননি। মহানবী (স)'র উক্ত সিদ্ধান্তে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সন্ধির লঙ্ঘন গ্রহণ না করা সীমালঙ্ঘন নয়; তবে সীমালঙ্ঘনের ওপর পীড়াপীড়ি অনেকটা সন্ধি লঙ্ঘনের মতোই।

বদরী সাহাবীর অনাকাঙ্খিত আচরণ

ইসলামের ইতিহাসে ও শরয়ী বিধান মতে বদরী সাহাবীদের মর্যাদা অপরাসীম যা সর্বজন স্বীকৃত। তবে এই যুদ্ধে মহানবী (স) ও মুসলিমগণ এক অনাকাঙ্খিত ঘটনার মুখোমুখী হন তা হলো বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জ্যেষ্ঠ সাহাবী হাতিব বিন আবী বালতাআহ (র) কুরাইশদের বিরুদ্ধে মহানবী (স)'র যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে কুরাইশদের একটি পত্র পাঠান। মহানবী (স) অহীর মাধ্যমে এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্র আলী (র), যুবাইর (র) এবং মিকদাদ (র) কে "রাওদ্বাতু খাখ" নামক খেজুর বাগানে জনৈক মহিলার কাছ থেকে পত্রখানা নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন।

আলী (র)'র দল উপরিউক্ত স্থানে মহিলাকে পেয়ে পত্র বের করতে বললে মহিলা সরাসরি তার কাছে কোনো পত্র থাকার কথা অস্বীকার করে। অতঃপর আলী (র) বলেন:

---

১) ঘটনাটি ইব্ন সা'দ তার তাবকাতে গ্রন্থে এবং ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে অভিন্ন অর্থে (ভাষা ভিন্ন) বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: মুহাম্মদ আলী আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত: ৬৯৮-৭০০।

"তুমি পত্র বের করবে অথবা আমরা তোমার কাপড় খুলে তল্লাসী চালাবো"। তারপর মহিলা চুলের খোঁপা থেকে পত্র বের করে দেয় এবং আলী (র)'র দল পত্রসহ মহিলাকে নিয়ে মহানবী (স)'র নিকট উপস্থিত হন। পত্র খোলার পর দেখা গেল যে, হাতিব বিন আবী বালতাআহ (র) কুরাইশদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেছেন যেখানে তিনি মহানবী (স)'র যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তাদের ওপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের ব্যাপারে সর্তক করেন। অতঃপর মহানবী (স) হাতিব বিন আবি বালতাআহ (র) কে বললেন : এটা কী হে হাতিব! উত্তরে হাতিব বিন আবী বালতাআহ (র) বললেনঃ হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি আমার ব্যাপারে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি কুরাইশদের মিত্র ছিলাম তবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সঙ্গী অধিকাংশ মুহাজিরের সাথে কুরাইশদের আত্মীয়তা রয়েছে বিধায় তারা তাঁদের পরিবার ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবে। আমার সাথে যেহেতু কুরাইশদের কোনো আত্মীয়তা নেই তাই তাদের সহানুভূতি আদায় করে আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের যেন তারা কোনো ক্ষতিসাধণ না করে সেই কারণেই এই পত্র লিখেছি। আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে এই কাজ করিনি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেনঃ সে তোমাদের সত্য বলেছে। উমর (র) বলেন হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনি আমাকে এই মুনাফিকের (বিশ্বাসঘাতকের) ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দিন[১]।

তবে আল্লাহ'র রাসুল (স) উমর (র) র আবেদন অনুমোদনে সাড়া প্রদান করেননি এবং বললেন:"সে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কী জানো না, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো তোমাদের ক্ষমা করা হয়েছে"[২]। হাতিব বিন আবী বালতাআহ (র) বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন। উপরিউক্ত ঘটনাকে হুসাইন হায়কাল "হায়াতে মুহাম্মদ" গ্রন্থে এক প্রকার মানবিক দূর্বলতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণও কোনো কোনো সময় এর উর্ধ্বে নন[৩]।

সব যুগেই যুদ্ধের ভাষায় সাধারণত এই রকম ঘটনাকে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচনা করা হয়। এই রকম ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিকে চুড়ান্ত শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, গুপ্তচরবৃত্তি যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভূক্ত। আন্তর্জাতিক আইনে গুপ্তচরবৃত্তিকে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ উমর (র) হাতিব'র পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও এই কর্মকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই গণ্য করলেন।

এই ঘটনায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে আমরা নতুন এক যুদ্ধনীতির সন্ধান পাই, আর তা হলোঃ যুদ্ধাবস্থায় অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে কোনো সৈন্যকে অবাঞ্ছিত ভুলের জন্য শাস্তি প্রদান করা সঠিক নয়; যাতে নিজ সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩০০৭ ও ৪৮৯০],সহীহ মুসলিম [২৪৯৪], সুনান আবী দাউদ [২৬৫০], জামে তিরমিযী [৩৩০৫] ও মুসনাদ আহমদ [৬০০]।

[২]) সহীহ বুখারী [৪৮৯০] ও সহীহ মুসলিম [২৪৯৪]।

[৩]) হুসাইন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৮।

সৃষ্টি হতে পারে। অতঃপর মহানবী (স) হাতিব (র) কে তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দিলেন[১]।

পাশাপাশি যুদ্ধে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে যোদ্ধাদলকে সম্ভাব্য সব পন্থা অবলম্বন করতে হয় এবং তার মধ্যে রমাদ্বান মাসে সিয়াম ছেড়ে দেয়াও রয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ'র দিকে রওনা দিয়ে "কাদীদ অঞ্চল" নামক স্থানে পৌঁছে সিয়াম ছাড়লেন এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণও সিয়াম ছাড়লেন।

মক্কাহ বিজয় অভিযানের চিত্রায়ন

আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় কুলছুম বিন হুসাইন (র) কে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী আরবাঞ্চলের বিভিন্ন আরবগোত্রদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠালে গিফার, মুযাইনাহ ও জুহাইনাসহ বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী "মার্‌রু আয-যাহরান" নামক স্থানে সমবেত হলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিম বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে কুরাইশ তখনও অন্ধকারে ছিল; তবে কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ানের চুক্তি দৃঢ়করণ ও মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মদীনায় আগমন ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধপ্রস্তুতি বা সরাসরি আক্রমণের আশঙ্কা করেছিল বিধায় মুসলিমদের সংবাদ সংগ্রহ করতে দলপতি আবু সুফয়ান, হাকীম বিন হিযাম ও বুদাইল বিন অরকাহকে প্রেরণ করা হয়। তারা সংবাদ সংগ্রহে কিছুদূর এগিয়ে এসে যাহরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পৌঁছালে রাতের বেলা দেখতে পায় শুধু আগুন আর আগুন। আবু সুফয়ান রাত্রের অন্ধকারে এত আগুন দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং একে অপরকে আগুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুসন্ধানী যোদ্ধাদের নজরে পড়ে যায় এবং তাঁরা আবু সুফয়ান ও তার সঙ্গীদের আটক করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে নিয়ে আসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজের আগুন (রান্নার চুলা) প্রজ্বলন করে; যাতে করে কুরাইশদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়া যায়। খবর সন্ধানে এসে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অনুসন্ধানী যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে আবু সুফয়ান বললো:"আজ রাতের মতো এত আগুন ও যোদ্ধা কখনো দেখিনি"[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে তাদের নিয়ে আসার পর বুদাইল এবং হাকীম ইসলাম গ্রহণ করলেও কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ান ইসলাম গ্রহণে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল এবং রাত অতিবাহিত করার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্‌ন ইসহাক আব্বাস (র)'র বরাতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাস বলেন: সকালে আমি তাঁকে নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে উপস্থিত হলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে দেখে বলেন: হে আবু সুফয়ান! দূর্ভাগ্য তোমার,"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এ

---

১)ঘটনাটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে যেমন: ইব্‌ন সাআদ তাঁর তাবকাত গ্রন্থে, ইব্‌ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে, মুহাম্মদ আল-গযালী তাঁর ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী তাঁর ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে এবং হুসাইন হায়কাল তাঁর হায়াতে মুহাম্মদ গ্রন্থে।

২) সহীহ বুখারী [৪০৩০]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৪।

কথার স্বীকৃতি প্রদানের এখনো কি তোমার সময় হয়নি? এখনো কি তোমার মনে হয় না "আমি আল্লাহ'র রাসুল?" আবু সুফয়ান বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তবে ইসলাম সম্পর্কে এখনো আমার অন্তরে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। আব্বাস (র) বললেন: দূর্ভাগ্য তোমার! ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করো এবং সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল। অতঃপর তিনি সত্যিকারে কলিমাহ শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন[১]।

ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে কৌশল গ্রহণ

আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে মার্‌রু আয-যাহরান ত্যাগ করার সময় আবু সুফয়ানের মনে ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র সৈন্যদল যেই রাস্তা দিয়ে প্রস্থান করবেন সেই স্থানে আবু সুফয়ানকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আব্বাস (র) কে নির্দেশ দেন যাতে তিনি তাঁদের প্রত্যক্ষ করতে পারেন। অতঃপর তাই করা হলো; যখন একদল যোদ্ধা তাঁদের অতিক্রম করলো তখন আবু সুফয়ান আব্বাস (র) কে জিজ্ঞাসা করেন: এরা কারা? আব্বাস (র) উত্তরে বললেন : সুলাইম গোত্র। অতঃপর আবু সুফয়ান বলেন: আমার সাথে সুলাইম গোত্রের কী শত্রুতা? তারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে? তারপর আরেক দল সৈন্য অতিক্রম করলে পুনরায় আবু সুফয়ান আব্বাস (র) কে জিজ্ঞাসা করেন: এরা কারা? আব্বাস (র) উত্তরে বললেন: মুযায়নাহ গোত্র, আমার সাথে মুযায়নাহ গোত্রের কী শত্রুতা? তারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে? এভাবে যখনই কোনো সৈন্যদল তাদের অতিক্রম করে আবু সুফয়ান আব্বাস (র) কে জিজ্ঞাসা করেন: এরা কারা? আব্বাস (র) উত্তরে বলেন: অমুক দল। অতঃপর মুহাজির এবং আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের অতিক্রম করলে আবু সুফয়ান বলে উঠেন: এই বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন: এরা কারা? আব্বাস (র) উত্তরে বললেন: মুহাজির এবং আনসারদের নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) যাচ্ছেন। তখন আবু সুফয়ানের মুখ ফস্‌কে বের হয়ে গেল: তোমার ভাতিজার রাজত্ব আজ বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। সাথে সাথে আব্বাস (র) বললেন: হে আবু সুফয়ান এটি (রাজত্ব নয়) নুবুওয়্যত, আবু সুফয়ান বলেন: তবে তাই হবে[২]।

আবু সুফয়ান সারা জীবন নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং আজ রাতারাতি সাধারণ মানুষে পরিণত হলেন; যা তাঁর হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করছিল। অতঃপর আব্বাস (র) তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে এসে বললেন: আবু সুফয়ান

---

[১]) সহীহ বুখারী [১৫৭৫, ১৫৭৭, ১৫৮১, ৪২৮০ ও ৪২৯০] ও সহীহ মুসলিম [১২৫৭ ও ১২৬০]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৪।

[২]) ঘটনাটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে যেমন: ইব্‌ন সাআদ তাঁর তাবকাত গ্রন্থে, ইব্‌ন হিশাম তাঁর সীরাহ গ্রন্থে, মুহাম্মদ আল-গযালী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, এবং হুসাইন হায়কাল তার হায়াতে মুহাম্মদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত:২৬৪-২৬৫।

বরাবরই গর্ব করা পছন্দ করে। অতঃপর আপনি যদি তাঁর জন্যে কোনো ঘোষণা দেন; যা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেনঃ হ্যাঁ, যে আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ[১]।

তারপর আব্বাস (র) তাঁকে বললেনঃ তোমার লোকদের বাচাও!... অতঃপর আবু সুফয়ান আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ পৌঁছানোর পূর্বে দ্রুত মক্কাহ প্রবেশ করেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যে মুহাম্মদ (স) তোমাদের কাছে এসে গেছেন। তোমাদের কারো তাঁকে প্রতিরোধ করার শক্তি নেই। তবে যে আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর তাঁর স্ত্রী হিন্দ ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর গোফ ধরে টেনে-হিচড়ে বললোঃ তুমি দলপতি ছোট-বড় যাকে পাও তাকে হত্যা করো। অতঃপর আবু সুফয়ান বললেনঃ ধ্বংস অনিবার্য, তোমাদের আত্মমর্যদাবোধ তোমাদের প্রতারণায় ফেলে দিয়েছে। আজ তোমাদের কারো তাঁকে প্রতিরোধ করার শক্তি নেই। যে আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। তারা তাঁকে বললোঃ আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন! তোমার ঘরে কয়জনের স্থান হবে? তিনি বললেনঃ যে নিজ বাড়ীর দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। অতঃপর লোকজন তাদের ঘরে ও মসজিদে হারামে আশ্রয় নেয়[২]।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই দিনেও যুদ্ধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং পবিত্র মক্কাহ নগরীর সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসারদের পতাকাবাহী সাআদ বিন ওবাদাহ'র মুখে আবু সুফয়ানকে দেখার পর যখন শুনলেন{اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة}[আজ অভ্যুত্থান ও রক্তপাতের দিন, আজ কাবা'র নিষেধাজ্ঞা বৈধ করার দিন] সাথে সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেনঃ{بل اليوم يوم الرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة}[আজ দয়া প্রদর্শনের দিন, আজ আল্লাহ কাবাহ'র মর্যদা প্রদান করবেন] এবং সাআদ বিন ওবাদাহ'র হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে তাঁর ছেলে কায়সের হাতে তুলে দিলেন[৩]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রজ্ঞাময় আচরণের কারণে মক্কাবাসী বিশেষভাবে কুরাইশদের শঙ্কা দূর হয়ে যায় যে, ইসলামের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়। পাশাপাশি আল্লাহ'র রাসুল (স) আনসার দলপতি সাআদ বিন ওবাদাহ'র হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে কোনো মুহাজিরের হাতে পতাকা প্রদান করেননি বরং তাঁর ছেলের হাতে পতাকা প্রদান করে আরো বিচক্ষণতার পরিচয় দেন; কারণ মানুষ নিজ সন্তান ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে স্বভাবগতভাবে সম্মানবোধ করে না এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) সেটিই করলেন।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন কারো সাথে লড়াই না করে। তবে দশজন ব্যতীত (ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলা), তাদের যেখানেই পাওয়া যায় হত্যার নির্দেশ দেন। তারা হলোঃ ইক্‌রামাহ বিন

[১]) সুনান আবী দাউদ [৩০২১]।

[২]) সুনান আবী দাউদ [৩০২২]।

[৩])সহীহ বুখারী [৪২৮০]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুনঃ সাঈদ রম্বাদান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৬৭।

আবী জাহ্ল, হাবার বিন আসওয়াদ, আবদুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবী সার্হ, মুকাইস বিন সাবাবাহ আল-লাইসী, আল-হুওয়াইরিস বিন নুকাইদ, আবদুল্লাহ বিন খাতাল, হিন্দ বিন্তে উৎবাহ, আমর বিন হিশামের (আবু জাহ্ল) মুক্ত দাসী সারাহ এবং ফারতনা ও কুরাইনাহ [দাসীদ্বয় সবর্দা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কুৎসা রটনা করে সঙ্গিত পরিবেশন করতো][১]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ'র উচ্চাঞ্চল দিয়ে মক্কাহ প্রবেশ করেন এবং খালিদ বিন অলীদ (র) কে মক্কার নিম্মাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মতে বিনা বাধায় মক্কাহ প্রবেশ করেন। কোথাও কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। তবে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) কুরাইশদের একটি দল কর্তৃক প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। যাদের মধ্যে ইক্রামাহ বিন আবী জাহ্ল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহসহ অনেকেই ছিল। খালিদ বিন অলীদ (র) তাদের সাথে প্রতিরোধযুদ্ধে লিপ্ত হন। অতঃপর কুরাইশের চব্বিশ জন ও হুযাইল গোত্রের চার জন প্রতিরোধযুদ্ধে নিহত হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) দূর থেকে তরবারীর ঝিলিক দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয়: তিনি খালিদ বিন অলীদ (র) প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন:{ قضاء الله خير}[আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত উত্তম][২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের বিবরণ

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ বিন আবী বকর (র) থেকে এবং প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক হাকিম আনাস (র) থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের দৃশ্যের বর্ণনা দেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছালে মক্কাহ বিজয়ের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেন। উটের পীঠে আরোহণরত অবস্থায় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, বিনয়ী হয়ে সূরাহ আল-ফাত্হ পাঠ করতে করতে অবনত মস্তকে প্রবেশ করেন; যেন মনে হয় তাঁর শ্মশ্রু বাহনের মধ্যাংশ স্পর্শ করছে।

আল্লাহ'র রাসুল (স) বায়তুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে মক্কাহ প্রবেশ করেন; তখন বায়তুল্লাহ'র চতুর্পার্শ্বে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) একের পর এক মূর্তিগুলোকে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলেন:{ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}[সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল][৩]। বায়তুল্লাহ'র ভিতরেও কিছু মূর্তি ছিল তিনি বায়তুল্লাহ'র ভিতরে মূর্তি থাকা অবস্থায় প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং ভিতরের মূর্তিগুলো বের করে আনার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ'র ভিতর থেকে ইবরাহীম (আ) ও

---

[১]) সহীহ নাসায়ী [৪০৭৮]। হাদীসটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং শায়খ আলবানী সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলার নাম বিভিন্ন বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।

[২]) ঘটনাটি তাবকাতে ইব্ন সাআদ,সীরাতে ইব্ন হিশাম ও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৮/৮-৯।

[৩]) সূরাহ বনী ইসরাঈল:৮১।

ইসমাঈল (আ) হাতে জুয়ার কাঠি সম্বলিত দুটি মূর্তি বের করে আনার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা অবশ্যই জানে ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কখনো এই কাঠি দিয়ে জুয়া খেলেননি। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ভিতরে প্রবেশ করেন এবং বায়তুল্লাহ'র ভিতরে চতুর্পার্শ্বে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনী তোলে বেরিয়ে আসলেন। তবে ভিতরে কোনো নামায আদায় করেননি[১]। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর বর্ণনানুযায়ী তিনি বায়তুল্লাহ'র অভ্যন্তরে নামায আদায় করেছেন[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) উসমান বিন তালহা (বায়তুল্লাহ'র তত্ত্বাবধায়ক) কে চাবি নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি চাবি নিয়ে আসলে বায়তুল্লাহ'র দরজা খোলা হয় এবং তিনি বায়তুল্লাহ'য় প্রবেশ করেন। অতঃপর বের হয়ে উসমান বিন তালহাকে ডেকে চাবি দিয়ে বললেন: {خذوها خالدة مخلدة، إني لم أدفعها إليكم (أي حجابة البيت) ولكن الله دفعها إليكم، ولا ينزعها منكم إلا ظالم}[চিরদিনের জন্য তুমি এটি গ্রহণ করো, আমি তোমদেরকে এই চাবি প্রদান করিনি বরং আল্লাহ তোমাদের চাবি প্রদান করেছেন। কোনো জালিম ব্যতীত এই চাবি তোমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিবে না][৩] বলে কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও][৪]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) বেলালকে বায়তুল্লাহ'র ছাদে উঠার নির্দেশ দিলে তিনি ছাদে উঠে নামাযের আযান দেন। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) হাত দিয়ে বায়তুল্লাহ'র দরজা ধরে দাঁড়ান। তাঁর চতুর্পার্শ্বে মানুষ সমবেত হতে থাকে এবং তারা জানে না তাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করা হবে? এই উৎকণ্ঠায় অপেক্ষার সময় অতিবাহিত করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বক্তব্য প্রদান করেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ ও তাঁর কোনো শরিক নেই এবং তিনি একক। যিনি তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি একা দলসমূহকে পরাজয় করেছেন। বায়তুল্লাহ'র তত্ত্বাবধায়ন ও হাজ্বীদের পানি পান করানো ব্যতীত ইসলামপূর্ব প্রতিশোধ, রক্ত ও সম্পদের সকল দাবি আমার এই দুপায়ের নীচে চাপা দেয়া হলো। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের বাপ-দাদা নিয়ে অহংকার ও জাহেলী যুগের আভিজাত্য দূর করে দিয়েছেন। সমগ্র মানবজাতি আদম থেকে (সন্তান) এবং আদম মাটির সৃষ্টি। তারপর তিনি কুরআন করীমের নিম্মোক্ত আয়াত পাঠ করেন: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[হে মানবেরা! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা

---

১) সহীহ বুখারী [১৬০১ ও ৪২৮৮] এবং সহীহ মুসলিম [১৩৩১]।
২) সহীহ বুখারী [১১৬৭ ও ৩৯৭] এবং সহীহ মুসলিম [১৩২৯]।
৩) সহীহ বুখারী [৪২৮৯]।
৪) সূরাহ আন-নিসা:৫৮।

পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ'র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাকওয়বান][1]। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সাথে কী রকম আচরণ করবো বলে তোমরা আশা করো? তারা সকলেই বললো: উত্তম, আপনি সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাতুষ্পুত্র। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন: যাও তোমরা সকলেই মুক্ত"[২]।

সেই মহান দিনে আল্লাহ'র রাসুল (স) পবিত্র মক্কাহ নগরীর অমর্যাদা হোক তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং কাবাহ শরীফে প্রবেশ করে জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন এবং বলেন: হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী ও সৌরজগত সৃষ্টিলগ্নে মক্কাহ নগরীর অমর্যাদা অবৈধ ঘোষণা করেন এবং আল্লাহ'র এই নিষেধাজ্ঞা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্য এখানে রক্তপাত করা, এবং এর কোনো বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। কেউ যদি মনে করে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে যুদ্ধের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা বলে দাও নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স)'র জন্য অনুমতি দিয়েছেন তোমাদের জন্য নয়; অবশ্যই কিছুক্ষণ আমার জন্য বৈধ ছিল। তারপর তার সম্মান ও মর্যাদা গতকালকের ন্যায় আজ আবারো ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তোমরা উপস্থিত সকলে অনুপস্থিত সকলকে এই বানী পৌঁছিয়ে দাও[৩]। ঐদিন খুযাআহ গোত্র ইসলাম পূর্ববর্তী সময়ের এক হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে লাইস গোত্রের এক লোককে হত্যা করে বসে। এই সংবাদ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আসার পর তিনি বললেন: হে খুযাআহ সম্প্রদায়! হত্যা থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। হত্যা অনেক হয়েছে কোনো লাভ হয়নি। তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার রক্তপণ আমি দিয়ে দিব। আজকের এই সময়ের পর যে হত্যা করবে তার অভিভাবকদের দুটো বিকল্প দেয়া হবে। ইচ্ছা করলে তারা রক্তের পরিবর্তে রক্ত অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করবে অথবা রক্তপণ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিবে[৪]।

উম্মে হানী (র) মক্কাহ বিজয়ের দিন এক মুশরিককে আশ্রয় প্রদান করেন; যাকে আলী (র) হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। অতঃপর উম্মে হানী (র) বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আসলাম তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং নবীতনয়া ফাতিমা (র) তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি উত্তরে বলেন: কে? আমি বললাম: উম্মে হানী বিনতে আবী তালিব। অতঃপর তিনি বলেন:স্বাগতম উম্মে হানী! অতঃপর তিনি গোসল শেষে একটি কাপড় জড়িয়ে আট রকাআত (ইশরাকের) নামায আদায় করেন। তারপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমি যাকে (ইব্ন হুবাইরাহ) আশ্রয় দিয়েছি তাকে আমার মাতৃভাই আলী হত্যা করতে চায়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমি তাকে আশ্রয় দিলাম যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ হে উম্মে হানী[৫]।

---

[১]) সূরাহ আল-হুজুরাত:১৩।

[২]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক, অনুরূপভাবে ঘটনাটি তাবকাতে ইব্ন সাআদেও বর্ণিত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অর্থ অভিন্ন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৭।

[৩]) বুখারী [১০৪] ও জামে তিরমিযী [৮০৯]।

[৪]) বুখারী [৬৮৮০]।

[৫]) সহীহ বুখারী [৩৫৭] ও সহীহ ইবন হিব্বান [১১৮৮]।

অতঃপর যেই দশ জনকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে বলে নির্দেশনা ছিল তাদের মধ্যে: ইকরামাহ বিন আবী জাহ্ল, আবদুল্লাহ বিন খাতল, মুকাইস বিন সাবাবাহ, আবদুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবী সারহ, হাববার বিন আল-আসওয়াদ,আল-হুওয়াইরিস বিন নুকাইদ, হিন্দ বিনতে উতবাহ, সারাহ বনী হাশিম'র মুক্ত দাসী, ফারাতানা (আবদুল্লাহ বিন খাতালের গায়িকা) ও আরনাবাহ (আবদুল্লাহ বিন খাতালের গায়িকা)। আল্লাহ'র রাসুল (স) এদের অধিকাংশদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন খাতল[১] ও তার এক দাসীকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যরা: আবদুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবী সার্হ, ইকরামাহ বিন আবী জাহ্ল, হিন্দ বিনতে উতবাহ ও আবু জাহ্লের অপর দাসী ইসলাম গ্রহণ করেন[২]।

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন যে, ফুদালাহ বিন উমাইর আল-লাইসী মক্কাহ বিজয়ের সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) কে হত্যার প্রচেষ্টা করেছিল; যখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করছিলেন। যখন সে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আসলো তিনি বললেন: ফুদালাহ নাকি? সে বললো: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমি ফুদালাহ। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তুমি মনে মনে কি ভাবছিলে? সে বললো: কোনো কিছু না, আমি আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম। অতঃপর মহানবী (স) হেসে দিলেন, তারপর বললেন: তুমি আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তার বুকে নিজ হাত রাখার পর তার অন্তর শান্ত হলো। ফুদালাহ বলতে লাগলো: আল্লাহ'র শপথ তিনি যখন তাঁর হাত আমার বুক থেকে তুলে নিলেন আমার কাছে আল্লাহ'র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পছন্দনীয় ছিল না[৩]। আল্লাহর রাসুল (স) মক্কাহ নগরীতে উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং নামায আদায়ে কাস্র করেছিলেন[৪]।

মক্কাহ বিজয় অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা

সর্বজন স্বীকৃত যে, মক্কাহ বিজয় শুধু আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের কাছে নয়, সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বিরল ঘটনা। আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ দীর্ঘ তের বছর মক্কাহ নগরীতে পদে পদে মক্কাবাসীর অপমান, তিরস্কার, অসহনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েও সেখানে থাকতে পারেননি। হত্যার ষড়যন্ত্র শুধু নয় প্রকাশ্য হত্যার সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে আবু

---

[১]) আবদুল্লাহ বিন খাতল বনী তাইম বিন গালিব'র লোক। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে এক আনসারী'র সাথে যাকাত উসুলের জন্য পাঠিয়েছিলেন, সাথে ছিল এক মুসলিম সেবক। তারা এক স্থানে অবস্থান করেছিল এবং সেবককে তার জন্য খাবার প্রস্তুত করার নিদের্শ দিয়ে ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে তার জন্য খাবার তৈরী না করার কারণে সে ঐ মুসলিম সেবককে হত্যা করে এবং পরে সে মুরতাদ হয়ে যায়; সুতরাং আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে যেখানেই পাওয়া যায় হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সে কাবাহ'র গিলাফের আড়ালে লুকিয়েছিল এবং তাকে সেখানেই হত্যা করা হয় [সহীহ বুখারী-৪০৩৫]।

[২])বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৮।

[৩]) আবুল কাসিম আবদুর রাহমান, আর-রাওদু আল-উনুফ ফী তাফসীরে আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,২০০৯ :৭/১১৪। ঘটনাটি ইব্ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে ও ইবনুল কাইউম যাদুল মাআদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[৪]) সহীহ বুখারী [১০৮০]।

বকর (র) কে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। সেখানেও কুরাইশ তথা মক্কাবাসী আল্লাহ'র রাসুল (স) কে শান্তিতে অবস্থান করতে দেয়নি। কখনো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কখনো মদীনায় অবস্থানকারী ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে সমগ্র আরবাঞ্চলের বিভন্ন জাতি-গোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে মুসলিমদের সমূলে বিনাশ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ'র ঘরের ওমরাহ আদায়েও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। তা সত্ত্বেও মক্কাহ বিজয়ের দিন আল্লাহ'র রাসুল (স) কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযানে মুসলিমদের জন্য রয়েছ জীবনপাথেয় এবং অনেক উপদেশ ও শিক্ষা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথম: সন্ধি সম্পাদন ও সন্ধি লঙ্ঘন সম্পৃক্ত বিষয়াদি

১) মক্কাহ বিজয়ের অভিযান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কুরাইশদের একদল যুবকের সহযোগিতায় তাদের মিত্র বনু বকর পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের মিত্র খুযাআহ গোত্রের ওপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে বিশজন মতো লোককে হত্যা করে। সন্ধির শর্তের তা সরাসরি লঙ্ঘন বিধায় খুযাআহ গোত্র অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের মিত্র হওয়ার কারণে তাদের ওপর আক্রমণকে সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বিবেচনা করে মক্কাহ বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করা হয়। উপরিউক্ত বিষয়ে সকল মুসলিম গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

২) মক্কাহ বিজয়ের অভিযানে আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশকে যথাসম্ভব অভিযান সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে হঠাৎ অভিযানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করার সময় তিনি বলেন:{اللَّهُمَّ خذ على أبصار قريش فلا يروني إلا بغتة}[হে আল্লাহ! কুরাইশদের দৃষ্টি কেড়ে নাও তারা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাকে দেখতে পায়][১]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তিবদ্ধ প্রতিপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা অথবা চুক্তিলঙ্ঘনের কারণে তাদের অবগত করা ব্যতীত আক্রমণ করার অধিকার মুসলিম দলপতি অথবা মুসলিম রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের রয়েছে এবং তা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। উপরিউক্ত বিষয়ে সকল মুসলিম গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ অভিযান থেকে সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা এখনো ঘটেনি; তবে বিভিন্ন প্রমাণ ও ইঙ্গিতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকলে চুক্তিবদ্ধ প্রতিপক্ষকে অবগত করা ব্যতীত আক্রমণ করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}[তবে কোনো সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে; তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও সমানভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না][২]; বরং প্রথমে তাদের চুক্তির ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা যুদ্ধের শামিল বলে জানাতে হবে।

---

[১]) বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৮।

[২]) সূরাহ আল-আনফাল:৫৮।

৩) চুক্তিবদ্ধ প্রতিপক্ষের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতা অথবা চুক্তিলঙ্ঘন গোটা পক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা অথবা চুক্তিলঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হবে; যতক্ষণ অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। যেমন কুরাইশদের একদল যুবকের সহযোগিতায় তাদের মিত্র বনু বকর পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের মিত্র খুযাআহ গোত্রের ওপর আক্রমণের পর কুরাইশদের নিরবতা ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিলঙ্ঘনের অভিযোগে বনু কুরাইযাহ'র সকল যোদ্ধাদের হত্যা করা হয়। যদিও তাদের প্রত্যেককে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিলঙ্ঘনের ব্যাপরে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন হয়নি। অনুরূপভাবে বনু নাযীরের কয়েক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিলঙ্ঘনের অভিযোগে গোটা বনু নাযীর গোষ্ঠীকেই বিতাড়িত করা হয়।

দ্বিতীয়ঃ বদরী সাহাবী হাতিবের অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রসঙ্গ

১) বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জ্যেষ্ঠ সাহাবী হাতিব বিন আবী বালতাআহ (র) কুরাইশদের বিরুদ্ধে মহানবী (স)'র যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পৃক্ত সংবাদ জানিয়ে কুরাইশদের পত্র পাঠানো সম্পর্কে কেউ অবগত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) আলী (র), যুবাইর (র) ও মিকদাদ (র) কে পাঠিয়ে পত্রবাহক ও নির্দিষ্ট স্থান জানিয়ে নিশ্চিত করে পত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসতে নির্দেশ প্রদান করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কীভাবে তিনি জানলেন বা কে তাঁকে জানিয়েছেন? তার উত্তরে বলা যায় এটাই তো নুবুওয়্যত, যেখানে মানবীয় পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির পরাজয় ও ব্যর্থ; সেখানেও নুবুওয়্যতের শক্তি কার্যকর ও সফল। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল (স)'র পূর্ণ সমর্থনের প্রমাণ ও সত্য নবীর দাবীর সপক্ষে অসংখ্য অকাট্য দলিল ও মুজিযাসমূহের একটি; যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স) কে অসংখ্যবার সম্মানিত করেছেন এবং বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

২) আলী (র)'র দল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বর্ণিত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে পত্রবাহিকাকে সরাসরি বলা:"তুমি পত্র বের করবে অথবা আমরা কাপড় খুলে তল্লাসী চালাবো" কতটুকু যৌক্তিক বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পন্থায় শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করা ইসলামী শরীয়তে বৈধতার বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত নিম্নরূপঃ

ক) অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত বলা যাবে না। উক্ত বিষয়ে চার মযহাবের ইমামগণসহ অধিকাংশ ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন; তবে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্মত নয়।

খ) সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায়ে শাস্তি প্রদানের বৈধতা না থাকলে আলী (র)' র দল কীভাবে মহিলাকে বললেন:"তুমি পত্র বের করবে নতুবা আমরা কাপড় খুলে তল্লাসী চালাবো" কতটুকু যৌক্তিক। তার উত্তরে বলা যায় যে, পত্র তল্লাশীর জন্য কাপড় খোলা সাধারণত স্বীকারোক্তি আদায়ে আটকে রাখা বা শাস্তি প্রদানের আওতায় পড়ে না। তাছাড়া যে পত্রের ব্যাপারে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তি আল্লাহ'র রাসুল (স) নিশ্চিত করেছেন তা বের করতে কাপড় খুলে তল্লাসী চালানো শুধু বৈধ নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে; কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) পত্র নিয়ে যেতে নির্দেশ প্রদান

করেছেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ (মূলত অহী) পালন করা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক বিধায় উপরিউক্ত বিষয়কে বর্তমান পৃথিবীর সাধারণ বিষয়ের সাথে তুলনা করা যাবে না। তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নয়, অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে অপরাধীকে স্বীকারোক্তি আদায়ে শাস্তি প্রদানের বৈধতা আছে। তাছাড়া এখানে তল্লাসীর জন্য কাপড় খোলা হয়নি; বরং কাপড় খুলে তল্লাসী চালানোর জন্য ধমক দেয়া হয়েছে।

৩) হাতিব (র)'র পত্র নিয়ে আসার পর তাঁর সাথে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কথোপকথন প্রমাণ করে যে, আল্লাহ'র শত্রুদের কোনো অবস্থাতেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অথবা তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া কোনো মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। উপরিউক্ত বিষয়ে সতর্কবাণী প্রদান করতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে;এরশাদ হচ্ছে:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}[হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এই অপরাধে যে, তোমরা আল্লাহ যিনি তোমাদের পালনকর্তা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করেছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি ভালোভাবেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে][১]।

তৃতীয়: আবু সুফয়ানের বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অবস্থান

আবু সুফয়ানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। মক্কাহ বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন যারা কুরাইশদেরকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বারণ করেছেন; শুধু তাই নয় তিনি ইসলামে প্রবেশকারীদেরও প্রথমদের মধ্যে ছিলেন। অথচ ইতিপূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আবু সুফয়ানের নেতৃত্ব অথবা দিকনির্দেশনা ব্যতীত মক্কাহ থেকে কোনো যোদ্ধাদল বের হয়নি। সম্ভবত মহান রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্ত ছিল যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও পূণ্যময় অঞ্চলকে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে তাঁর রাসুল (স)'র হাতে বিজয় প্রদান করবেন। না হয় যার নেতৃত্বে মক্কাবাসী আল্লাহ'র রাসুল (স) কে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল। তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদের অসহনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, মক্কাহ অভিযানের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে তার একটি সাক্ষাত সব উলট-পালট করে দেয়।

তাছাড়া মার্‌রু আয-যাহরানে দুজনের কথোপোকথন [হে আবু সুফয়ান! দূর্ভাগ্য তোমার "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এ কথার স্বীকৃতি প্রদানের এখনো কি তোমার সময় হয়নি? এখনো কি তোমার মনে হয় না "আমি আল্লাহ'র রাসুল"? আবু সুফয়ান

---

১) সূরাহ আল-মুমতাহানাহ:১।

বলেন: ইসলাম সম্পর্কে এখনো আমার অন্তরে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। আব্বাস (র) বললেন: দূর্ভাগ্য তোমার! ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করো এবং সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল। অতঃপর তিনি সত্যিকারে কলিমাহ শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন] থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আবু সুফয়ানের অন্তরে ইসলাম ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নুবুওয়্যত সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তরবারীর ভয়ে কী তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে মুশরিকের পক্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে ঈমান হৃদয়ঙ্গম করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার শরীর ও মুখে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসুল (স)'র সাক্ষ্য প্রদান এবং আনুগত্য পরিদর্শনই মূল উদ্দেশ্য। তবে ইসলামের যাবতীয় নিয়মাবলী পালন ও আনুগত্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঈমানের উন্নয়ন ঘটবে।

এখানেই ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যা; কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সহজেই অনুমেয়, এরশাদ হচ্ছে{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[মরুবাসী বেদুঈনরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো; তবে তোমাদের কমসমূর্হ বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান][১]।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রণক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণকারীকে অস্ত্রের ভয়ে অথবা গনীমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়; যতই না এর সপক্ষে প্রমাণ থাকুক। এক অভিযানে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) রণক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে অস্ত্রের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধারণা করে হত্যা করার সংবাদ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেন: "তুমি কি তার অন্তর ছিড়ে দেখেছ?" এবং কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সহজেই অনুমেয়:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }[হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ'র পথে জিহাদে সফর করো, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো; বস্তুতঃ আল্লাহ'র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে (ঈমান গোপন রাখতে) ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং যাচাই করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন][২]।

---

[১]) সূরাহ আল-হুজুরাত:১৪।

[২]) সূরাহ আন-নিসা: ৯৪।

আবু সুফয়ান (র)'র ইসলামের ঘোষণা প্রদানের পরও ইসলামকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে মুসলিম যোদ্ধাগণের অতিক্রমস্থলে আবু সুফয়ানকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আব্বাস (র) কে নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি যেন সচক্ষে ইসলামের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারেন এবং এক কাপড়ে যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদের অবস্থান বুঝতে পারেন। যাতে করে ইসলাম তাঁর অন্তরের আরো গভীরে পৌঁছে যায়। আবু সুফয়ান বিভিন্ন যোদ্ধাদলকে মক্কাহ অভিযানের উদ্দেশ্যে রাস্তা অতিক্রম করতে দেখে ভয় ও অবচেতন মনে আব্বাস (র) কে মূখ ফসকে বলে ফেলেন: {لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما}[আজ তোমার ভাতিজার রাজত্ব বেশ বড় হয়ে গেল]। তখন আব্বাস (র) সাথে সাথেই তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলেন যে, তুমি কোন রাজত্বের কথা বলেছ যেই রাজত্ব, সম্পদ ও মর্যাদাকে তিনি পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন যেদিন তোমরা তাঁকে এর প্রস্তাব দিয়েছিলে। এটি রাজত্ব নয় নুবুওয়্যত।

প্রসঙ্গত উল্লোখ্য যে, আব্বাস (র)'র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ঘোষণা "আবু সুফয়ানের ঘরে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে তো তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ'র রাসুল (স) ইসলামের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি ও তাঁর অন্তরে ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি আল্লাহ'র রাসুল (স) যতদূর সম্ভব মক্কাহ বিজয়ে রক্তপাত এড়াতে এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে চাননি। অথচ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই ঘোষণার পর আনসারদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয় যেমন আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত{أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذ جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال : قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، قالوا : قد كان ذلك، قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم!... فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله}[তবে লোকটির অন্তরে তাঁর অঞ্চলের আকর্ষণ ও নিজ আত্মীয়দের প্রীতি জন্মেছে, আবু হুরাইরাহ (র) বর্ণনা করেন যে, অহীর আগমন হলো-সাধারণত অহী আসলে তা আমাদের নিকট গোপন থাকে না-অতঃপর অহীর আগমনের পর কেউ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না; যতক্ষণ না অহী অবতরণ সমাপ্ত হয়। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স) আমরা উপস্থিত। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তোমরা বলেছিলে যে, লোকটির অন্তরে তাঁর অঞ্চলের আকর্ষণ ও নিজ আত্মীয়দের প্রীতি জন্মেছে। তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, তা বলেছিলাম। তিনি বললেন: কখনো নয়। আমি আল্লাহ'র বান্দা ও তাঁর রাসুল। আল্লাহ ও তোমাদের প্রতি আমি হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের জীবন এবং আমার মরণ তোমাদের মরণ!... তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স) দিকে এগিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: আল্লাহ'র শপথ! আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বলিনি][১]।

---

[১]) সহীহ মুসলিম [১৭৮০]।

চতুর্থ: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের চিত্রায়ন

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। তাতে বেশ কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১) আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের বরাতে সহীহ বুখারী'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ'র উপকণ্ঠে পৌঁছালে তিনি সূরাহ আল-ফাত্হ পাঠে মগ্ন ছিলেন এবং তা বারবার সুর করে পাঠ করতেছিলেন। ঐ দৃশ্যে প্রতীয়মান হচ্ছিলো যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) যেন মক্কাহ প্রবেশের প্রাক্কালে আল্লাহ'র সাক্ষাতে মগ্ন ছিলেন; তাঁর ভিতরে ও বাহিরে কোথাও ছিল না এত বিশাল বিজয় ও এত বড় সফলাতার অহংকার; ছিল শুধূমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রদেয় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রতি বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও বিজয়ের অশ্রু[১]।

প্রখ্যাত সীরাতবিদ ইব্ন ইসহাকের এই দৃশ্য বর্ণনায় ফুঠে উঠেছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ'র উপকণ্ঠে পৌঁছালে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে এত বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে সম্মানিত করায় আল্লাহ'র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মাথা নীচু করে এতই বিনয়ী হয়েছিলেন; যেন মনে হচ্ছিলো তাঁর থুতনী বাহনের মধ্যাংশ স্পর্শ করছে[২]।

দুটো বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, তিনি বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়েননি; বরং এত বিশাল বিজয়ে আল্লাহ'র সাহায্য ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করে বারবার তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই আদর্শ থেকে শুধু মুসলিম নয় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো হয় যে, বিজয়ের উষালগ্নে আনন্দ-উল্লাস নয়; বরং বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশই মূল শক্তি, যা প্রতিপক্ষকে চির দিনের জন্য অনুগত করে রাখবে এবং তাদের অন্তরের গভীরে পৌঁছে যাবে বিজয়ী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভালোবাসা; যা একমাত্র বিনয় ও ক্ষমার মাধ্যমেই অর্জন করা যায়।

২) বুখারী শরীফে বর্ণীত উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুর করে সুরাহ আল-ফাত্হ'র তিলাওয়াতের দৃশ্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সুর করে কুরআন করীমের তিলাওয়াতের বৈধতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে সুরের ছন্দে আরবী বর্ণের উচ্চারণ ও শব্দের বিন্যাস ও টান যাতে বিকৃত না হয় তা অতীব জরুরী।

৩) মক্কাহ প্রবেশের প্রাক্কালে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর যোদ্ধাদের এক পথে প্রবেশ করতে বারণ করে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পথে প্রবেশ করার প্রাজ্ঞময় নির্দেশনা তাঁর অভিজ্ঞ রণকৌশল প্রয়োগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন প্রতিপক্ষ মক্কাবাসী বিভিন্ন পথে প্রতিপক্ষ মুসলিম যোদ্ধাদের দেখে প্রতিরোধের শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে; যাতে রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) তা করেছিলেন যেন রক্তপাত এড়িয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা যায়। সেই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি আরো ঘোষণা করেন: "যে রুদ্ধদ্বার ঘরে থাকবে সেও নিরাপদ"[৩] অর্থাৎ কোথাও পালানোর প্রয়োজন নেই।

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪২৮১] সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত।

[২]) সীরাতে ইব্ন ইসহাক [সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী, ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৭৫-২৭৮।

[৩]) বায়হাকী [১৮৭৪০] ও ইবন আবী শায়বাহ [৩৮০৭৮]।

নিজের ঘরেই দরজা বন্ধ করে থাকো যেন মুসলিম যোদ্ধারা বুঝতে পারে যে, তুমি প্রতিরোধকারী নও।

পঞ্চম: হারামে মক্কীর সাথে সম্পৃক্ত বিধানসমূহ

সেই মহান দিনে আল্লাহ'র রাসুল (স) পবিত্র মক্কাহ নগরীর অমর্যাদা হোক তিনি তা চাননি; বরং কাবাহ শরীফে প্রবেশ করে জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন এবং বলেন: হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী ও সৌরজগত সৃষ্টিলগ্নে পবিত্র মক্কাহ নগরীর অমর্যাদার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন এবং আল্লাহ'র এই নিষেধাজ্ঞা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্য এখানে রক্তপাত করা, এবং এর কোনো বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। যদি কাউকে সেখানে যুদ্ধের জন্য ছাড় দেয়া হয়। অতঃপর তোমরা বলে দাও নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স)'র জন্য অনুমতি দিয়েছেন তোমাদের জন্য নয়; অবশ্যই কিছুক্ষণ মাত্র আমার জন্য বৈধ ছিল। তারপর তাঁর সম্মান ও মর্যাদা গতকাল'র ন্যায় আজ আবারো ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে ও অব্যাহত রয়েছে। অতঃপর তোমরা উপস্থিত সকলে অনুপিস্থিত সকলকে এই বাণী পৌঁছিয়ে দাও[১]। হারামে মক্কী'র সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) হারামে মক্কীতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা: আল্লাহ'র রাসুল (স) পবিত্র মক্কাহ নগরীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁর সাহাবীদের হারামে মক্কীতে কারো সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তবে প্রতিপক্ষ যদি যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করে তা প্রতিরোধ করা হবে। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) দূর থেকে তরবারীর ঝিলিক দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হয়: খালিদ বিন আল-অলীদ (র) প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন:{قضاء الله خير} [আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত উত্তম][২]। তবে "তাদের যেখানেই পাওয়া যায় হত্যা করা হবে" বলে যেই দশ জন সম্পর্কে নিদের্শ দিয়েছিলেন, তা কার্যকর করা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না; কারণ তাদের অপরাধ এতই জগণ্য যে, কাবাহ'র গিলাফে লুকিয়ে থাকলে সেখানেও তাদের হত্যা করা হবে বলে নির্দেশনা ছিল এবং তাই করা হয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপরিউক্ত ভাষণ থেকে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হারামে মক্কীর সীমানায় যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে{ إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة}[হারাম কোনো অপরাধী, পলায়নকারী খুনী ও অবৈধ বস্তু নিয়ে পলায়নকারীকে আশ্রয় দিবে না][৩]। সুতরাং হাদীসে আলোচিত অপরাধীদের শাস্তিও প্রতিষ্ঠা করা যাবে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী দল যদি নিজেদের রক্ষা করতে হারামে আশ্রয় নেয়, অধিকাংশ ফকীহগণের মতে তাদের দমন করতে হারামে অভিযান চালোনো বৈধ।

২) হারামে শিকারের নিষেধাজ্ঞা: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হারামে মক্কীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে সেখানে সকল প্রকার পশু-পাখির শিকার নিষিদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে সকল

---

[১]) সহীহ বুখারী [১০৪] ও জামে তিরমিযী [৮০৯]।

[২]) ঘটনাটি তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ,সীরাতে ইব্‌ন হিশাম ও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৮/৯।

[৩]) সহীহ বুখারী [১০৪] ও জামে তিরমিযী [৮০৯]।

ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। এর সপক্ষে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীস বর্ণিত হয়েছে:{لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده}[তার বৃক্ষরাজীর কাঁটা ছেড়া করা যাবে না এবং তার শিকার তাড়ানো যাবে না][১]। অতঃপর তাড়ানো যখন নিষিদ্ধি তাহলে ধ্বংস করা বা হত্যা করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া অবধারিত। সুতরাং কেউ যদি হারামের মধ্যে কোনো শিকার ধরে ফেলে তা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক; তবে তা যদি শিকারীর হাতে মারা যায় তাহলে মুহরিমের ন্যায় তার দম বা প্রতিদান প্রদান করতে হবে। তবে পাঁচ প্রকারের প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ; যেগুলোকে আল্লাহর রাসুল (স)"আল-ফুওয়াইসিক" বা অনিষ্টকারী বলে নামকরণ করেছেন; তা হলো: কাক, চীল, বিচ্ছু, ইদূঁর ও পাগলা কুকুর[২]। এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণ কষ্টদায়ক প্রাণীকেও হত্যা করা বৈধ বলে তুলনা করেছেন যেমন সাপ ও হিংস্র প্রাণীসমূহ।

৩) হারামের উদ্ভিদ কাটার নিষেধাজ্ঞা: উপরিউক্ত বর্ণিত হাদীসের আলোকে হারামে মক্কীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে সকল প্রকার পশু-পাখির মতো সকল প্রকার উদ্ভিদ কাটা ও ছেড়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদ কেউ রোপন করেনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় হারাম এলাকায় গজিয়েছে তরু-তাজা থাকা পর্যন্ত কাটা নিষিদ্ধ; তবে শুকিয়ে গেলে তা কাটা যাবে। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম আহমদের মতে হারামের তরু-লতা ও ঘাঁসে মেষপাল চরানো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে[৩]।

৪) হারামে মুহরিম অবস্থায় প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়: হারামে মক্কীর সম্মানার্থে মুহরিম অবস্থায় প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় বিধায় কোনো ব্যক্তি মক্কায় আগমন করলে অথবা মক্কাহ'র হারাম থেকে যদি কিছু নিতে চায়, সে ঐ ব্যক্তির মতো নয় (যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মী) যাকে পেশার কারণে বারবার হারামে প্রবশ করতে হয়। ইমাম শরফুদ্দীন নাভভীর মতে তাকে অবশ্যই হজ্ব (হজ্বের মওসুমে) অথবা ওমারহ'র ইহরাম পরিধান করে প্রবেশ করতে হবে। তবে এ বিষয়ে ফিক্হী বিধান (ওয়াজিব না মুস্তাহাব) নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। উপরিউক্ত ব্যক্তির ইহরাম পরিধান করা হানাফী ফকীহগণের মতে ওয়াজিব এবং এই অভিমতের ওপরেই ফাতওয়াহ বা ফিক্হী বিধান নির্ধারিত; যেমন ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে "আমর" অর্থাৎ নির্দেশ'র শব্দ থেকে ওয়াজিব বুঝানো হয়। কিন্তু উপরিউক্ত ব্যক্তির ইহরাম পরিধান করা শাফেয়ী ফকীহগণের মতে ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব এবং তাঁদের সপক্ষে তাঁরা মক্কাহ বিজয়ের দিনে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাহ প্রবেশের দৃশ্য{إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام} [নবী (স) মক্কাহ বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল এবং তিনি মুহরিম ছিলেন না][৪]। হানাফী ফকীহগণ এর উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ'র রাসুল

---

[১]) সহীহ বুখারী [১৮৩৪] ও সহীহ মুসলিম [১৩৫৩]।

[২])সহীহ বুখারী [১৮২৬ ও ৩৩১৪] , সহীহ মুসলিম [১১৯৮], জামে তিরমিযী [৮৩৭], সুনান নাসায়ী [২৮৮৭], সুনান ইবন মাজাহ [৩০৮৭] ও মুসনাদ আহমদ [২৫৩৫০]।

[৩]) যরকশী, ইলামুস সাজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৫৭।

[৪]) সহীহ মুসলিম [১৩৫৮], সুনান আবী দাউদ [৪০৭৬], জামে তিরমিযী [১৭৩৫], সুনান নাসায়ী [৫৩৪৫], সুনান ইবন মাজাহ [২৮২২] ও মুসনাদ আহমদ [১৪৯৪৭]।

(স)'র মক্কাহ বিজয়ের দিন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছিলেন বিধায় তিনি মুহরিম ছিলেন না। তাছাড়া যুদ্ধাবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিক্‌হী বিধান স্বাভাবিক বিধানের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে।

৫) হারামে মক্কীর সীমানায় অমুসলিমদের অবস্থান অবৈধঃ অমুসলিমদের হারামে মক্কীর সীমানায় অবস্থান করা ইসলামী বিধান মতে সম্পূর্ণ অবৈধ। এ বিষয়ে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন; কারণ কুরআন করীমের ভাষায় তারা অপবিত্র যেমন এরশাদ হয়েছে: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا }[হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে][১]। সুতরাং হারামের সীমানায় অমুসলিমদের অবস্থান করার কোনো প্রকার সুযোগ নেই।

ষষ্ঠঃ হারামে মক্কীতে আল্লাহ'র রাসুল (স) কর্মসমূহ

মক্কাহ বিজয়ের দিন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হারামে মক্কীতে প্রবেশের পর তাঁর কর্মসমূহ থেকে বেশ কিছু ফিক্‌হী বিধান উদ্ভাবিত হয় যার; বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) বায়তুল্লাহ'র ভিতরে নামায আদায়ঃ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (র)'র বরাতে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় "আল্লাহ'র রাসুল (স) বায়তুল্লাহ'র ভিতরে মূর্তি থাকা অবস্থায় প্রবেশে অস্বীকৃতি জানান এবং ভিতরের মূর্তিগুলো বের করে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ'র ভিতর থেকে ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)'র হাতে জুয়ার কাঠি সম্বলিত দুটি মূর্তি বের করে আনা হয়। তারপর তিনি বায়তুল্লাহ'র ভিতরে প্রবেশ করেন এবং ভিতরে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি উচ্চারণ করেন; তবে তিনি বায়তুল্লাহ'র ভিতরে কোনো নামায আদায় করেননি।[২] কিন্তু ইব্‌ন উমর (র)'র বরাতে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) উসামাহ (র), বেলাল (র) এবং উসমান বিন তালহা (র) [বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষক] ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দরজা বন্ধ করে ভিতরে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বেরিয়ে আসেন। ইব্‌ন উমর (র) বললেন: আমি বেলাল (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ'র রাসুল (স) ভিতরে কী করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাম পাশে দুটি স্তম্ব ও ডান পাশে একটি স্তম্ব এবং পিছনে তিনটি স্তম্ব রেখে তিনি নামায আদায় করেন[৩]।

মুহাদ্দিসীনের মতে উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে মূলত কোনো সংঘর্ষ নেই; কারণ ইব্‌ন আব্বাস (র)'র বরাতে বর্ণিত হাদীস যাতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নামায আদায় না করার কথা উল্লেখ রয়েছে; তিনি সেখানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সঙ্গে ছিলেন না। কখনো তিনি হাদীসটি উসামা (র)'র বরাতে বর্ণনা করেন, আবার কখনো তাঁর বড় ভাই ফাদ্বল (র)'র বরাতে বর্ণনা করেন। ফাদ্বল (র)ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে বায়তুল্লাহ'র অভ্যন্তরে ছিলেন না। সুতরাং ইব্‌ন আব্বাস (র)'র বর্ণিত হাদীসে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও ইব্‌ন উমর (র)'র বর্ণনায় নামায আদায়ের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

---

[১]) সূরাহ আত-তাওবাহ:২৮।

[২]) সহীহ বুখারী [৪২৮৮ ও ১৬০১], সহীহ মুসলিম [১৩৩১] ও সুনান আবী দাউদ [২০২৭]।

[৩]) সহীহ মুসলিম [১৩২৯], ইব্‌ন উমরের বরাতে সহীহ বুখারী [৪৪০০]'র বর্ণনাও অনেকটা এই বর্ণনার পাশাপাশি।

পাশাপাশি ইব্‌ন উমর (র)'র বরাতে অন্য একটি হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে; যাতে নামায আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়ে ইমাম মালিক ব্যতীত ইমাম আবু হানীফাহ, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদসহ অধিকাংশ ফকীহগণ বায়তুল্লাহ'র অভ্যন্তরে সকল প্রকার নামায (ফরয ও নফল) আদায় বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন[১]। ইমাম মালিকের মতে শুধুমাত্র নফল নামায আদায় করা বৈধ[২]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,বায়তুল্লাহ'র অভ্যন্তরে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কাবাহ শরীফের যে কোনো দেওয়ালমুখী হয়ে নামায আদায় করা যাবে।

২) ছবি তোলা ও ছবি আকাঁর বিধান: সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণীত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ'র ভিতরে মূর্তি থাকা অবস্থায় আল্লাহ'র রাসুল (স) প্রবেশ করেননি। অনুরূপভাবে জাবির (র) থেকে বর্ণীত সুনানে আবী দাউদের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) উমর (র) কে [তিনি তখন মক্কাহ'র উপকণ্ঠে ছিলেন] কাবায় এসে ভিতরের ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ছবিগুলো না মুছা পর্যন্ত আল্লাহ'র রাসুল (স) ভিতরে প্রবেশ করেননি[৩]। তবে উসামাহ (র)'র বরাতে সহীহ বুখারীর বর্ণীত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) ভিতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর সেখানে তিনি ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)'র ছবি দেখলে পানি আনিয়ে তিনি তা মুছতে লাগলেন[৪]।

উপরিউল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) দেওয়ালে অংকিত ছবির চিত্রাংকনগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন বায়তুল্লাহ'র ভিতরের মূর্তিগুলো বের করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উসামাহ (র)'র বর্ণীত হাদীসে যা এসেছে"আল্লাহ'র রাসুল (স) পানি আনিয়ে ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)'র ছবি দেওয়াল থেকে মুছে ফেলতে লাগলেন" এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, দেওয়ালে অংকিত ছবিসমূহ উমর (র)'র মুছে ফেলা সত্ত্বেও অস্পষ্টাকারে কিছুটা রয়ে গিয়েছিল যা আল্লাহ'র রাসুল (স) পুনরায় মুছে ফেলতে লাগলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মূর্তি নির্মাণ ও ছবির চিত্রাংকন দুটোই নিষিদ্ধ প্রতীয়মান হয়। ইসলামী শরীয়তের আলোকে উক্ত বিষয়ের শরয়ী বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) চার মাযহাবের ইমামগণসহ ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রাণীর মূর্তি ও চিত্রাংকন ইসলামী শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধ ও কবীরাহ গুনার অন্তর্ভূক্ত। পেশাদারিত্বের কারণে হোক অথবা ব্যবসা বা শখের বসে হোক, কোনো অবস্থাতেই এর বৈধতার স্বীকৃতি নেই; কারণ তা আল্লাহ'র সাথে সমকক্ষতার দাবি ও সৃষ্টিগুলোর প্রতি ঠাট্টার অন্তর্ভূক্ত।

খ) প্রাণীর ছবি কাপড়ে, বিছানায়, ধাতুমুদ্রায়,আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে যেখানেই হোক নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে বিধায় তা ব্যবহার করাও বৈধ নয়। তবে গাছ-পালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা এমন চিত্রকর্ম যেখানে প্রাণীর ছবি নেই; তা অবৈধ নয়। এ রকম চিত্রকর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণ বৈধ।

---

[১]) ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:২/৩০৪ ও ইমাম নাভভী'র শরহে মুসলিম, প্রাগুক্ত:৯/৮২।

[২]) ইমাম নাভভী'র শরহে মুসলিম, প্রাগুক্ত:৯/৮২ ও হাফিয ইরাকী'র তারহুত তাসরীব, প্রাগুক্ত:৫/১৭৫।

[৩]) সূনান আবী দাউদ [৪১৫৬]।

[৪]) সহীহ বুখারী [৪০৬২]।

গ) বাচ্চাদের খেলনার পুতুল সম্পর্কে ফকীহগণ "ছাড় দেয়া হয়েছে" বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন[১]।

ঘ) বর্তমান ফটোগ্রাফির চিত্রায়ন হস্ত চিত্রাংকনের মধ্যে পড়বে কি না? তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। তবে ইমাম নাভভীসহ অধিকাংশ ফকীহগণের মতে এটি হস্ত চিত্রাংকনের মধ্যে পড়বে না[২]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফটোগ্রাফির চিত্রায়নও কোনো কোনো ফকীহগণের মতে প্রয়োজন ব্যতীত করা অবাঞ্ছনীয়; তবে স্মৃতি রক্ষার্থে সংরক্ষণ করা বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করা অধিকাংশ ফকীহগণের মতে নিষেধ।

ঙ) বর্তমান আধুনিক যুগে চবির মাধ্যমে ব্যক্তি পরিচিতি (আইডি কার্ড জাতীয়), মানুষের অধিকার সংরক্ষণ, অপরাধ সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন প্রকার জালিয়াতি রুখতে অনেক ক্ষেত্রে চবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় চবির ব্যবহার প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে ছাড় প্রদান করা হয়েছে বলে ফকীহগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন তা বৈধ; এর বেশী নয়।

সপ্তম: মক্কাহ বিজয় দিবসে রাসুল (স)'র ভাষণ

আল্লাহ'র রাসুল (স) মক্কাহ বিজয় দিবসের প্রায় আট বছর পূর্বে মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যা চেষ্টার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হিজরতের প্রাক্কালে বারবার বায়তুল্লাহ'র দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: অল্লাহ'র শপথ! নিশ্চয় তুমি অল্লাহ'র যমীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়স্থান। তোমার প্রতিবেশীরা আমাকে বের করে না দিলে আমি বের হতাম না[৩]। তাছাড়া কত স্মৃতি, কত কল্পনা মনের গভীরে ঘুরপাক খাচ্ছিল তা অবর্ণনীয়; বিশেষকরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই মাতৃভূমিতে বিজয়ীর বেশে ফিরিয়ে এনে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করতে পেরে আল্লাহ'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নম্রভাবে আল্লাহ'র প্রতি নতমস্তকে নিজ মাতৃভূমি পবিত্র নগরী মক্কায় পবেশ করে বায়তুল্লাহ'র প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে সমবেত মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে সেই ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরাসীম।

আল্লাহ'র রাসুল (স) সচক্ষে আরো প্রত্যক্ষ করলেন যে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন। তখন তিনি হাত দিয়ে বায়তুল্লাহ'র দরজা ধরে দাঁড়ান। তাঁর চতুর্পার্শ্বে লোকজন সমবেত হতে থাকে এবং তারা জানে না তাদের সাথে কী রকম ব্যবহার করা হবে? এই উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ভাষণ প্রদান করেন:"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরিক নেই। যিনি তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছেন ও তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি একাই প্রতিপক্ষকে পরাজয় করেছেন। বায়তুল্লাহ'র তত্ত্বাবধান ও হাজ্বীদের পানি পান করানো ব্যতীত ইসলামপূর্ব প্রতিশোধ, রক্ত ও সম্পদের সকল দাবি আমার এই দু'পায়ের নীচে হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

---

১) ইমাম নাভভীর শরহে মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত:১৪/৭৬।

২) ইমাম নাভভীর শরহে মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত:১৪/৮১।

৩) সুনান তিরমিযী [৩৯২৫]।

তোমাদের বাপ-দাদা নিয়ে অহংকার ও জাহেলী যুগের আভিজাত্য দূর করে দিয়েছেন। সমগ্র মানবজাতি আদম থেকে (সন্তান) এবং আদম মাটির সৃষ্টি[১]। তারপর তিনি কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }[হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ'র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাকওয়াবান][২]।

সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি আরো বলেন: হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী ও সৌরজগত সৃষ্টিলগ্নে পবিত্র মক্কাহ নগরীর অমর্যাদা অবৈধ ঘোষণা করেন। আল্লাহ'র এই নিষেধাজ্ঞা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্য এখানে রক্তপাত করা, এবং এর কোনো বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। যদি কাউকে যুদ্ধের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর তোমরা বলে দাও নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুল (স)'র জন্য অনুমতি দিয়েছেন তোমাদের জন্য না; অবশ্যই কিছুক্ষণ আমার জন্য বৈধ ছিল। তারপর তার সম্মান ও মর্যাদা গতকাল'র ন্যায় আজ আবারো ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তোমরা উপস্থিত সকলে অনুপিস্থিত সকলকে এই বাণী পৌঁছিয়ে দাও[৩]।

তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সাথে কি রকম আচরণ করবো বলে তোমরা আশা করো? তারা সকলেই বললো: উত্তম আচরণ। আপনি সম্মানিত ভাই ও সম্মানিত ভ্রাতুষ্পুত্র। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন: যাও তোমরা সকলেই মুক্ত"[৪]।

অষ্ঠম: মক্কাহ বিজয় যুদ্ধ না সন্ধির মাধ্যমে

মক্কাহ বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল না সন্ধির মাধ্যমে তা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সীরাতবিদগণ ও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে মক্কাহ বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে নয়; বরং আল্লাহ'র রাসুল (স) ও কুরাইশ দলপতি আবু সুফয়ানের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির মাধ্যমে মক্কাহ বিজয় সাধিত হয়। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সেই প্রসিদ্ধ বাণী উল্লেখ করেন"যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে সে নিরাপদ, যে আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে বায়তুল্লাহ'য় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তবে যে দশ জন (ছয় জন পুরুষ ও চার জন মহিলা) যাদের সুনির্দিষ্ট

---

[১]) সুনান আবী দাউদ [৪৫৪৭], সুনান নাসায়ী [৪৭৯১], সুনান ইবন মাজাহ [২৬২৭] ও মুসনাদ আহমদ [৬৫৩৩]।

[২]) সূরাহ আল-হুজুরাত:১৩।

[৩]) সহীহ বুখারী [১০৪] ও জামে তিরমিযী [৮০৯]।

[৪]) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, অনুরূপভাবে ঘটনাটি তাবকাতে ইব্‌ন সাআদেও বর্ণীত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অর্থ অভিন্ন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী,ফিকহুস সীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৭।

অপরাধের কারণে হত্যা বৈধ তারা ব্যতীত”[১]। পাশাপাশি তাঁরা আরো বলেন যদি মক্কাহ বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে হয়ে থাকতো তাহলে পরাজিত গোষ্ঠীর যাবতীয় সম্পদ গনীমতরূপে গণ্য হতো এবং তা বিজয়ী যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হতো। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক সীরাতবিদগণ এবং ইতিহাসবিদগণের মধ্যে কেউ উক্ত বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেননি বিধায় প্রমাণিত হয় যে, সন্ধির মাধ্যমে মক্কাহ বিজয় সাধিত হয়েছে।

অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম মালিকসহ আরো অনেক ফকীহগণের মতে পবিত্র মক্কাহ নগরীর বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে সাধিত হয়। এর সপক্ষে তাঁরা বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবী যোদ্ধাগণ সামরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। সন্ধির মাধ্যমে প্রবেশ করলে সামরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যেখানে হুদাইবিয়াহ'র সন্ধিতে ওমরাতুল কাযা আদায়ে শর্ত ছিল যে, কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত মুসলিমগণ কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবে না। তবে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বিজিত পক্ষের সম্পদকে গনীমতরূপে ঘোষণা প্রদানে আল্লাহ'র রাসুল (স) অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। কারণ হিসেবে ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, পবিত্র মক্কাহ নগরীকে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর সাথে তুলনো করলে চলবে না; কারণ মক্কাহ নগরী ইবাদতের স্থান, সেখানে আল্লাহ'র ঘর অবস্থিত এবং পৃথিবীতে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত স্থান। এটি যেন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি[২]। তাই ইমাম আবু হানিফাহসহ অনেক ফকীহগণ পবিত্র মক্কাহ নগরীর [হারামের সীমানায় অন্তর্ভূক্ত] ভূমি ও বাড়ী-ঘরের বিক্রয় নিষিদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন[৩]।

---

১) সুনান নাসায়ী [৪০৭৮] হাদীসটি প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাহ গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে। শায়খ আলবানী সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলার নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

২) বিস্তারিত বর্ণনার জন দেখুন: ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৪২৩-৪২৯।

৩) আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:১৬৪, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৭৪।

হুনায়ন অভিমুখে অভিযান

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে হুনায়নের যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব রাখে; কারণ এই যুদ্ধ মক্কাহ বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা মক্কাহ বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি মক্কাবাসী, মক্কাহ বিজয়ের পর নতুন ইসলাম গ্রহণকারীগণ এবং অনেক অমুসলিম যারা মুসলিমদের সাথে রয়েছে [মুআল্লাফাতুল কুলুব] তারাও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এটি হলো আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে সরাসরি পরিচালিত সর্ববৃহৎ সংখ্যক যোদ্ধার অংশগ্রহণে সংঘটিত যুদ্ধ; সুতরাং সাহাবীদের অনেকেই বলেছিলেন অন্তত আজকে আমরা সৈন্য-স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবো না। অনেকে বিজয়ের পরিপূর্ণ আমেজেই ছিলেন।

হুনায়ন অভিযানের প্রেক্ষাপট

মূলত তায়েফের সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয় এবং মুসলিমদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তায়েফে দাওয়াতী প্রচারণার প্রাক্কালে অপমান করেছিল;তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। তাদের উচ্ছৃঙ্খল তরুণদেরকে উসকানি দিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে পাথর নিক্ষেপ করেছিল এবং স্বয়ং আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজেও মানবিক কারণে বেশ স্পর্শকাতর অবস্থানে ছিলেন। অন্যদিকে মক্কাহ বিজয় তায়েফের সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। গোত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে বড় ধরনের সমাবেশ ঘটিয়ে হাওয়াযিন গোত্রের দলপতি মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে পরিবার-পরিজন [স্ত্রী-সন্তানসহ] ও সম্পদ নিয়ে মক্কাহ ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান আওতাসে অবস্থান নেয়; যেন কেউ যুদ্ধ থেকে পলায়ন করতে চাইলে তার স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদের মায়া তাকে রুখে দেয়।

শত্রুপক্ষের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে আরো অধিক সংবাদ সংগ্রহে আল্লাহ'র রাসুল (স) আবদুল্লাহ বিন আবী হাদরাদ আসলামী (র) কে শত্রুপক্ষের ভিতরে গিয়ে কৌশলে তাদের মধ্যে অবস্থান করে সঠিক তথ্য নিয়ে আসতে প্রেরণ করেন। তিনি সুকৌশলে তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদের যোদ্ধাদের তাবু ঘুরে-ফিরে প্রত্যক্ষ করে সঠিক সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাক্কালে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ'র [তখনো সে মুশরিক] কাছে প্রচুর সামারস্ত্র ও বর্ম রয়েছে জানতে পেরে অস্ত্র ও বর্মের জন্য তার কাছে পাঠালে সাফওয়ান বলে উঠলো:"হে মুহাম্মদ জবরদস্তি?!...আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: ধার নিচ্ছি পরে ফিরিয়ে দিব। অতঃপর তার কাছ থেকে একশত বর্মও সমপরিমান অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন"[১]।

গাযওয়াতু হুনায়ন'র চিত্রায়ন

আল্লাহ'র রাসুল (স) বারো হাজার যোদ্ধা (দশ হাজার মদীনা থেকে এবং দুই হাজার মক্কাহ থেকে) নিয়ে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসের সাত তারিখ মদীনা থেকে হুনায়নের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। হাওয়াযিন দলপতি মালিক বিন আওফ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র

[১]) তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৪/৩০০ ও সীরাতে ইব্ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/১৫৮।

আগমনের সংবাদ পেয়ে তার যোদ্ধাদের হুনায়নের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে লুকিয়ে রেখে মুসলিম যোদ্ধারা এগিয়ে আসলে একসাথে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে অনেকে সংখ্যার আধিক্যে যুদ্ধ বিজয় সম্ভব হয় বলে ধারণা করলেও শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে যুদ্ধের প্রথমার্ধে মুসলিম বাহিনী প্রায়ই পরাজয়ের মুখোমুখী হয়েছিল এবং মহানবী (স) কে ত্যাগ করে অনেকেই পশ্চাদপথ অবলম্বন করেছিলেন। যার বর্ণনা কুরআন করীমে এভাবে এসেছে:{ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}[নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে এবং হুনায়নের দিনে (যুদ্ধে)। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদেরকে এবং এই হলো কাফেরদের কর্মফল][১]। পরে মহানবী (স)'র দৃঢ়তা ও বিচক্ষণ রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয় সাধিত হয়।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চাচা আব্বাস (র) বর্ণনা করেন যে,"হুনায়নের যুদ্ধে আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফয়ান বিন হারিস সার্বক্ষণিক তাঁর সাথেই ছিলাম। তিনি তাঁর সাদা খচ্চরীর পীঠে আরোহী ছিলেন। শত্রু পক্ষের অতর্কিত আক্রমণে যুদ্ধের প্রথমার্ধে মুসলিম যোদ্ধাগণ পলায়ন করতে শুরু করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর খচ্চরীকে লাথি মেরে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যান। আব্বাস (র) আরো বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র খচ্চরী'র লাগাম ধরে থামাচ্ছিলাম; যেন খচ্চরী দৌড় না দেয় এবং আবু সুফয়ান আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাহন ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: বৃক্ষবাসীদেরকে ডাকো[২] (তিনি উচ্চকণ্ঠশীল ছিলেন) অতঃপর আমি আমার উচ্চকণ্ঠে বৃক্ষবাসীদের ডাক দিলে তাঁরা যে যেখানেই ছিল শুনতে পেয়ে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসলেন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁদের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) ভূমি থেকে কিছু কংকর নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মেরে বললেন: মুহাম্মদের পালনকর্তার শপথ! তারা পরাজিত হয়েছে"[৩]। অতঃপর মহান রাব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন এবং তারা আর কেউ দাঁড়াতে পারলো না। মুসলিম যোদ্ধাগণ তাদের হত্যা ও বন্দি করতে লাগলেন। অতঃপর মুসলিম যোদ্ধাগণ বন্দিদের বড় একটি দল নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে ফিরে আসেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) এই প্রথম কোনো যুদ্ধে ঘোষণা করলেন{ من قتل قتيلا

---

[১]) সূরা আল-তাওবাহ:২৫-২৬।

[২]) বৃক্ষসাথী বলতে হুদাইবিয়ায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাতে বায়আত গ্রহণকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। বৃক্ষের নীচে বায়তুর রিদওয়ান সাধিত হয়েছিল বিধায় ইতিহাসে তাঁরা বৃক্ষবাসী হিসেবে পরিচিত ।

[৩]) মুসলিম [১৭৭৫] আল-জামেউস সাগীর [৩০১২]।

{عليه بينة فله سلبه}[যুদ্ধে কেউ কাউকে হত্যা করলে প্রমাণ সাপেক্ষে নিহত ব্যক্তির মাঠে পরিত্যক্ত সম্পদের সে মালিক হবে)[১]। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা (র) একা হুনায়নের যুদ্ধে বিশ জন নিহত ব্যক্তি থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন যাদেরকে তিনি হত্যা করেছিলেন[২]।

ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন সাআদের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) পিছনের দিকে তাকালেন। অতঃপর তিনি আবু তালহার সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানকে দেখতে পেয়ে বললেন: উম্মে সুলাইম নাকি!... তিনি উত্তরে বলেন: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল (স)! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। যারা আপনার কাছে পরাজিত হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে অনুরূপভাবে যারা আপনার সাথে লড়তে চায় তাদেরকেও হত্যা করা হবে? তাঁর স্বামী আবু তালহা জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সাথে এই ছোরা-তাঁর সাথে একটি ছোরা ছিল-কেন হে উম্মে সুলাইম? উত্তরে তিনি বললেন: এক মুশরিক আমার নিকটে আসলে আমি তার কাছ থেকে এই ছোরা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এটা দিয়ে বধ করি[৩]।

আরো বর্ণিত হয়েছে যে,আল্লাহ'র রাসুল (স) এক মহিলার লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; যাকে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) হত্যা করেছেন এবং সেখানে অনেক লোকজন সমবেত হয়েছেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: এখানে কী হয়েছে? উত্তরে সমবেত লোকজন বললেন: এই মহিলাকে খালিদ বিন আল-অলীদ (র) হত্যা করেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাথের একজনকে বললেন: খালিদকে গিয়ে বলো যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) শিশু, মহিলা ও নিপীড়িতকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন[৪]।

হাওয়াযিন দলপতি মালিক বিন আওফ তার গোত্রের কিছু লোকজনের সাথে পলায়ন করে তায়েফে গিয়ে দূর্গে আশ্রয় নেয় এবং পিছনে প্রচুর সম্পদ রেখে যায়। আল্লাহ'র রাসুল (স) গনীমতের সম্পদ একত্রিত করে আল-জুরানাহ নামক স্থানে নিয়ে আসতে নিদের্শ প্রদান করেন। অতঃপর গনীমতের সম্পদ মাসউদ বিন আমর গিফারী (র)'র তত্ত্বধানে রেখে তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাদের নিয়ে তিনি তায়েফে গিয়ে বনু ছাকীফকে অবরোধ করলেন। বনু ছকীফের তীরান্দজরা দূর্গ থেকে মুসলিমদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো এবং তাতে কিছু লোক শহীদ হন। আল্লাহ'র রাসুল (স) বনু ছাকীফকে দশ দিনের অধিক অথবা বিশ দিনের অধিক অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং পরে ফিরে আসেন। আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদেরকে ঘোষণা দিলেন যে, আমরা আগামী কাল রওনা দিব ইন শা আল্লাহ। অতঃপর তাঁর সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন: আমরা ফিরে যাবো এটি জয় করবো না? আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: ইচ্ছে করলে যুদ্ধ করো! অতঃপর যুদ্ধ করতে চেষ্টা করলো এবং আরো কয়েকজন আহত হলো। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: আগামী কাল আমরা রওনা দিব। এটি তাদের

---

[১]) সহীহ বুখারী [৩১৪২] ও সহীহ মুসলিম [১৭৫১] ও সুনান ইবন মাজাহ [২৩০৭]।

[২]) সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/১৫৮।

[৩]) তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৪/৩২৫ ও সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/১৬৪।

[৪]) সুনানে ইব্‌ন মাজাহ [২৩১১] ও মুসনাদ ইবন আবী শায়বাহ [৬৮১]।

পছন্দ হলো তারপর আল্লাহ'র রাসুল (স) হেসে দিলেন[১]। আল্লাহ'র রাসুল (স) ফিরে আসার পথে সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা বলো{ آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون}[আমরা প্রত্যবর্তনকারী, তাওবাহকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের পালনকর্তার প্রশংসাকারী][২]। সাহাবীদের কেউ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বনু সাকীফের জন্য বদদোয়া করতে বা অভিশাপ দিতে বললে তিনি বলেন:{اللَّهُمَّ اهد ثقيفا وأت بهم}[হে আল্লাহ! তুমি বনু সাকীফকে হেদায়ত করো এবং আমার কাছে নিয়ে আসো][৩]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই দোয়া করার কিছু দিন পর বনু সাকীফ হেদায়তপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের প্রতিনিধি মদীনায় আগমন করে ইসলামের ঘোষণা দেন।

গনীমতের বন্টন ও ইসলামের ঘোষণায় ফেরত প্রদান

আল্লাহ'র রাসুল (স) আল-জুরানাহ'য় ফিরে আসেন যেখানে হুনায়ন যুদ্ধে বনু হাওয়াযিন থেকে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ ও বন্দিরা মাসউদ বিন আমর গিফারী (র)'র তত্ত্বাবধানে ছিল। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বন্দিদের বন্টন করে দিলেন। তারপর বনু হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি দল মুসিলম হয়ে আগমন করে তাদের সম্পদ ও বন্দিদের ফিরিয়ে দিতে আবেদন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: আমার সাথে যা আছে তা তোমরা দেখতে পাচ্ছো [আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট যা ছিল তিনি তা সাথে সাথে ফিরিয়ে দেন] এবং তাদের বললেন: আমি সত্য পছন্দ করি। তোমাদের দুটো থেকে একটি গ্রহণে স্বাধীনতা প্রদান করা হচ্ছে: "বন্দি অথবা সম্পদ" এর মধ্য থেকে যেটি পছন্দ তোমরা নিতে পারো। আমি তোমাদের ইসলামের আশায় গনীমত ও বন্দি বন্টনে বিলম্ব করেছিলাম। আল্লাহ'র রাসুল (স) তায়েফ থেকে ফিরে দশ দিনের অধিক তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তারা বললেন: আপনি আমাদেরকে "আভিজাত্য ও সম্পদ" এর মধ্য থেকে একটি বেছে নিতে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন আমরা আভিজাত্যকে বেছে নিলাম; কারণ বংশমর্যদার সাথে আমরা কোনো কিছু তুলনা করি না[৪]।

অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের নিকট আগমন করলেন এবং আল্লাহ'র যথাযথ প্রশংসা করে বললেন: তোমাদের এই ভ্রাতৃগণ অনুতপ্ত হয়ে এসেছে আমি তাদের বন্দিদের তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে চাই। অতঃপর যারা সন্তুষ্টচিত্তে তা ফিরিয়ে দিতে চায় তা হলে ভালো, আর যারা নিজেদের অংশ বিনিময় ব্যতীত ছাড়তে না চায় আল্লাহ আমাদের পরবর্তী সময়ে গনীমতের সম্পদ প্রদান করলে আমরা তাদের বিনিময় প্রথমে প্রদান করবো। অতঃপর সাহাবীগণ সকলেই বললেন: আমরা আনন্দচিত্তে ফিরিয়ে দিব[৫]।

তারপর বনু হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দল আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তাদের দলপতি মালিক বিন আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে? তারা আরো বললো: সে এখন তায়েফে বনু ছাকীফের সাথে রয়েছে। আল্লাহ'র রাসুল (স)

---

১) সহীহ বুখারী [৪৩২৫] ও সহীহ মুসলিম [১৭৭৮]।

২) সহীহ মুসলিম [১৩৪২]।

৩) জামে তিরমিযী [৩৮৭৭]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৪/৩২৯।

৪) সহীহ বুখারী [৪৩১৮] ও সুনান নাসায়ী [৩৬৯০]।

৫) সহীহ বুখারী [৪৩১৮] ও সুনান আবী দাউদ [২৬৯৩]।

তাদেরকে বললেন: তাকে সংবাদ দাও সে যদি মুসলিম হয়ে আসে তার পরিবার ও সম্পদ ফিরিয়ে দিব এবং একশত উট প্রদান করবো। অতঃপর মালিক বিন আওফকে জানানো হলো এবং সে এসে মক্কাহ ও আল-জুরানাহ'র মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে তার পরিবার ও সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সাথে একশ উট প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি সত্যিকারের ইসলাম গ্রহণ করেন[১]।

গনীমতের বন্টন ও কিছু অপ্রত্যাশিত মন্তব্য

এই যুদ্ধে প্রচুর পরিমানের গনীমতের সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে। অনেক গবেষকদের ধারণা যে, নতুন ইসলাম গ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অমুসলিমদের মধ্যে গনীমতের সম্পদের আশক্তির কারণেই যুদ্ধের প্রথমার্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের মুখোমুখী হয়েছিলেন। যাই হোক আল্লাহ'র রাসুল (স) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গনীমতের অধিকাংশ সম্পদ কুরাইশ নেতৃবৃন্দেকে প্রদান করেন যারা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধী ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু সুফয়ান (সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী) এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ (তখনো মুশরিক ছিলেন, মহানবী (স) তার কাছ থেকে একশত যুদ্ধের পোষাক ও সামরস্ত্র ধার নিয়েছিলেন) অন্যতম। আশ্চর্য বিষয় হলো গনীমতের সম্পদ বন্টনের সময় তারা মহানবী (স) কে খুব শক্তভাবে ঘিরে রেখেছিল; যার কারণে জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ কেউ কাছেই যেতে পারেননি[২]। সুতরাং আনসারগণ ও জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ যারা ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ শিকার করেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন বিধায় আনসারদের কারো কারো মনে আল্লাহ'র রাসুল (স) সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মায় এবং তাঁরা বলেন: { **يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم** }[আল্লাহ'র রাসুল (স) কে আল্লাহ ক্ষমা করুন! তিনি আমাদের বাদ দিয়ে কুরাইশদের গনীমত প্রদান করেছেন, অথচ এখনো আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত ঝরছে][৩]।

এই ঘটনার কারণে আনসার দলপতি সাআদ বিন উবাদাহ (র) গনীমতের সম্পদ বন্টনের পর আনসারদের প্রতিবাদ নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহানবী (স) সর্বদা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সাহাবীদের মধ্যে কেউ অযৌক্তিকভাবে রাগ করলে তাঁর রাগ ভাঙতেন; কিন্তু এই যুদ্ধে তা ঘটেনি। তাছাড়া এই যুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি গনীমতের সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে; সুতরাং বঞ্চিতদের মধ্যে রাগ-অনুরাগ হওয়াই স্বাভাবিক। গনীমতের সম্পদের নীতিমালা অনুযায়ী আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে গনীমতের সম্পদ প্রদান করেছিলেন তাঁদের অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যা শেষ পর্যন্ত কানাঘুষার রূপ ধারণ করে এবং অনেকেই বলাবলি শুরু করেছেন যে, মহানবী (স) নিজ

---

[১]) তাবকাতে ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:৪/৩৩৮ ও সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, প্রাগুক্ত:২/১৭৬।

[২]) ঘটনাটি প্রায়ই সকল প্রাচীন ও আধুনিক সীরাহ গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও অভিন্ন অর্থে যেমন: ইব্‌ন সাআদ তার তাবকাত গন্থে, প্রাগুক্ত:৪/৪০১, ইব্‌ন হিশাম তার সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত:৩/৩৫, মুহাম্মদ আল-গাযালী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত,পৃ:২৯৭ এবং সাঈদ রমাদ্বান আল-বুতী তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থে, প্রাগুক্ত, পৃ:২৮৪।

[৩]) সহীহ বুখারী [৩১৪৭] ও সহীহ ইবন হিব্বান [৭২৭৮]।

গোত্রের দিকে ধাবিত হয়ে গেছেন। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) সাআদ বিন উবাদাহ (র) কে আনসারদের একত্রিত করে মসজিদে সমবেত হতে বললে আনসারগণ মসজিদে সমবেত হলেন। মহানবী (স) ও আনসারদের মধ্যকার সংলাপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ
মহানবী (স) বলেনঃ হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে গনীমতের সম্পদ বন্টনের অভিযোগ সংক্রান্ত অসন্তোষের কথা আমি শুনেছি; যার কারণে তোমরা আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়েছ।
আনসারগণ বলেনঃ আমাদের মধ্যে যেই বলেছেন আমরা তা সমর্থন করি।
মহানবী (স) বলেনঃ আমি তোমাদের নিকট আগমন করলাম তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট; অতঃপর আল্লাহ কী আমার মাধ্যমে তোমাদের হিদায়ত প্রদান করেননি? তোমরা নিঃস্ব ছিলে আল্লাহ কী তোমাদের ধনী করেননি? এবং তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আল্লাহ কী আমার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন নি?
আনসারগণ বলেনঃ অবশ্যই, আল্লাহ এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) উত্তম ও কল্যাণকারী।
মহানবী (স) বলেনঃ তোমরা কেন আমাকে উত্তর দিচ্ছ না?
আনসারগণ বলেনঃ আমরা কী উত্তর দিব? আল্লাহ এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'রই সব ইহসান ও কল্যাণ।

মহানবী (স) বলেনঃ তোমরা ইচ্ছে করলে বলতে পারো এবং তাও সত্যি। আমি স্বজাতির কাছে মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছি; তোমরা আমাকে সত্যায়িত করেছ (স্বীকৃতি দিয়েছ), আমি লাঞ্ছিত হয়ে আগমন করেছি তোমরা আমাকে সম্মানীত করেছ, বিতাড়িত হয়ে এসেছি তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ, নিঃস্ব হয়ে এসেছি তোমরা আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেছ। হে আনসার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ইসলামের ওপর আস্থা রেখে পার্থিব সামান্য আবর্জনা দিয়ে লোকজনকে ইসলামের দিকে ধাবিত করেছি সেই জন্য তোমরা মনে কষ্টে নিয়েছ। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন মেষপাল নিয়ে ঘরে গিয়েছে আর তোমরা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে নিয়ে ঘরে ফিরেছ। যেই সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছিঃ যদি হিজরত না হতো আমি অবশ্যই আনসারদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। যদি লোকজন এক রাস্তা দিয়ে চলাচল করে এবং আনসার সম্প্রদায় অন্য রাস্তা দিয়ে চলে আমি অবশ্যই আনসারদের রাস্তা দিয়ে চলবো[১]।
এই কথোপকথনের পর মসজিদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন আনসারদের অশ্রুজলে তাঁদের দাড়ি ভিজে যায়। অতঃপর তাঁরা ঘোষণা দেন যে, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ'র রসুল (স)'র বন্টন ও অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট।

মরুবাসীদের একটি দল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে আরো বেশি সম্পদের আবেদন জানিয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পিছু নেয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) একটি বৃক্ষের ডালে তাঁর চাদর রেখেছিলেন সেই চাদর তারা নিয়ে নেয়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ তোমরা আমার চাদর দিয়ে দাও। আল্লাহ'র শপথ তোমাদের জন্য যদি আমার কাছে তেহামার বৃক্ষেরাশির [তেহামাহ অঞ্চল ঘন বৃক্ষরাশির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল] পরিমাণ উট থাকতো আমি সব তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তারপর তোমরা

১) সহীহ বুখারী[৪০৭৫ ৩৬৮১৮]। ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন সাআদ সকলেই অভিন্ন অর্থে বর্ণনা করেছেন।

আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ মনে করতে না[১]। ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী আবদুল্লাহ বিন আমর (র)'র বরাতে আরো বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: হে লোকজন! তোমাদের গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আমার জন্য; যা আমি সবটাই তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি[২]। আর এক মরুবাসী (বেদুঈন) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে পেয়ে তাঁর একটি মোটা নাজরানী চাদর ছিল তা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছেন এবং বলেন যে, আপনার কাছে রক্ষিত আল্লাহ'র সম্পদ থেকে আমাকে কিছু প্রদানের নির্দেশ দিন। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাঁকে কিছু প্রদানের নির্দেশ দেন[৩]।

মূলত আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট গনীমতের সম্পদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয় বিধায় যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে তাদের ইসলামের ঘোষণা দিয়ে এবং গনীমতের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট যা ছিল তিনি তা সাথে সাথে ফিরিয়ে দেন; যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রাসুল (স) আল-জুরানাহ থেকে ওমরাহ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কাহ'র উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ওমরাহ আদায়ের পর আত্তাব বিন উসাইদকে মক্কাহ'র গভর্নর নিয়োগ করে মদীনায় ফিরে যান।

হুনায়নযুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা

হুনায়নের যুদ্ধে আকীদাহ, রণকৌশল, যুদ্ধে বিজয় ও পরাজয়ের কারণ ও পৃথিবীর রীতিনীতির বিষয়ে মুসলিমদের জন্যে অনেক কিছু উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে; যেমন ছিল বদরযুদ্ধে। বদরযুদ্ধে মুসলিমগণ একনিষ্ঠ ও ধৈর্যশীল থাকার কারণে সংখ্যায় শত্রুদের এক তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। অন্যদিকে হুনায়নের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের চেয়ে অধিক হওয়া সত্ত্বেও একনিষ্ঠতা ও ধৈর্য না থাকার কারণে সংখ্যাধিক্য তাঁদের কোনো উপকারে আসেনি। বদরযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, আল্লাহ'র ওপর অসীম আস্থা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে মুসলিম যোদ্ধাদের প্রশংসায় কুরআন করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যদিকে হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এই সব গুনাবলীর ঘাটতির কারণে তাঁদের সতর্ক করে কুরআন করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। হুনায়নের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণে যুদ্ধের প্রথমার্ধে মুসলিম যোদ্ধাগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে রণাঙ্গনে রেখে পলায়ন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র চিৎকার শুনে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে কিছু লোকজন এসে আল্লাহ'র রাসুল (স) চতুর্পার্শ্বে সমবেত হন এবং তাঁরা প্রাণপন যুদ্ধ করেন। তাঁদের সংখ্যা কিন্তু দুইশ'র বেশি নয়!...

তবে এই দুইশয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের পক্ষে বিজয় ফিরে আসে, তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে এবং আল্লাহ তাঁর শত্রুদের কঠিনভাবে পরাজিত করেন। অথচ মুসলিম বাহিনী শুরুতে বারো হাজার ছিল; যা বিজয়ের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। মহান আল্লাহ

---

[১]) সুনান আবী দাউদ [২৪৯৪], সুনান নাসায়ী [৩৬৮৮] ও মুসনাদ আহমদ [৬৭২৯]।

[২]) সুনান আবী দাউদ [২৭৫৫], সুনান নাসায়ী [৪১৩৮] ও তাহাভী [৫২২৪]।

[৩]) সহীহ বুখারী[৩১৪৯ ও ৫৮০৯] এবং সহীহ মুসলিম [১০৫৭]।

রাব্বুল আলামীন এই শিক্ষা প্রদান করতে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কুরআন করীমের নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন:{لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে (যুদ্ধে)। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদেরকে এবং এই হলো কাফেরদের কর্মফল][১]। এই যুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথম: শত্রুপক্ষের অবস্থা জানার লক্ষ্যে শত্রুদের মাঝে গুপ্তচর প্রেরণ

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাদীস{الحرب خدعة}[যুদ্ধ হলো কৌশল]'র আলোকে শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি, সংখ্যা ও অস্ত্র সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে শত্রুদের মাঝে গুপ্তচর প্রেরণকরা শুধু বৈধ নয়; প্রয়োজনে তা অবশ্যই করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ'র রাসুল (স) এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সঠিক অবস্থান জানার লক্ষ্যে শত্রুদের মাঝে আবদুল্লাহ বিন আবী হাদরাদ আসলামী (র) কে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। উপরিউক্ত বিষয়ের বৈধতা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে কোনো প্রকার মতবিরোধ নেই।

দ্বিতীয়: শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অমুসলিমদের অস্ত্র ধার বৈধ

যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনে অমুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধসামগ্রী বিনামূল্যে অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হুনায়নযুদ্ধে প্রস্তুতির প্রাক্কালে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ'র কাছ থেকে একশ বর্ম ও সমপরিমাণ অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন, তখনো সে মুশরিক ছিল। এটি মূলত যুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা গ্রহণের অন্তর্ভূক্ত। উপরিউক্ত বিষয়টি অতীব জরুরী বিধায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং একজন মুসলিমের সাথে অন্য মুসলিমের সর্বাবস্থায় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে তার বর্ণনা এসেছে:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[নিশ্চয় মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে তাকওয়া করো; যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও][২] অনুরূপভাবে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পক্ষ থেকেও একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে সমগ্র মুসলিম

[১]) সূরাহ আত-তাওবাহ:২৫-২৭।

[২]) সূরাহ আল-হুজুরাত:১০।

জাতির প্রতি এ সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশনা এসেছে{الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ}[এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সুতরাং একে অপরকে জুলুম করবে না, অপমান করবে না এবং অবমূল্যায়ন করবে না। প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইয়ের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান পবিত্র ও নষ্ট করা অবৈধ][১]।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অবস্থাতেই এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হতে পারেন না। সর্বাবস্থায় পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধায় কখনো কোনো কারণে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি হলে তা নিরসন করা অপর মসলিমের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই কখনো কোনো মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অথবা সহযোগিতা করা ইসলামী শরীয়তে কোনো অবস্থাতেই অনুমোদন নেই। মুসলিম বলতেই অপর মুসলিম ভাইকে তার সামর্থানুসারে বৈধ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা কামনা করতে পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। তবে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে, একজন মুসলিম অমুসলিমের সহযোগিতা গ্রহণ বা কামনা করা ইসলামী শরীয়তে কতটুকু অনুমোদিত তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সীরাতের আলোকে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রথমতঃ অমুসলিমদের সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা

সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা পারস্পরিক সহযোগিতার আলোকে প্রয়োজনে অমুসলিমদের শ্রম ও সেবা গ্রহণেও কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। শুধু তাই নয় বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার শর্তে অতি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স) হিজরতের কঠিন সময় মদীনার পথ দেখানোর জন্য আশ্বস্ত হওয়ার পর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত বা আরকাতকে পথপদর্শক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন অথচ আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত বা আরকাত তখনও মুশরিক ছিলেন[২]।

দ্বিতীয়তঃ অমুসলিমদের যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহায্য-সহযোগিতা

মূলত যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুশরিকদের সহযোগিতা গ্রহণ দুভাগে বিবক্ত:

১) সক্রিয় যুদ্ধ নয় বরং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা: হুদাইবিয়া'র সন্ধির পূর্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) কুরাইশদের তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশ্‌র বিন সুফয়ানকে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বিশ্‌র বিন সুফয়ান খুযাআহ গোত্রের একজন অমুসলিম যুবক ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাছাড়া যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনে অমুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধের সরাঞ্জাম বিনামূল্যে অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে ধার নেয়ার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র

---

[১]) সহীহ বুখারী [৬০৬৪] ও সহীহ মুসলিম [২৫৬৪]।

[২]) সহীহ বুখারী [২২৬৩ ও ২২৬৪] ।

হুনায়নযুদ্ধে প্রস্তুতির প্রাক্কালে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ'র কাছ থেকে একশ বর্ম ও সমপরিমাণ অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন, তখনো সে মুশরিক ছিল; এটি যুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা গ্রহণের অন্তর্ভূক্ত। তবে তাতে যদি মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সহযোগিতার কারণে মুসলিমদের প্রভাবিত করার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। আল্লাহ'র রাসুল (স) হুনায়নের যুদ্ধে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ'র কাছ থেকে সমরাস্ত্রের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, তখন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ মুসলিমদের প্রভাবিত করার মতো অবস্থানে ছিল না।

২) যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের সহযোগিতা

মুসলিম যোদ্ধাদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অমুসলিম যোদ্ধাদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ সম্পৃক্ত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উহুদযুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অনুগত তিনশ যোদ্ধা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর সাহাবীদের কেউ কেউ ইহুদীদের সাথে মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির আলোকে তাদের সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) ইহুদীদের সাহায্য নিতে সম্মত হননি এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:{لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك}[মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা আমরা নিব না[১]।

তাছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স) বদরযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এক অমুসলিম যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; যেমন সহীহ মুসলিমের বর্ণীত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) বদরযুদ্ধে তাঁর পক্ষে যুদ্ধরত এক লোককে জিজ্ঞাসা করেন{أتؤمن بالله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك}[তুমি কী আল্লাহকে বিশ্বাস করো? লোকটি না সূচক উত্তর দিলে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: তুমি ফিরে যাও আমি কখনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না][২]।

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ ইসলাম অনুমোদিত নয়। তা যৌক্তিকও বটে; কারণ যে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরই অংশ এবং শত্রুর যে অংশটি মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ অনেকটা স্থান-কাল ও ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার পর যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন সংবাদ সংগ্রহ, সমরাস্ত্র ধার ও পথ প্রদর্শনের মতো বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) হিজরতের রাত্রি অতি স্পর্শকাতর সময়ে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত বা আরকাতকে আবু বকর (র)'র পরামর্শে পথপ্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে[৩]।

[১]) ওয়াকিদী, মাগাযী, প্রাগুক্ত:১/২১৫-২১৬ এবং তাবকাত ইবন সাআদ, প্রাগুক্ত:২/৩৫-৩৬।

[২]) সহীহ মুসলিম [১৮১৭] সুনান আবী দাউদ [২৭৩২]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: যাদু আল-মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৯০ এবং মুগনী আল-মুহতাজ, প্রাগুক্ত:৪/২২১।

[৩]) সহীহ বুখারী [২২৬৩ ও ২২৬৪]।

তবে অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া গেলে যুদ্ধক্ষেত্রেও অমুসলিমদের সহযোগিতা বৈধ বলে অনেক ইসলামী গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে হুনায়নের যুদ্ধে অনেক অমুসলিমও অংশ নিয়েছিল। তবে তাতে যদি মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সহযোগিতার কারণে মুসলিমদের প্রভাবিত করার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। সম্ভবত এই কারণেই উহুদযুদ্ধে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) ইহুদীদের সাহায্য নিতে সম্মত হননি; কারণ তখন ইহুদীরা মদীনায় মুসলিমদের প্রভাবিত করার মতো অবস্থানে ছিল এবং হুনায়নযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী অমুসলিমরা সেই অবস্থানে ছিল না বিধায় আল্লাহ'র রাসুল (স) তাতে অসম্মতি প্রদান করেননি।

মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ করার বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণ ইসলাম সম্মত নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন: যদি সমরনায়ক (ইমাম) মনে করেন যে, নির্দিষ্ট কোনো অমুসলিম প্রজ্ঞাবান ও বিশ্বস্ত এবং মুসলিমদের তার সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে বৈধ অন্যথায় নয়[১]। আল্লাহ আমাদের অমুসলিমদের সহযোগিতা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের সামর্থ্যবান করার শক্তি প্রদান করুন।

তৃতীয়: যুদ্ধে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা

হুনায়ন যুদ্ধের চিত্রায়ন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম যোদ্ধাগণ যখন পলায়ন শুরু করেন তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) ব্যতীত রণাঙ্গনে কেউ ছিলেন না। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহসিকতাপূর্ণ দৃঢ়তার কারণে পলায়নকারী মুসলিম যোদ্ধাগণ পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরে আসেন। এটি ছিল তাঁর বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার বিরল দৃষ্টান্ত। যেখানে ইতিহাসখ্যাত ও যুবক যোদ্ধাগণ পলায়ন করেছেন, তা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স) একষট্টি বছরের বয়স্ক ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যান। আল্লাহ'র ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন, যা নিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে তা পরিপূর্ণ করবেন, তাঁর দ্বীনকে অন্যান্য প্রচলিত দ্বীনসমূহের ওপর প্রাধান্য ও বিজয়ী করবেন[২]।

চতুর্থ: যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ

আহত যোদ্ধাদের সেবা-যত্ন করা অথবা তৃষ্ণার্থদের পানি পান করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত ও প্রমাণিত। তবে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত ও প্রমাণিত নয়। যদিও সহীহ বুখারী শরীফে{باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال}[পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের যুদ্ধ ও লড়াই] শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে; তবে যুদ্ধে মহিলাদের সক্রিয়

---

[১]) বিস্তারিত দেখুন: যাদু আল-মাআদ, প্রাগুক্ত:২/১৯০ এবং মুগনী আল-মুহতাজ, প্রাগুক্ত:৪/২২১।

[২]) তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত:২/৪৫।

অংশগ্রহণ সম্পৃক্ত কোনো হাদীস বা বর্ণনা উক্ত অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়নি। হাফিয ইব্‌ন হাজর আসকালানী বলেন:"আমি এই অধ্যায়ের বিন্যাসিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো হাদীস দেখিনি যেখানে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে"[১]।

তবে মহিলাদের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত হলো; যদি শত্রুপক্ষ মুসলিমদের কোনো শহরে আক্রমণ করে তাহলে সমগ্র শহরবাসীর যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তাতে যদি মহিলাদেরও প্রতিরক্ষামূলক অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয় এমতাবস্থায় যুদ্ধে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বৈধতা আছে, অন্যথায় নয়[২]। তবে হুনায়নের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের ছোরা সঙ্গে রাখার বিষয়টি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার জন্য যেমন তিনি নিজে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাছাড়া মা আয়েশা (র)'র বরাতে সহীহ বুখারীসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত যে, মা আয়েশা (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, উত্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:{جهادكن الحج}[তোমাদের জিহাদ হলো হজ্ব আদায় করা][৩]। উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে জিহাদে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়নি।

পঞ্চম: নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও দাস-দাসীদের হত্যা সম্পৃক্ত বিধান

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) এক মহিলার লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে বিশিষ্ট যোদ্ধা খালিদ বিন আল-অলীদ (র) হত্যা করেছিলেন, তা শুনে আল্লাহ'র রাসুল (স) তখনই নির্দেশ প্রদান করেন যে, খালিদকে গিয়ে বলো যে, আমি মহিলা ও নিপীড়িতদের হত্যা করতে নিষেধ করছি। এ বিষয়ে সকল ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন, কারো দ্বিমত নেই। তবে যদি কোনো মহিলা রণাঙ্গনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তখন তাকে হত্যা করা অবৈধ নয়। অনুরূপভাবে অমুসলিম শত্রুপক্ষ যদি কখনো নারী ও শিশুদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাদের হত্যা করা ব্যতীত শত্রুপক্ষকে পারস্ত করা অসম্ভব প্রতীয়মান হয় তখনও নারী ও শিশুদের হত্যা করা অবৈধ নয়[৪]।

ষষ্ঠ: যুদ্ধে নিহত অমুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সম্পৃক্ত বিধান

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) এই যুদ্ধেই প্রথম ঘোষণা করেন যে{ من قتل قتيلا وعليه بينة فله سلبه}[যুদ্ধে কেউ কাউকে হত্যা করলে তার প্রমাণ লাগবে অতঃপর সে নিহত ব্যক্তির মাঠে পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে][৫] এরপর থেকে এটি ইসলামী শরীয়তের বিধানে পরিণত হয় এবং এখনো তা বিদ্যমান।

সপ্তম: জিহাদ অুসলিমদের হিংসা-বিদ্বেষের উৎসাহিত করে না

---

১) ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত: ৬/৫১।

২) মুগনী আল-মুহতাজ, প্রাগুক্ত:৪/২১৯।

৩) সহীহ বুখারী [২৮৭৫],সুনান ইবন মাজাহ [২৯০১] ও মুসনাদ আহমদ [২৫৩২২]।

৪) আল-মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, প্রাগুক্ত:৪ ও আশ-শায়বিয়ানী, মুগনীল মুহতাজ, প্রাগুক্ত:৪/২২৩।

৫) সহীহ বুখারী [৩১৪২] ও সহীহ মুসলিম [১৭৫১] ও সুনান ইবন মাজাহ [২৩০৭]।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তায়েফে বনু ছাকীফকে দশ দিনের অধিক অবরোধ করে রাখার পর ফিরে আসার পথে সাহাবীদের কেউ কেউ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে বনু সাকীফের জন্য বদদোয়া করতে বা অভিশাপ দিতে বললে আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন:{اللَّهُمَّ اهد ثقيفا وأت بهم}[হে আল্লাহ! তুমি বনু ছাকীফকে হেদায়ত করো এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো][১]। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ইসলামে জিহাদের অনুমোদন আসেনি; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা অপসারণের লক্ষ্যে জিহাদের অনুমোদন এসেছে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র এই দোয়ার কিছু দিন পর বনু ছাকীফ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের প্রতিনিধি মদীনায় আগমন করে ইসলামের ঘোষণা দেন। সুতরাং অমুসলিমদের জন্য অভিশাপ বা হিংসা-বিদ্বেষ নয়, হেদায়াত ও সংশোধনের দোয়াই কাম্য।

অষ্টম: গনীমতের সম্পদের মালিকানা সম্পৃক্ত বিধান

ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে শত্রুপক্ষের সম্পদের মালিক হন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট যোদ্ধাগণ। তবে সমরনেতার রণাঙ্গন ত্যাগের পূর্বে যুদ্ধাস্থলে পৌঁছালে মুসলিমদের সম্মতি সাপেক্ষে সমরনায়ক ইচ্ছা করলে তাকেও গনীমতে শরীক করতে পারেন[২]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যোদ্ধাগণ গনীমতের সম্পদের মালিকানা লাভ করবেন সমরনায়কের গনীমত বন্টনের পর; তবে শত্রুপক্ষ ইসলাম গ্রহণ করলে সমরনায়ক তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি তা বন্টন করা না হয়ে থাকে। পুর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দল আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমন করে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে তাদের সম্পদ ও বন্দিদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন করলে আল্লাহ'র রাসুল (স) নিজের কাছে থাকা গনীমতের সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে বলেন যে, আমি তোমাদের ইসলামের আশায় গনীমতের বন্টন বিলম্ব করেছিলাম। বন্টনের পর তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা যাবে না; তবে মুসলিম যোদ্ধাগণ তাদের নওমুসলিম ভাইদের সম্পদ ও বন্দিদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিরিয়ে দিলে তা ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রে সমরনায়ক বা শাসকের নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে বন্টনকৃত গনীমত ফিরিয়ে দিতে মুসলিম যোদ্ধাদের বাধ্য করা প্রযোজ্য নয়। হাওয়াযিনের সম্পদ ও বন্দিদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স) কাউকে বাধ্য করেননি; বরং মুসলিম যোদ্ধাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

নবম: ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে গনীমত প্রদান

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) হুনায়ন যুদ্ধে বিজয়ের পর সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গনীমতের বড় একটি অংশ তাদের প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে দৃশ্যত সাম্যের নীতি পরিলক্ষিত হয়নি বিধায় অনেক সাহাবী বিশেষকরে আনসারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল যা পরে নিরাসন হয়। এটি ইসলামী শরীয়তে শুধু বৈধ নয়, সমরনায়ক বা শাসকের জন্য প্রয়োজনে তা বাঞ্ছনীয়।

---

[১]) জামে তিরমিযী [৩৮৭৭]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: ওয়াকিদী, মাগাযী, প্রাগুক্ত:৩/৯৩৭।

[২]) যেমনটি ঘটেছে খাইবার যুদ্ধে জাফর বিন আবী তালিবের ক্ষেত্রে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে গনীমতের হিস্যা প্রদান করেন।

দশম: আনসারদের মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি রাসুল (স)'র ভালোবাসা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বাণী চিরসত্য যে{إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم}[নিশ্চই শয়তান মানব সন্তানের রক্তের শিরায় চলাচল করে][১]'র আলোকে পরিলক্ষিত হয় যে, শয়তান আনসারদের একটি দলের অন্তরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র গনীমতের সম্পদ বন্টনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। শয়তান আনসারদের নিকট আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আচরণকে স্বজনপ্রীতি হিসেবে চিত্রায়ন করেছে। অন্যদিকে আনসারদের ত্যাগ ও বিসর্জনের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের মনে প্রতিবাদের স্পৃহা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যাখ্যার পর আনসারগণ তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ভালোবাসা যে কত গভীর তা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁরা স্বীকারোক্তি করেন{رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا}[আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স)'র বন্টন ও অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট][২]।

---

১) সহীহ বুখারী [৩১০১] ও সহীহ মুসলিম [২১৭৪]।

২) মুসনাদ আহমদ ১১৭৩০] ও মুসনাদ ইবন আবী শায়বাহ [৩৩০১৮]। মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাহ [৩৯৫]। শায়খ আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাবুক অভিযান

আল্লাহ'র রসুল (স) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন নবম হিজরী'র রজব মাসে এবং তিনি ইন্তিকাল করেছেন একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। অর্থাৎ এই অভিযান আল্লাহ'র রসুল (স) ইন্তিকালের এক বছর সাত মাস পূর্বে পরিচালিত হয় এবং এটি আল্লাহ'র রসুল (স)'র সক্রিয় অংশগ্রহণে সর্বশেষ যুদ্ধ বিধায় এর তাৎপর্য অপরাসীম।

তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

প্রখ্যাত ইতিহাসবীদ ও সীরাতবিদ ইব্‌ন সাআদের বর্ণনা মতে, মুসলিম বণিকদল যাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনা ও সিরিয়ায় যাতায়াত করেন তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ'র রসুল (স) অবগত হলেন যে, রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বড় ধরনের সৈন্য-সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাদের সাথে রোম সম্রাজ্যের অধীনে থাকা আরবাঞ্চলের বিভিন্ন খৃষ্টান গোত্র ও গোষ্ঠীগুলো যুক্ত হয়েছে এবং তাদের অগ্রগামীদল বালকা স্থানে পৌঁছেছে[১]। ইব্‌ন হুসাইনের বরাতে ইমাম তাবরানী'র বর্ণিত হাদীসে তাদের যোদ্ধা সংখ্যা চল্লিশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে[২]।

তাবুক অভিযানের চিত্রায়ন

অভিযানের সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল, যখন প্রচন্ড গরমের মধ্যে জনজীবন অতীষ্ট এবং মদীনায় ফসল কাটার সময় আসন্ন ছিল। আল্লাহ'র রসুল (স) যুদ্ধের গতি-বিধি সরাসরি ঘোষণা করেছেন যা তাঁর সাধারণ অভ্যাসের পরিপন্থী। বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রসুল (স) যখনই কোনো যুদ্ধের ইচ্ছে পোষণ করতেন তিনি পরোক্ষভাবে যুদ্ধের দিক ঘোষণা করতেন; তবে এই যুদ্ধ ব্যতিক্রম। প্রচন্ড গরমে আল্লাহ'র রসুল (স) যুদ্ধের ঘোষণা দেন। কঠিন সফর, অধিক শত্রু ও কাঙ্খিত সফলতা নিয়ে দ্বিধা সব মিলে মুসলিমদের জন্য এই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ খুবই কঠিন ছিল[৩]। এভাবে এই অভিযান মুসলিমদের সামনে এক কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় পরিণত হয়।

অন্যদিকে মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে প্রপাগন্ডা ছড়াচ্ছে এবং মুনাফিকরদের একদল নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করছে: তোমরা প্রচন্ড গরমে সফর করো না এবং আল-জাদ্দ বিন কায়স নামক এক মুনাফিক সরাসরি আল্লাহ'র রসুল (স)'র নিকট এসে বললো: আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। আল্লাহর শপথ আমার গোত্রের সকলেই জানে যে, আমার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আসক্ত কেউ নেই। আমার আশঙ্কা হয় আমি যখন নারীদের দিকে তাকাই আমি ধৈর্য ধরতে পারবো না। আল্লাহ'র রসুল (স) তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি প্রদান করেন[৪]।

---

[১]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২১৮ ও ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৮/৮৭।

[২]) মুজামে তাবরানী, প্রাগুক্ত:৪/২৮৫।

[৩]) সহীহ বুখারী [২৯৪৮ ও ৪৪১৮]।

[৪]) তাফসীর তাবরী [১৬৭৮৬]। ঘটনাটি সীরাতে ইব্‌ন ইসহাকে ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে এবং মুসান্নাফ আবদুর রজ্জাকে কাতাদাহ'র বরাতে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণানার জন্য দেখা যেতে পারে: আল-ইসাবাহ, প্রাগুক্ত:১/২৩০।

মুনাফিকদের দলপতি আবদুল্লাহ বিন উবাই তার সাথী-সঙ্গী ও মিত্রদের নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে ছিল। আল্লাহ’র রসুল (স) অভিযানে রওনা দিলে সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে বরাবরের মতো এই যুদ্ধেও পিছিয়ে পড়ে যাতে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কুরআন করীমে অবতীর্ণ হয়, এরশাদ হয়েছে:{ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ}[পেছনে থেকে যাওয়া লোকজন আল্লাহ’র রাসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর তাদের জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ’র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও! জাহান্নামের আগুন আরো গরম তারা যদি বুঝতে সক্ষম হতো][১]। এদের সম্পর্কে আরো বর্ণীত হয়েছে:{ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}[আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখো! তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনায় পড়ে আছে এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে][২]।

অপরদিকে মুমিনগণ আল্লাহ’র রসুল (স)’র ডাকে সাড়া দিয়ে সাধ্যমত বিভিন্ন যুদ্ধসামগ্রী ও অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে আসেন। উসমান (র) তিনশ উট (সফরে উট ব্যবহারের যাবতীয় সরাঞ্জামাদিসহ) ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসে মুদ্রাগুলো আল্লাহ’র রসুল (স)’র কোলে ঢেলে দেন। অতঃপর আল্লাহ’র রসুল (স) বলেন: { لا يضر عثمان ما فعل بعده}[এর পর উসমান যাই করুক তার কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না][৩]। আবু বকর (র) তাঁর সব সম্পদ ও উমর (র) তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আল্লাহ’র রসুল (স)’র সামনে উপস্থিত হন। যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি উমর (র) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: আল্লাহ’র রসুল (স) আমাদেরকে আল্লাহ’র রাস্তায় সাদ্‌কাহ করার নির্দেশ দিলে আমার মনে হলো আমার যেহেতু সম্পদ আছে আমি আজ আবু বকর (র)’র চেয়ে এগিয়ে যাবো; অন্তত একদিন তাঁর চেয়ে এগিয়ে থাকবো। তিনি বলেন: আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আল্লাহ’র রাসুল (স)’র নিকট উপস্থিত হলে আল্লাহ’র রসুল (স) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? উত্তরে বললাম: যা নিয়ে এসেছি তার সমপরিমাণ রেখে এসেছি। অতঃপর আবু বকর (র) তাঁর সব নিয়ে আল্লাহ’র রসুল (স)’র নিকট উপস্থিত হলে আল্লাহ’র রসুল (স) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি বলেন: তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ’র রসুল (স) কে রেখে এসেছি। আমি বললাম: কোনো বিষয়ে কখনো তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারবো না[৪]।

---

১) সূরাহ আত-তাওবাহ:৮১।

২) সূরাহ আত-তাওবাহ:৪৯।

৩) জামে তিরমিযী ৩৭০১]। হাদীসটি আহমদ বিন হাম্বল, হাকিম ও তাবরানী নিজ নিজ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন।

৪) জামে তিরমিযী [৩৬৭৫] ও সুনান আবী দাউদ [১৬৭৮]।

এই অভিযান মদীনা থেকে অনেক দূরত্বে বিধায় বাহন ব্যতীত পায়ে হেঁটে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যাঁদের বাহন বা সম্পদ নেই মুসলিমদের এমন একটি দল আল্লাহ'র রসুল (স)'র নিকট অন্যদের পিছনে আরোহী হয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন নিয়ে এগিয়ে আসেন; অনেকটা নিঃস্ব হওয়ার কারণে আল্লাহ'র পথে ব্যয় করতে না পেরে অশ্রুসজল হয়ে ফিরে যান। তাঁদের সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [আর না আছে তাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা) যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান করো এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কিছু নেই যে, যার ওপর তোমাদের সওয়ার করাবো তখন তারা ফিরে গেছে এমতাবস্থায় যে, তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো কিছু পাচ্ছে না যা ব্যয় (ব্যবহার) করবে][১]।

অতঃপর আল্লাহ'র রসুল (স) ত্রিশ হাজারের মতো যোদ্ধা নিয়ে অভিযানে রওনা হলেন[২]। মুসলিমদের ছোট্ট একটি দল পিছেয়ে পড়েছে যাঁদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। নিছক অলসতার কারণেই পিছিয়ে পড়েন, তাঁরা হলেন: কাআব বিন মালিক, মুরারাহ বিন রাবী, হিলাল বিন উমায়্যাহ ও আবু খায়সামাহ। তবে আবু খায়সামাহ পরে তাবুকে আল্লাহ'র রসুল (স)'র সাথে শরীক হন।

তাবরানী, ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদী'র বর্ণনা মতে আল্লাহ'র রসুল (স)'র তাবুকের অভিযানে রওনা দেয়ার পর এক দিন আবু খায়সামাহ তাঁর বাড়ীতে ফিরে দেখতে পান তাঁর বাগানে দুই স্ত্রী তাদের নির্দিষ্ট তাবুতে তাঁর জন্য খাবার ও ঠান্ডা পানি তৈরী করে রেখেছে। অতঃপর তিনি তাবুর দরজায় দাড়িয়ে তাঁর দুই স্ত্রী ও তাদের প্রস্তুতকৃত খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহ'র রসুল (স) সূর্যের নীচে উষ্ণ হাওয়া ও প্রচন্ড গরমের মধ্যে অবস্থান করছেন আর আবু খায়সামাহ শীতল ছায়ায় তৈরী খাবার ও সুন্দরী স্ত্রীসহ তার সম্পদের (বাগানে) মধ্যে অবস্থান করছে?! আল্লাহর শপথ! এই সম্পদ অবশ্যই দুভাগ করা হবে। তারপর তিনি বললেন: আমি তোমাদের কারো তাবুতে প্রবেশ করবো না; যতক্ষণ না আমি আল্লাহ'র রসুল (স)'র সাথে মিলিত হই। অতঃপর তাঁর স্ত্রীদ্বয় তাঁর জন্য সফরের সরাঞ্জাম তৈরী করে তাঁর নিকট নিয়ে আসলে তিনি আল্লাহ'র রসুল (স)'র সন্ধানে বের হয়ে তাবুকে অবস্থান করতঃ আল্লাহ'র রসুল (স)'র সাথে মিলিত হন। আবু খায়সামাহ মুসলিমদের কাছাকাছি পৌঁছালে মুসলিমগণ বলে উঠলেন: এক আরোহী এগিয়ে আসছে। আল্লাহ'র রসুল (স) বললেন: আবু খায়সামাহ হবে! অতঃপর তাঁরা বললেন: আল্লাহ'র শপথ হে আল্লাহর রসুল (স)! আবু খায়সামাহ। অতঃপর তাঁর বাহন থামানো হলো এবং তিনি আল্লাহ'র রসুল (স)'র দিকে এগিয়ে গেলে আল্লাহ'র রসুল (স) বললেন:

[১]) সূরাহ আত-তাওবাহ:৯২।

[২]) তাবকাতে ইব্ন সাআদ ও সীরাতে ইব্ন ইসহাক। বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ আবু ফারিস, আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যীন, দারুল ফুরকান, ১৪১১ হিজরী/১৯৯০ ইং, পৃ:৯৩। আলী সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রগুক্ত, ৭৬০।

এটি তোমার জন্য ভালোই হলো হে আবু খায়সামাহ!...তারপর আল্লাহ'র রসুল (স) কে ঘটনার বিবরণ দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কল্যাণের জন্য দোয়া করেন[১]।

ইমাম আহমদসহ আরো অনেকের বর্ণনা মতে যোদ্ধানুপাতে বাহনের স্বল্পতার কারণে এক উটে দুই-তিনজন করে রওনা হন এবং প্রচন্ড গরমে পানির তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লে অনেকেই উট জবাই করে বোঝা সঙ্কুচিত করে উটের পানি পান করা শুরু করে দেন।[২] ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে আবু হুরাইরাহ (র)'র বরাতে আরো বর্ণনা করেন যে, তাবুক অভিযানে মুসলিমগণ যখন ক্ষুধায় কাতর তখন আল্লাহ'র রসুল (স)'র কাছে আবেদন করলেন: হে আল্লাহ'র রসুল (স)! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের উট জবাই করে খাবো এবং বিশ্রাম নিব। আল্লাহ'র রসুল (স) (বাস্তবতা উপলব্ধি করে) বললেন: তোমাদের ইচ্ছেমতো করো। তখন উমর (র) আল্লাহ'র রসুল (স) কে বললেন: এভাবে বাহন জবাই করে খাওয়া হলে আমাদের বাহনস্বল্পতা দেখা দিবে। আপনি তাদেরকে নিজেদের বাড়তি খাবার নিয়ে আসতে বলুন এবং তাতে আপনি বরকতের দোয়া করুন আল্লাহ বরকত প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ'র রসুল (স) বড় চাদর জাতীয় কাপড় নিয়ে আসতে বললেন এবং তা বিছিয়ে দিলেন। তারপর প্রত্যেকের বাড়তি খাবার নিয়ে আসতে বলা হলো। অতঃপর কেউ এক মুষ্টি দানা নিয়ে আসলো, কেউ এক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলো, আর কেউ রুটির টুকরো নিয়ে আসলো এবং তাতে সামান্য খাবার সংগ্রহ হলে আল্লাহ'র রসুল (স) বরকতের দোয়া করে তাদেরকে নিজেদের প্রাত্রে ওখান থেকে নিতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন: তাঁরা সকলে নেয়ার পর আরো পাত্র ভরিয়ে নেয়া হয় এবং সকলে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহ'র রসুল (স) বলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ'র রসুল (স)। যে কেউ এদুটি নিয়ে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করবে না জান্নাত তার আড়াল হয়ে যাবে[৩]।

মুসলিমগণ যখন তাবুকে পৌঁছান সেখানে তার যুদ্ধের লেশমাত্র কিছুই দেখলেন না। মূলত প্রতিপক্ষের যারা যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়েছিল তাদের অন্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম বাহিনীর ভয় ধরিয়ে দিলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে পড়ে। তারপর আইলাহ'র শাসক ইউহান্না আল্লাহ'র রসুল (স)'র নিকট উপস্থিত হলে আল্লাহ'র রসুল (স) জিযয়াহ (কর) প্রদানের শর্তে সন্ধি করেন এবং জারবা ও আযরাহ গোত্রদ্বয়ও জিযয়াহ প্রদানের শর্তে সন্ধিতে উপণীত হয়। অতঃপর আল্লাহ'র রসুল (স) তাদের উদ্দেশ্যে সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করান।

তাবুক থেকে ফেরার সময় যোদ্ধাদল আল্লাহ'র রসুল (স)'র সাথে হিজ্র (ছামুদ জাতির বাসস্থান) নামক স্থান অতিক্রম করলে আল্লাহ'র রসুল (স) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন:{ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا

[১]) তাবরানী, ইব্‌ন ইসহাক ও ওয়াকিদী ঘটনাটি নিজ নিজ গ্রন্থে বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ আবু ফারিস, আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যীন, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩২-১৩৪। আলী সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রগুক্ত, ৭৬৫।

[২]) তাবকাতে ইব্‌ন সাআদ, প্রাগুক্ত: ৩/২২০।

[৩]) সহীহ মুসলিম [২৭]।

{باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي}[তোমরা ওদের বাসস্থানে প্রবেশ করবে না যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে তাহলে তাদের যেই পরিণতি হয়েছে তোমাদের তাই হবে; তবে তোমরা কান্নারত অবস্থায় থাকবে। তারপর তিনি মাথা নুয়ে খুব দ্রুত ঐ অঞ্চল অতিক্রম করেন][১]।

তারপর আল্লাহ'র রসুল (স) মদীনার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছালে তিনি তাঁর সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেন:{هذا أحد جبل يحبنا ونحبه}[এটি উহুদ পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমারা তাকে ভালোবাসি][২] এবং তিনি তাঁর সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আরো বলেন: মদীনায় কিছু লোক রয়েছে যারা কোনো সফর করেনি এবং কোনো অঞ্চল অতিক্রম করেনি তবে তারা তোমাদের সাথেই আছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ'র রসুল (স)! তারা কী মদীনায় আছেন? তিনি বললেন: তারা মদীনায় রয়েছে, ওযর (সমস্যা) তাদের অভিযানে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে[৩]। আল্লাহ'র রসুল (স) সেই বছরের রমাদ্বান মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। এই সফরে প্রায় দুইমাস আল্লাহ'র রসুল (স) মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে

আল্লাহ'র রসুল (স) মদীনায় পৌঁছে অভ্যাসমত প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত নামায আদায় করে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে মসজিদে বসলে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিরা একে একে এসে আল্লাহ'র রসুল (স)'র নিকট শপথ করে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণ উপস্থাপন করতে লাগলো। এদের সংখ্যা আশি জনের অধিক। অতঃপর বাহ্যত তাদের অজুহাত গ্রহণ করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হলো, যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}[তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ওযর-আপত্তি নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো: ছলনা করো না। আমি কখনো তোমাদের কথা মানবো না; আমাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের খবরাদি অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তার রাসুল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ে অবগত সেই সত্তার নিকট, তিনি-ই তোমায় বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ'র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের থেকে পাশ কাটিয়ে যাও। সুতরাং তুমি তাদেরকে এড়িয়ে যাও; নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম][৪]।

---

১) সহীহ বুখারী [৪৭০২] ও সহীহ মুসলিম [২৯৮০]।

২) সহীহ বুখারী [১৪৮১] ও সহীহ মুসলিম [১৩৯২]।

৩) সহীহ বুখারী [২৮৩৯],সহীহ মুসলিম [১৯১১] ও সুনান আবী দাউদ ২৫০৮]।

৪) সূরাহ আত-তাওবাহ: ৯৪-৯৫।

এদের অধিকাংশই ছিল মূলত মুনাফিক যা এ সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআন করীমের আয়াত থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়। তবে পিছিয়ে থাকা লোকদের মধ্যে কাআব বিন মালিক ও তাঁর দুই সাথী'র [মুরারাহ বিন রাবী ও হেলাল বিন উমাইয়্যাহ] বিষয়টি তাঁদের তাওবা সম্পৃক্ত আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকলো। কাআব বিন মালিকদের ঘটনাটি কুরআন করীমে তাওবাহ গৃহীত সম্পৃক্ত আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হলেও সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ সকল হাদীস গ্রন্থে কাআব বিন মালিকের বরাতে দীর্ঘ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণীত হয়েছে। নিম্নে বুখারী শরীফে বর্ণীত হাদীসের বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হলো:

বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক বর্ণনা করেন যে,"ঐ যুদ্ধে আমার পিছিয়ে থাকার বিষয়টি মূলত এই রকম যে, ফসল কাটার সময়ে অভিযানের ঘোষণা হলে ফসল কাটার ব্যস্ততার কারণে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব হলেও আমি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিমদের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, আমি খুব দ্রুত প্রস্তুতি শেষ করতে পারবো কিন্তু তা আমি পারিনি। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে যায় এবং আমি মনে করলাম যে, আমি বের হয়ে তাঁদেরকে ধরতে পারবো-হায়! যদি আমি তা পারতাম; তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ'র রাসুল (স) অভিযানে চলে যাওয়ার পর আমি বের হয়ে মদীনায় চক্কর দিয়ে দেখি যারা আমার মতো অভিযানে অংশ নেয়নি তারা হয়ত দুবর্ল বা সমস্যার কারণে পিছিয়ে পড়েছেন [আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে যাদের অজুহাত গৃহীত হয়েছে] অথবা মুনাফিক, এটি আমাকে আরো কষ্ট দেয়... এবং যখন অবগত হলাম যে, তিনি কাফেলা নিয়ে ফিরছেন আমার মনে ধারণা হলো মিথ্যা বলে অন্যান্যদের মতো তাঁর রাগ থেকে আগামীকাল বেরিয়ে আসবো?!...এ বিষয়ে আমার পরিবারের প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহযোগিতা নিলাম। তবে যখন বলা হলো আল্লাহ'র রাসুল (স) মদীনায় আগমন করেছেন তখন আমার মন থেকে সকল বাতিল চিন্তা উধাও হয়ে গেল এবং প্রতিজ্ঞা করলোম তাঁকে সত্যি বলবো। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে সালাম দিলাম তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির ন্যায় মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি বললেন: এদিকে এসো। আমি হেঁটে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি বলেন: কেন অভিযানে পিছিয়ে থেকেছ? তুমি কী বায়আত গ্রহণ করোনি? আমি বললাম: হ্যাঁ। অবশ্যই, আল্লাহর শপথ! আমি যদি আপনি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কারো সামনে বসতাম আমি অজুহাত দেখিয়ে যুক্তির মাধ্যমে আপনার রাগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম এবং আমি তার্কিকও বটে। কিন্তু আল্লাহ'র শপথ! আমি যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে আজ কোনো মিথ্যা বলি অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে অবগত করে আমার ওপর রাগান্বিত করবেন। আর যদি সত্যি বলি তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন। নিশ্চয় আমি আল্লাহ'র ক্ষমা প্রত্যাশী। আল্লাহ'র শপথ! আমার কোনো সমস্যা ছিল না... অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: তবে তা সত্য। তুমি যাও; যতক্ষণ না তোমার বিষয়ে আল্লাহ ফায়সালা প্রদান করেন।

আমি উঠে আসলাম। বনী সালমাহ'র কিছু লোক অন্যদের মতো অজুহাত প্রদর্শন না করার কারণে আমাকে তিরস্কার করতে লাগলো। আমি তাদেরকে বললাম: আমার মতো কী আর কেউ আছে? তারা বললো: হ্যাঁ। আরো দুই জন যারা তোমার মতো বলেছে এবং তাদেরকেও তোমার মতো বলা হয়েছে। আমি বললাম: তাঁরা কারা? তারা বললো: মুরারাহ বিন রাবী ও হেলাল বিন উমাইয়্যাহ। তারা এমন দুই জন সৎ লোকের নাম উচ্চারণ করলো

যাঁরা বদরযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে আমি এখনো আদর্শ খুজে পাই। আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে মুসলিমদের নিষেধ করেছেন। অতঃপর লোকজন আমাদের এড়িয়ে চলতে শুরু করলো এবং তারা আমাদের নিকট অন্যরকম হয়ে গেল। পৃথিবী আমার কাছে অপরিচিত মনে হতে লাগলো। এভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত করলাম এবং আমার অপর দুই সাথী ঘরেই অবস্থান নেয় এবং কান্না কাটি করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তিন জনের মধ্যে আমি কনিষ্ঠ ও শক্ত বিধায় ঘর থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে মসজিদে নামাযে শরীক হই এবং বাজারে ঘোরা-ফেরা করি, তবে কেউ আমার সাথে কথা বলে না। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে মসজিদে আসি, নামাযের পর তাঁর মজলিসে বসে সালাম দিই। আমি মনে মনে বলি: তিনি কী আমার সালামের উত্তরে তাঁর ঠোঁট দুটো নাড়া-চাড়া করলেন, না কি করেননি? তারপর তাঁর কাছেই নামায আদায় করি তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাই। আমি যখন নামাযে থাকি তিনি আমার দিকে তাকান; তবে আমি যখন তাঁর দিকে তাকাই তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। এই রকম লুকোচুরি চলতে লাগলো।

এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। মদীনার বাজারে খাবার বিক্রি করতে আসা সিরিয়ার খৃষ্টান নিবতীদের একজন বললো: কেউ আমাকে কাআব বিন মালিকের সন্ধান দিতে পারবে? লোকজন আমার দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলে সে আমার নিকট এসে (খৃষ্টান) গাস্সানের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে একটি পত্র হস্তান্তর করে। পত্রের ভাষা নিম্মরূপ:"আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনার সাথী [মুহাম্মদ (স)] আপনার সাথে অবিচার করেছেন। আল্লাহ আপনাকে অমর্যাদাকর স্থানে রাখবেন না। অতঃপর আপনি আমাদের মাঝে চলে আসুন আমরা আপনাকে মূল্যায়ন করবো"। পত্র পাঠের পর আমি বললাম: এটিও একটি মুসিবত। অতঃপর সেটি আমি চুলোয় পুড়িয়ে ফেললাম।

পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন পর আল্লাহর রাসুল (স)'র এক প্রতিনিধি এসে আমাকে জানালেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাকে স্ত্রীর কাছে থাকতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম: আমি তাকে তালাক দিব, না আমি কী করবো? তিনি বললেন: তালাক দিবেন না বরং তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন তার কাছে যাবেন না। আমার মতো আমার দুই সাথীদের কাছেও একই বার্তা পৌঁছানো হলো। অতঃপর আমি স্ত্রীকে বললাম: তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও; যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তুমি ততদিন তাদের সাথেই থাকো... অতঃপর আরো দশদিন অতিবাহিত হয়ে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলো যখন থেকে আল্লাহর রাসুল (স) আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। পঞ্চাশতম দিন ফজরের নামাযের পর আমাদের বাড়ীর ছাদে বসা অবস্থায় সুউচ্চকণ্ঠে আমি একটি আওয়ায শুনলাম কে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে চিৎকার করে বললো: সুসংবাদ গ্রহণ করো হে কাআব বিন মালিক। আমি সেজদায় পড়ে গেলাম এবং জানতে পারলাম মুক্তির পয়গাম এসেছে। ফজরের নামাযের পর আল্লাহ'র রাসুল (স) আমাদের তাওবাহ আল্লাহ'র কাছে কবুল হওয়ার ঘোষণা দেন। অতঃপর লোকজন আমাদের সুসংবাদ দিতে লাগলেন। আমার মতো আমার অপর দুই সাথীদেরও সুসংবাদ দেয়া হয়। আমাকে সুসংবাদ প্রদানকারী যার কণ্ঠ আমি শুনেছিলাম সে আমার কাছে আসার পর আমি আমার পোষাকদ্বয় খুলে তাঁকে পরালাম। আমার কাছে সেই দিন এই দুটো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে দুটো

পোষাক ধার নিয়ে পরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দিকে রওনা দিলাম। অতঃপর লোকজন দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাওবাহ কবুল হওয়ার শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন।

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। আল্লাহ'র রাসুল (স) বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পার্শ্বে সাহাবীগণ ছিলেন। অতঃপর তালহা বিন আবদুল্লাহ (র) দৌঁড়ে এসে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং শুভেচ্ছা জনালেন। আল্লাহ'র শপথ মুহাজিরীনদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ আমার দিকে আসলেন না এবং আমি কখনো তালহার এই সদ্ব্যবহার ভুলবো না। কাআব বিন মালিক বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সালাম দিলাম। তিনি বললেন: [আনন্দে তাঁর চেহেরা উজ্জল হয়ে গেছে] তোমাকে তোমার মায়ের জন্ম প্রদানের দিন থেকে উত্তম দিনের সুসংবাদ নাও। কাআব বিন মালিক বলেন: আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে হে আল্লাহ'র রসুল (স)! তিনি বললেন: না, বরং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে। অতঃপর আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমার সম্পদ আল্লাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উদ্দেশ্যে সাদকাহ করে দিব বলে তাওবাহ করেছিলাম। আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: কিছু সম্পদ নিজের কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! সততাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। জীবনে যত দিন বেঁচে থাকবো সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলবো না বলে তাওবাহ করেছিলাম[১]।

তাঁদের তাওবাহ কবুল সম্পৃক্ত কুরআন করীমে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়: { لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ }[আল্লাহ তাওবাহ কবুল করেছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাওবাহ কবুল করেন তাদের প্রতি; নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি অতীব দয়াশীল ও পরম করুণাময়। এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা দয়াময় অতি করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে তাকওয়া করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো][২]।

তাবুক অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মক্কাহ বিজয়ের পর ইসলাম ধীরে ধীরে আরব উপদ্বীপে (সমগ্র আরবাঞ্চল) তার অবস্থান দৃঢ় ও স্থায়ী করে নিচ্ছে দেখে রোমের খৃষ্টান সম্প্রদায় দূর থেকে ইসলামের প্রতি ভয় ও উদ্বেগের সাথে দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। মূলত রোমানজাতি প্রাচ্যে আবির্ভূত খৃষ্টধর্মকে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করেনি বরং প্রাচ্যে তাদের উপনিবাস

---

১) সহীহ বুখারী [৪৪১৮] ও সহীহ মুসলিম [৭১৬]।

২) সূরাহ আত-তাওবাহ:**১১৭-১১৯**।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাহ্যিকভাবে খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছে। অতঃপর খৃষ্টধর্মকে নিয়ে তাদের ইচ্ছে মতো খেলেছে, পরিবর্তন করেছে, সংযোজন-বিয়োজন করেছে এবং অনেকটা পৌত্তলিকতার সাথে সংমিশ্রণ করেছে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে যত নবী-রাসুলগণ তাঁর বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতিকে ইসলাম ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র আগমন সম্পর্কে বলেছেন, সুসংবাদ দিয়ে তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন; যা তাওরাত-ইঞ্জীলসহ প্রতিটি আসমানী গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থকে নিজ নিজ স্বার্থে পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছে মতো সংযোজন-বিয়োজন করেছে। কারণ তারা অবগত ছিল যে, পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও মানবজাতিকে সৃষ্টজীবের গোলামী থেকে মুক্তির মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ'র গোলামীর লক্ষ্যে, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে বের করে প্রশস্ততার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে এবং প্রচলিত ধর্মসমূহের অবিচার থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের ছায়া তলে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ'র রাসুল (স) ও মুসলিমদের আবির্ভাব হয়েছে।

সুতরাং আরবাঞ্চলে এই ধর্মের স্থায়ী ও দৃঢ় অবস্থান রোমানদের জন্য অবশ্যই ভয় ও উদ্বেগের বিষয় ছিল যা মক্কাহ বিজয়ের পর আরবাঞ্চলের অনিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর দলে দলে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তারা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তারা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে সিরিয়া ও হিজাযের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দেয়। কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারলো যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানো তাদের জন্য সুবিধাজনক তো নয়ই; বরং তা ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে চিন্তা করে তারা যুদ্ধের চিন্তা বাদ দিয়ে সন্ধি করে জিযয়াহ (কর) প্রাদানের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে নেয়।

অন্যদিকে যুদ্ধ সংঘটিত হবে না তা সত্ত্বেও মুসলিমদের ঈমান-আকীদাহ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাঁর রাসুল (স)'র প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য স্বীকার ও জান-মাল বিসর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সুদূর মদীনা থেকে তাবুকের অভিযানে গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রচন্ড তাপের মধ্যে কঠিন সফরের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স)'র সাহাবীদের দ্বীনের রাস্তায় জান-মাল বিসর্জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমগ্র মানবজাতির আদর্শরূপে নির্বাচিত করেন। তাবুক অভিযানে মুসলিমদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা এবং উক্ত অভিযান থেকে নির্গত বিভিন্ন শরয়ী বিধানসমূহ নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১) জিহাদে সম্পদের গুরুত্ব ও বিধান

শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণই একমাত্র জিহাদ নয়। যখনই শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অর্থব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন প্রতিটি মুসলিমদের জন্য সাধ্যমত অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত বিষয়ে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করে বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র জিহাদের ব্যয় বহন করতে সামর্থ্য না হলে রাষ্ট্র তার নাগরিগকদের ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ আদায়ে বাধ্য করতে পারবে। পাশাপশি ফকীহগণ আরো ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের সম্পদ পর্যাপ্ত হলে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিমদের নিকট থেকে জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ বৈধ নয়। রাষ্ট্রের

নাগরিগদের সম্পদ ব্যয় অপেক্ষা রাষ্ট্রের সম্পদ জিহাদের জন্য ব্যয় করা উত্তম; তবে কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদের উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করলে তা গ্রহণ করা যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাবুক অভিযানে অর্থ সংগ্রহকালে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের সাধ্যমত জিহাদের জন্য অর্থায়নের আহ্বান জানালে সাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ সাধ্যমত সাড়া দিয়েছেন। উমর (র) নিজ সম্পদের অর্ধেক ও আবু বকর (র) তাঁর পূর্ণ সম্পদ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং উসমান (র) প্রয়োজনীয় সরাঞ্জামদিসহ তিনশ উট ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বলেন:{لا يضر عثمان ما فعل بعده}[এর পর উসমান যাই করুক তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না][১]। আল্লাহ'র রসুল (স)'র এই বক্তব্য থেকে ইসলামে উসমান (র)'র মর্যাদা ও অবদানের কথা সহজেই প্রতীয়মান হয়। পাশাপশি উসমান (র) সম্পর্কে যারা অশালীন মন্তব্য করে তাদের সতর্কীকরণ ও উসমান (রা)'র প্রতি তাদের অবিচারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে অনেকেই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো রকম আর্থিক সহযোগিতা করতে না পেরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছে উপস্থিত হয়ে অশ্রুসজল নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন যা কুরআন করীমে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে: {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ}[আর তখন তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো কিছু পাচ্ছে না যা ব্যয় (ব্যবহার) করবে][২]।

২) মুনাফিকদের স্বভাব ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র

তাবুক অভিযানে আল্লাহ'র রাস্তায় জান-মাল নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কুরআন করীমের প্রচুর আয়াত অবতীর্ণ হয়; যা অন্য কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। এর মাধ্যমে একজন সত্যিকার মুসলিমের ইসলামের প্রতি সততা, আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা যেমন প্রমাণিত হয়, অন্য দিকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহ'র রাস্তায় জান-মাল নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশকারী মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়, যেমন কুরআন করীমে বর্ণীত হয়েছে:{ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ}[পেছনে থেকে যাওয়া লোকজন আল্লাহ'র রাসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর তাদের জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ'র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও! জাহান্নামের আগুন আরো গরম তারা যদি বুঝতে সক্ষম হতো। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তারা তোমার

---

১) জামে তিরমিযী [৩৭০১] হাদীসটি আহমদ বিন হাম্বল, হাকিম ও তাবরানী নিজ নিজ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন।

২) সূরাহ আত-তাওবাহ:৯২।

কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে; তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং কখনো আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো][১]।

পাশাপাশি কুরআন করীমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলিমগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হয়ে ভয়াবহ বিপদে পড়ে যান। অথচ ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকেও এই রকম বিপদ ও প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয় না, এরশাদ হচ্ছে:{ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}[যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন][২]। উপরিউক্ত কুরআনী বর্ণনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের বাহ্যিক শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে যেমন মুসলিমদের সর্তক থাকা প্রয়োজন, অভ্যন্তরীণ শত্রুকে চিহ্নীত করে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে সর্তক থাকা আরো বেশি প্রয়োজন।

৩) আহ্লে কিতাবদের জিযয়াহ (কর) প্রদান সম্পৃক্ত

তাবুক যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তাবুকে পৌঁছানোর পর রোমান ও আরবখৃষ্টান যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছিল তারা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে সন্ধি করে জিযয়াহ বা কর প্রদানে সম্মত হয়।

জিযয়াহ মূলত মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের আবশ্যিক প্রদেয় আর্থিক কর। যেমন মুসলিমদের অবশ্যই প্রদেয় যাকাত। কিন্তু যাকাত ইবাদত হলেও জিযয়াহ এবাদত নয়; তবে জিযয়াহ প্রদানকারী অমুসলিম আহলে কিতাবদের মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। আহলে কিতাবরা আকীদাহ'র ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিষয়াদিতে ভিন্ন হলেও কিছু কিছু বিষয়ে অভিন্ন বিধায় তারা জিযয়াহ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ উপভোগ করতে পারবে; তবে যে সকল বিষয় আহলে কিতাবরা তাদের ধর্ম মতে বৈধ মনে করলেও ইসলামে তা অবৈধ, যেমন মদ ও শুয়রের মাংশ'র মতো আরো যত বিষয়াদি তা উপরিউক্ত প্রদানকৃত সুবিধার অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু অমুসলিম পৌত্তলিকরাও জিযয়াহ প্রদানের মাধ্যমে আহলে কিতাবদের মতো নাগরিক সুবিধাসমূহ উপভোগ করতে পারলেও নাস্তিক্য, শির্ক এবং পৌত্তলিকতা ও ইসলামের মূল বিষয়াদির মধ্যে কোনো প্রকার সামঞ্জস্যতা না থাকার কারণে তাদেরকে আহলে কিতাবদের মতো মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে না।

৪) অভিশপ্ত জাতি ও স্থানসমূহ এড়িয়ে চলা প্রসঙ্গে

তাবুক অভিযান শেষে মদীনায় ফেরার পথে অভিশপ্ত ছামুদ জাতির আবাসস্থল অতিক্রম করার সময় আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে দ্রুত অতিক্রম করেন এবং তাঁর

---

[১]) সূরাহ আত-তাওবাহ:৮১-৮৩।

[২]) সূরাহ আত-তাওবাহ:৪৭।

সাহাবীদের অভিশপ্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতে বারণ করে তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন:{ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي}[তোমরা ওদের বাসস্থানে প্রবেশ করবে না যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে তাহলে তাদের যেই পরিণতি হয়েছে তোমাদের তাই হবে; তবে তোমরা কান্নারত অবস্থায় থাকবে। তারপর তিনি মাথা নুয়ে খুব দ্রুত ঐ অঞ্চল অতিক্রম করেন][১]। পৃথিবীতে এই রকম প্রচুর আল্লাহ'র নিদর্শন রয়েছে; যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান রেখেছেন, যেন তাঁর বান্দারা তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অভিশপ্ত জাতির কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাকে। সুতরাং খেলার ছলে অথবা ভুল করেও অভিশপ্ত স্থানে প্রবেশ করা সমাচীন নয়; যা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপরিউক্ত হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়।

৫) শাস্তি প্রদানে মুমিন ও মুনাফিক এক সমান নয়

তাবুক অভিযানে দৃশ্যমান যে, প্রায় আশি জনের অধিক মুনাফিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাবুক অভিযানে আল্লাহর রাসুল (স)'র রণসঙ্গী হয়নি এবং তাদের মিথ্যা অজুহাত আল্লাহ'র রসুল (স) গ্রহণ করে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। অথচ সেই অভিযানে পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, তাঁরা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে থাকেননি; অলসতা অথবা ব্যক্তিগত কাজের চাপে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে অনুতপ্ত হয়েছেন এবং সত্য কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু তাঁদেরকে নতুন কায়দায় শাস্তি প্রদান করা হয়। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধের শাস্তি প্রদানে মুমিন ও মুনাফিক এক সমান নয়। তবে দৃশ্যত মুমিনদের শাস্তি অনেক কঠিন হলেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদের ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠিন শাস্তি প্রদান করে তাঁদেরকে যেমন পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দিলেন। অনুরূপভাবে কুরআন করীমে তাঁদের তাওবাহ কবুলের ঘোষণা প্রদান করে ইহজগতে তাঁদেরকে সম্মানিত করে তাঁদের স্মৃতিকে স্থায়ী করে রাখলেন। অন্যদিকে মুনাফিকরা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে পৃথিবীতে পার পেয়ে গেলেও পরকালে তাদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তৈরী করে রেখেছেন কঠিন ও অপমানজনক শাস্তি এবং তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন নিকৃষ্টতম স্থান। যেমন কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে:{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}[নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী কখনও পাবে না][২]।

৬) ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করার বৈধতা সম্পৃক্ত বিধান

বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক (র) সহ তাবুক অভিযানে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলতে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিষেধ করেছিলেন; এমন কি তাঁদের স্ত্রীদের প্রতিও এই আদেশ মানা আবশ্যক ছিল। অথচ আল্লাহ'র রাসুল (স) অন্য হাদীসে এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় কথা-বার্তা বন্ধ রাখা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়

---

[১]) সহীহ বুখারী [৪৭০২] ও সহীহ মুসলিম [২৯৮০]।

[২]) সূরাহ আন-নিসা:১৪৫।

যে, ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা অবৈধ নয়। তবে যে কারণে তাকে ত্যাগ করা হয়েছে তা রহিত হয়ে গেলে তাকে গ্রহণ করা অনিবার্য। যেমন কাআব বিন মালিক (র) ও তাঁর সঙ্গীদের তাওবাহ কবুল হওয়ার পর মুসলিমগণ দলে দলে তাঁদেরক শুভেচ্ছা জানিয়ে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

৬) ধর্মীয় কারণে সালামের উত্তর না দেওয়া সম্পৃক্ত বিধান

বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর প্রদানে তাঁর ঠোঁট নাড়লেন কি নাড়লেন না এ বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা হলে তার সালামের উত্তর প্রদান করা আবশ্যক নয়[১]। যদি উক্ত ব্যক্তির সালামের উত্তর প্রদান করা আবশ্যক হতো তাহলে আল্লাহ'র রাসুল (স) অবশ্যই তাকে শুনিয়ে উত্তর প্রদান করতেন, ন্যূনতম ঠোঁট নেড়ে হলেও তার সালামের উত্তর বুঝিয়ে দিতেন।

৭) প্রতিকূল অবস্থায় নিজের ওপর আস্থা রাখা

বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক বর্ণনা করেন যে, আমার পরিচিত লোকজন আমার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে, আমার বৈধ স্ত্রীর সহচার্য আমার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে। সর্বোপরী প্রাণপ্রিয় ব্যক্তি যাঁর সাহচর্যে আমরা ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে পরিচিতি লাভ করেছি সেই আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সালাম দিলে উত্তর প্রদানে তাঁর ঠোঁট দুটোও নড়ে না, বিশাল পৃথিবী আমার কাছে সঙ্কোচিত হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় গাস্‌সানের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পত্র এসেছে এবং তাঁকে এই বলে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে,"যাঁরা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাঁদের ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে আসুন, আপনাকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হবে এবং আপনার ভাগ্য ফিরে যাবে"[২] স্বাভাবিকভাবে লোভনীয় প্রস্তাব যে কেউ লুফে নিবে। কিন্তু আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীকে এই রকম লোভনীয় প্রস্তাবও নিজের আস্থা ও বিশ্বাসে এতটুকু টলাতে পারেনি; তবে এই প্রতিকূল ও সংকটময় সময়ে দুঃখ আরো বৃদ্ধি করেছে মাত্র, তাই এই লোভনীয় প্রস্তাবকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আরো কঠিন পরীক্ষা বিবেচনা করে পত্রটি কুচি কুচি করে চুলোয় পুড়িয়েছিলেন।

৮) সুসংবাদ শুনে সিজদাহ শুক্‌র আদায় করা

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, পঞ্চাশ দিন পর বিশিষ্ট সাহাবী কাআব বিন মালিক (র) নিজ তাওবাহ কবুলের সুসংবাদ প্রাপ্তির পর প্রথমে আল্লাহ'র দরবারে নতমস্তকে সিজদাহ শুক্‌র আদায় করলেন। ইমাম ইব্‌ন কাইউম বর্ণনা করেন যে,'মুসাইলামাহ'র (মিথ্যা নবী দাবীদার) মৃত্যুর সংবাদ শুনে আবু বকর (র) সিজদাহ শুক্‌র আদায় করেছিলেন। খারেজীদের দলনেতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আলী (র) সিজদাহ শুক্‌র আদায় করেছিলেন এবং আল্লাহ'র রাসুল (স) সিজদাহ শুক্‌র আদায় করেছিলেন যখন তাঁকে জিবরীলে আমীন সুসংবাদ প্রদান করেন "যে ব্যক্তি তাঁর ওপর একবার সালাত/সালাম পড়বে আল্লাহ তার

---

[১]) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/২০।

[২]) সহীহ বুখারী [৪৪১৮] ও সহীহ মুসলিম [৭১৬]।

ওপর দশটি রাহমত অবতরণ করবেন"[১]। কাআব বিন মালিক (র), আলী (র), আবু বকর (র) এবং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সুসংবাদ শুনে সিজদাহ শুক্র আদায় থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কোনো সুসংবাদ শুনার পর সিজদাহ শুক্র আদায় করা সুন্নাত।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র যুদ্ধাভিযান বদরযুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয়ে তাবুকযুদ্ধের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। সাধারণত যুদ্ধে বিজয় অর্জনই প্রধান ও মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এটিই যুদ্ধের অঘোষিত নিয়ম-নীতি। তা সত্ত্বেও মহানবী (স) যেহেতু মানবতার দূত ও সমগ্র বিশ্বের জন্য রাহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন; সুতরাং তিনি কখনো যুদ্ধের তথাকথিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেননি। সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে অপদস্ত বা অনুগত করতে অথবা কোনো দেশ বা অঞ্চল দখল করতে যুদ্ধে লিপ্ত হননি; বরং তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত সকল যুদ্ধ আল্লাহ'র নির্দেশে তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পরিচালিত হয়েছিল। কখনো মানবতা বিরোধী কোনো অপরাধ ও আচরণ মহানবী (স) নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো যুদ্ধে সংঘটিত হয়নি।

রণাঙ্গনে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধের সেনা বাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে,{ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً }[তোমরা অসহায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না][২]। অন্য এক হাদীসে আরো বর্ণনা এসেছে যে, কোনো ফলজ বৃক্ষ কাটা যাবে না, ফসল বিনষ্ট করা যাবে না এবং চলন্ত পানি বন্ধ করা যাবে না, যা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ঘোষিত যুদ্ধবিষয়ক মানবাধিকার সনদরূপে পরিচিতি লাভ করেছে; অথচ এই সকল নিয়ম-নীতি মহানবী (স)'র যুদ্ধনীতির আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে যা মহানবী (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

তা সত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (স) ও আরবদের সম্পর্কে অপপ্রচার করে বলে থাকে যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স) অশিক্ষিত ও বর্বর আরবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন। যেই জাতির কোনো সভ্যতা ও আভিজাত্য নেই, নেই কোনো শিক্ষা ও সংস্কৃতি। প্রাধান্য বিস্তার কিংবা বংশীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বদা যুদ্ধে মেতে থাকতো। শত্রু কিংবা বন্ধুর সাথে সামান্য বিষয়েও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তো। শত্রুর অবর্তমানে নিজেরাই নিজেদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও যুদ্ধবাজ ছিলেন। তাদের মিথ্যা অভিযোগের বাস্তবতা সঠিকভাবে পর্যালোচনার করার লক্ষ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে দুপক্ষের হতাহতের সংখ্যার তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সংখ্যা	আল্লাহর রসুল (স)'র অভিযানসমূহ	নিহত মুশরিকদের সংখ্যা	নিহত মুসলিম শহীদগণের সংখ্যা
০১	বদর অভিযান	৭০ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	১৪ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০২	আল-সুওয়াইক অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	২ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০৩	কাআব বিন আশরাফ অভিযান	১ জন ইহুদী নিহত হয়েছিল	কোনো মুসলিম শহীদ হননি

[১]) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ,প্রাগুক্তঃ ৩/২২।

[২]) সুনান আবী দাউদ [২৬১৪]।

সংখ্যা	আল্লাহর রসুল (স)'র অভিযানসমূহ	নিহত মুশরিকদের সংখ্যা	নিহত মুসলিম শহীদগণের সংখ্যা
০৪	উহুদ অভিযান	২২ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	৭০ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০৫	হামরাউল আসাদ অভিযান	১ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	কোনো মুসলিম শহীদ হননি
০৬	রাজয়ী'র অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	৭ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০৭	বিইরু মাউনাহ'র অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	৭০ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০৮	আহযাব/খন্দক যুদ্ধ	১০ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	৬ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
০৯	বনু কুরাইযাহ অভিযান[১]	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	১ জন মুসলিম শহীদ হন
১০	আবদুল্লাহ বিন উতাইক'র অভিযান	১ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	কোনো মুসলিম শহীদ হননি
১১	যি কুরাদ অভিযান	১ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	২ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১২	বনু আল-মুসতালাক অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	১ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৩	খাইবার অভিযান	৯৩ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	১৬ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৪	ওয়াদী আল-কুর্‌বা অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	১ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৫	মূতাহ অভিযান	৩৩৫০ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	১৩জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৬	মক্কাহ বিজয় অভিযান	২৪ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	৩ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৭	হুনায়ন অভিযান	৮৪ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল	৪ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
১৮	তায়িফ অভিযান	কোনো মুশরিক নিহত হয়নি	১৩ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন
	সর্বমোট নিহতের সংখ্যা:৩৮৮০	মুশরিক: ৩৬৫৭ জন	মুসলিম:২২৩

উপরিউক্ত তালিকা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ'র রসুল (স) কখনো যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না বিধায় তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা এত নগন্য। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৭ মিলিয়ন মানবসন্তান হত্যা হয়েছিল এবং বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছিল আরো প্রায় ১৪ মিলিয়ন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে তারাই এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

---

[১]) মদীনায় অবস্থানরত ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযাহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষাচুক্তির লঙ্ঘন ও খন্দকের যুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুলত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জিবরীল আমীন (আ)'র নির্দেশে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের ১০/২০ দিন অবরোধ করার পর তারা তাদের পুরানো মিত্র বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী সাআদ বিন মুআয (র) কে সালিস মনোনীত করে এবং তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস/দাসী বানানোর পক্ষে রায় প্রদান করলে তাদের ৬১৮ জন পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। তবে এই হত্যাকান্ডকে কোনোভাবেই যুদ্ধের হত্যাকান্ড বলা যাবে না। তাঁর এই রায় ঘোষণার পর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেছিলেন: তুমি আল্লাহ'র রায় প্রদান করেছ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিনিধি বর্ষ

আবু বকর (র) সিদ্দীক কে আমীরে হজ্ব হিসেবে প্রেরণ

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিদায়ী হজ্ব

উসামাহ বিন যায়দ (র) কে বালকা অভিযানে প্রেরণ

মহানবী (স)'র অসুস্থতা ও মৃত্যু

প্রতিনিধি বর্ষ

পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাবুক যুদ্ধের পরে আর কোনো গাযওয়াহ বা যুদ্ধে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি। তাবুক যুদ্ধের পর বনু ছাকীফ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বিভিন্ন মুশরিক আরব গোত্রসমূহের বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ বা জিযয়াহ (কর) প্রদান নিয়ে নিজেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চার মাস সময় নির্ধারণ করেন এবং তাদের আগমনের উদ্দেশ্যে মদীনায় অস্থায়ীভাবে তাবু নির্মাণ করেন; যাতে করে ঈমান ও মৈত্রী ঘোষণার উদ্দেশ্যে আগত প্রতিনিধিদল তাদের বাহনসহ ভালোভাবে অবস্থান করতে পারে[১]।

মদীনায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট প্রতিনিধিদলের আগমনের তারিখ ও তাদের সংখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাদীস সংকলন ও ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস থেকে যতটুকু জানা যাচ্ছে, তা হলো মদীনায় প্রতিনিধিদলের আগমন নবম হিজরীর প্রথমার্ধে শুরু হয়। আর প্রতিনিধিদলের সংখ্যা প্রায় ষাটের অধিক। কিছু কিছু সূত্র প্রতিনিধিদলের সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি বলে বর্ণনা করেছে। সম্ভবত যেই সূত্রগুলোতে একশ'র পরিবর্তে ষাটের অধিক বর্ণনা করা হয় সেখানে শুধুমাত্র প্রশিদ্ধ প্রতিনিধিগুলো স্থান পেয়েছে[২]। তবে ইমাম ইবন কাসীর মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাতে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মক্কাবিজয়, তাবুকযুদ্ধের সমাপ্তি এবং বনু ছাকীফের ইসলাম ও বায়আত গ্রহণের পর তাঁর নিকট আরবের প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল আগমন করতে থাকে[৩]।

ইমাম বুখারী'র প্রশিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে বনু তামীম, আবদুল কায়স, বনু হানীফাহ, নাজরান, ইয়ামেন, আশআরিয়্যীন ও দাওস গোত্রের প্রতিনিধিসমূহের আগমনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে[৪]। তা ছাড়া প্রশিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহ, সীরাহ, মাগাযী ও ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রসমূহে অন্যান্য প্রতিনিধিগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে; তাতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিনিধিনীতি'র চমৎকার চিত্রায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানোর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় মেহমাখানা বা অতিথি ভবন স্থাপন বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ অবস্থান করতেন, তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স) ও ইসলামকে কাছ থেকে দেখে জোরপূর্বক নয় সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেতেন। তাঁরা আল্লাহ'র রাসুল (স) কে শরয়ী বিধি-বিধান এবং ইসলাম ও দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞ

---

[১]) মুহাম্মদ কালআজী, কিরাআহ সিয়াসিয়্যাহ লিস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারুন নাফায়েস, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ ইং, পৃ:২৮৩।

[২]) সালিহ বিন হুমাইদ ও অন্যান্য, নাদ্বরাতুন নাঈম ফী মাকারিমে আখালাকির রাসুলিল করীম, দারুল ওয়াসীত, ১৪১৮ হিজরী: ১/৩৯৬।

[৩]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৫/৪৬-৪৭।

[৪]) সহীহ বুখারী [৪৩৬৫, ৪৩৬৮, ৪৩৭২ ও ৪৩৯২]।

সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন:{فقهوا إخوانكم}[তোমরা তোমাদের ভাইদের ফিক্‌হ শিক্ষা দাও][১]।

আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের মধ্যে যাদেরকে চিনতেন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। কোনো প্রতিনিধিদল তাদের অঞ্চলে ফিরে যেতে চাইলে তাদেরকে সর্বদা সত্যকে আকড়ে থাকার পরামর্শ দিতেন, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন এবং তাদেরকে ভালো উপহার দিতেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ প্রত্যেকেই নিজ অঞ্চলে ইসলামের দায়ী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে ফিরে যেতেন। তবে কিছু প্রতিনিধিদল নিজেদের ধর্মের ওপর অবস্থান করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদেরকে ইসলামী বিধিমতে জিযয়াহ (কর) প্রদানের মাধ্যমে তার সুযোগ প্রদান করা হয়। যেমন নাজরানের খৃষ্টানরা জিযয়াহ প্রদানের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের অনুসারী হিসেবে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল[২] তাদেরকে সেই সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল, অর্থাৎ কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। নিম্নে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমনকারী কয়েকটি প্রতিনিধিদলের বিবরণ প্রদান করা হলো:

১) আবদ কায়স'র প্রতিনিধি

আবদ কায়স'র প্রতিনিধিদলের আগমন সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (র) বর্ণনা করেন যে, এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে কোন প্রতিনিধি বা কোন গ্রোত্র জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে বললো: রাবীআহ। অতঃপর তিনি বললেন: প্রতিনিধিদলকে স্বাগতম, তোমাদের ইসলাম গ্রহণে কোনো বিলম্ব হয়নি এবং কোনো অবাধ্যতাও নেই। তারা বললো: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আমরা আপনার নিকট অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছি, আপনার এবং আমাদের মাঝখানে কাফির মুদ্বার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা থাকায় আমরা আপনার কাছে নিষিদ্ধ (প্রবিত্র) মাসসমূহ ব্যতীত আসতে সক্ষম নই। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করুন, আমরা যেন আমাদের পেছনে যাদের রেখে এসেছি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে পারি এবং যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের ঈমান আনার পর নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমাদ্বান মাসের সিয়াম পালন করা এবং গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চাংশ প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেন। দুব্বা, খান্তাম,মুযাফ্‌ফত ও নাকীর অথবা মুকায়্যির (উপরিউক্ত পাত্রগুলো তারা মাদক সংগ্রহে ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতো) জাতীয় পাত্রসমূহের ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। অতঃপর তিনি বললেন: এ উপদেশগুলো সংরক্ষণ করো এবং তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে এগুলো সম্পর্কে সংবাদ দাও[৩]।

---

[১]) মুহাম্মদ সাদিক আরজুন, মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ (স), দারুল কলম, বৈরুত,১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ ইং: ৪/৫২০)।

[২]) আলী সাল্লাবী, সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০৩-৮০৪।

[৩]) সহীহ বুখারী [৫৩ ও ৩৫১০]।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল-আশাজ্ব বিন আবদ কায়স প্রতিনিধিদলে পেছনে ছিলেন। অতঃপর উট হাঁকিয়ে গোত্রের আসবাব পত্র সংগ্রহ করেন। তারপর পায়ে হেঁটে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হাত স্পর্শ করে চুমু দেন। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে বললেন: তোমার মধ্যে এমন দুটো গুণ আছে যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) পছন্দ করেন। তিনি বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ'র যিনি আমাকে এমন গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) পছন্দ করেন[১]। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাদের আগমন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সেদিনের যুহরের পরবর্তী সুন্নাত নামায বিলম্ব করেন এবং তা আসরের নামাযের পর আদায় করেন[২]।

২) বনু সাআদ বিন বকর'র প্রতিনিধি দ্বিমাম বিন সা'লাবাহ

বিশিষ্ট সাহাবী আনস বিন মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আমরা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে মসজিদে নাবভীতে বসেছিলাম এমতাবস্থায় এক লোক উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। অতঃপর উট থামালো তারপর তা বাঁধলো, তারপর মসজিদে উপস্থিত সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললো: তোমাদের মধ্যে (এমতাবস্থায় নবী (স) তাদের মঝে হেলান দিয়ে বসেছিলেন) মুহাম্মদ-নবী (স) কে? আমরা বললাম: সাদা পোষাকধারী হেলান দেওয়া লোকটি। অতঃপর সে তাঁকে বললো: আবদুল মুত্তালিবের ছেলে (বংশধর)। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি অতঃপর খুব জোর দিয়ে প্রশ্ন করছি আপনি কিছু মনে করবেন না যেন আমার মনে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্ধ না থাকে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) তাকে বললেন: তোমার মনে যা চায় প্রশ্ন করো।

আমি আপনার ও আপনার রব এর নামে প্রশ্ন করছি আল্লাহ কী আপনাকে সমগ্র মানবজাতির নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

আল্লাহ'র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কী আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা দিবা-রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

আল্লাহ'র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কী আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের ধনীদের থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করে তা আমাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

অতঃপর লোকটি বললো: আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমি দ্বিমাম বিন সা'লাবাহ বনু সাআদ বিন বকর'র ভাই (সদস্য)[৩]।

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (র)'র বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কথোপকথনের পর বললো: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল। আপনার নির্দেশিত ফরযগুলো আদায় করবো এবং আপনার নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকবো। তারপর কোনো কিছু বাড়াবোও না কমাবোও না[৪]।

---

[১]) ইবরাহীম আলী, সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩১।

[২]) ইবরাহীম আলী, সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৫।

[৩]) সহীহ বুখারী [৬৩]।

[৪]) সহীহ বুখারী [৬৩] সহীহ মুসলিম [১২] ও সুনান আবী দাউদ [৪৮৬]।

বর্ণনাকারী বলেন: তারপর সে তার উটের দিকে ফিরে গেল এবং যখন সে চলে গেল তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: দুই বেণীওয়ালা (লোকটির চুল দুটো বেণী করা ছিল) যদি সত্য বলে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩) নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি

আল্লাহ'র রাসুল (স) নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট পত্র পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পত্রের ভাষা অনেকটা এই রকম: আমি তোমাদেরকে বান্দার গোলামী ছেড়ে আল্লাহ'র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করছি এবং আমি বান্দার বন্ধুত্ব ছেড়ে আল্লাহ'র বন্ধুত্বের প্রতি আহ্বান করছি। যদি তোমরা গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদের জিযয়াহ (কর) প্রদান করতে হবে। যদি জিযয়াহ প্রদানে অস্বীকার করো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি[১]।

অতঃপর যখন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পত্র নাজরানের খৃষ্টান যাজকদের (ধর্মীয় ব্যক্তি) নিকট পৌঁছালো, সাধারণ জনগণকে সমবেত করে তাদেরকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র পত্র পাঠ করে তাদের করণীয় জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রদান করে। তারপর তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে[২]। তাদেরকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করে এভাবে মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়:

১) আল-আকিব: তিনি তাদের আমীর ও পরামর্শদাতা এবং প্রতিনিধিদল তাঁর অভিমত প্রকাশ করবে।

২) আস-সাইয়েদ: তিনি প্রতিনিধিদলের নেতা।

৩) এবং আবুল হারিস: তিনি তাদের খৃষ্টান যাজক ও অভিজ্ঞ পন্ডিত।

অতঃপর তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমন করে, পাদ্রীর পোষাক পরিধান করে সিল্কের চাদর শরীরে জড়িয়ে মসজিদে নাবভীতে প্রবেশ করে এবং তাদের হাতে রয়েছে স্বর্ণের আংটি। অতঃপর পূর্বমুখী হয়ে মসজিদে নাবভীতে নামায আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তাদেরকে নিজেদের মতো নামায আদায় করতে ছেড়ে দাও। তারপর তারা আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আসলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদের সাথে কোনো কথা বলেননি। অতঃপর তাদেরকে ওসমান (র) জানান যে, তোমাদের পোষাকের কারণে তিনি তোমাদের সাথে কথা বলেননি। অতঃপর সেই দিন তারা ফিরে যায়। পরের দিন সন্যাসীদের পোষাক পরিধান করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নিকট আগমন করে আল্লাহ'র রাসুল (স) কে সালাম দেয়। তিনি তাদের সালামের যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তারা অপরাগতা প্রকাশ করে বলে যে, আমরা আপনার পূর্বেই মুসলিম হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বলেন: তোমাদের ইসলাম গ্রহণে ৩টি বাঁধা: ক্রুসের ইবাদত, শুকরের মাংস ভক্ষণ ও তোমাদের ধারণা আল্লাহ'র সন্তান আছে[৩]।

---

[১]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৫/৪৮।

[২]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওয়িল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৪৭।

[৩]) প্রাগুক্ত:২/৫৪৭-৫৪৮।

আল্লাহ’র রাসুল (স) ও তাদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক চলে। মহানবী (স) তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে তাদের ভ্রান্ত ধারণার যৌক্তিক উত্তর প্রদান করেন। তারা আল্লাহ’র রাসুল (স) কে বলে যে, আপনি আমাদের নেতার দুর্নাম করছেন এবং বললেন: তিনি আল্লাহ’র বান্দা। অতঃপর মহানবী (স) বলেন: অবশ্যই তিনি আল্লাহ’র বান্দা ও রাসুল এবং তাঁর কালাম যা তিনি কুমারী মরয়মের নিকট প্রেরণ করেছেন। তখন তারা রাগান্বিত হয়ে বলে যে, আপনি কী পিতা ছাড়া কোনো মানুষ দেখেছেন? আপনার দাবী যদি সত্যি হয় আমাদের তার দৃষ্টান্ত প্রদান করুন? অতঃপর মহান রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতিউত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ করেন: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [নিঃসন্দেহে আল্লাহ’র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না][১]।

উক্ত আয়াতদ্বয় তাদের হতভম্ব করে দেয়; কারণ তাদের দাবী ছিলো পিতা ব্যতীত কোনো মানুষের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সেখানে মহান রাব্বুল আলামীন পিতা-মাতাহীন মানুষের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন[২]। অতঃপর তারা যখন যৌক্তিক ও সুন্দর বিতর্কের মধ্যেও নিজেদের দাবীতে অটল থাকে, তখন মহানবী (স) তাদেরকে নিম্নোক্ত কুরআন করীমের আয়াতের আলোকে মুবাহালাহ’র আমন্ত্রণ জানান: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো: এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ’র অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী][৩]।

মহানবী (স) মুবাহালাহ’র জন্য বের হলেন সঙ্গে নেন আলী (র), হাসান (র), হুসাইন (র) ও ফাতিমা (র) কে এবং বলেন: আমি যখন দোয়া করবো তোমরা আমীন বলবে। অতঃপর তারা (খৃষ্টানরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এবং ধ্বংসের ভয় তাদের পেয়ে বসে; কারণ ইতিমধ্যে তারা দৃঢ়ভাবে অবগত হয়ে যায় যে, তিনি সত্যনবী। কোনো জাতি কোনো নবীর সাথে মুবাহালাহ’র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ধ্বংস অনিবার্য জেনে সেইদিকে না গিয়ে তারা মহানবী (স) কে বলে যে, আপনার পছন্দমতো আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ’র রাসুল (স) জিযয়াহ হিসেবে বৎসরে দুই হাজার হুল্লাহ (জোড়া কাপড়) প্রদান করার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করেন। এক হাজার রজব মাসে আদায় করবে এবং আরেক হাজার সফর মাসে আদায় করবে। তারপর তারা

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান: ৫৯-৬০।

[২]) ইবন কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত:৩/৬৩৩। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওয়িল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৪৭।

[৩]) সূরাহ আলে ইমরান: ৬১।

ফিরে যাওয়ার সময় মহানবী (স) কে সন্ধির সম্পদ উসুল করার জন্য একজন কোষাধ্যক্ষ প্রেরণের কথা বললে তিনি বললেন; অবশ্যই তোমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত কর সংগ্রহক পাঠানো হবে[১]। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে আবু উবাইদাহ বিন আল-জার্‌রাহ (র) কে কর সংগ্রহক হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তার সম্পর্কে বলেন: প্রত্যেক জাতির একজন আমীন (জাতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে এই জাতির আমীন আবু উবাইদাহ বিন আল-জার্‌রাহ[২]।

[১]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওয়িল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৪৭।
[২]) সহীহ বুখারী [৩৭৪৪ ও ৪৩৮২] সহীহ মুসলিম [২৪১৯]।

আবু বকর (র) সিদ্দীক কে আমীরে হজ্ব হিসেবে প্রেরণ

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র যুগে সমাজের প্রশিক্ষণ ও আকীদাহ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের অবকাঠামো গঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে হজ্ব আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে হজ্ব ফরয হয়নি এবং তখন মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে পবিত্র হজ্ব আদায়ে কোনো পার্থক্য ছিল না[১]। অতঃপর যখন হজ্বের মওসুম ঘনিয়ে আসলো আল্লাহ'র রাসুল (স) পবিত্র হজ্ব আদায়ের ইচ্ছে পোষণ করে বলেন: যেহেতু মুশরিকরা উলঙ্গাবস্থায় হজ্বে উপস্থিত হবে এবং বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করবে এমতাবস্থায় পবিত্র হজ্ব আদায় করা আমার পছন্দ নয়[২]। অতঃপর ৯ম হিজরীতে তাঁর প্রধান সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক (র) কে আমীরে হজ্ব নিয়োগ করে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিমদের হজ্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (র) সাহাবীদের বড় একটি দল নিয়ে হজ্ব আদায়ে বের হন[৩] এবং তাদের সাথে কুরবানীর পশু (হাদী)ও পাঠিয়ে দেওয়া হয়[৪]।

আবু বকর সিদ্দীক (র) সাহাবীদের নিয়ে হজ্ব আদায়ে বের হওয়ার পর পবিত্র হজ্বের বিধি-বিধানসহ সূরাহ বরাআহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মহানবী (স) বিশিষ্ট সাহাবী আলী (র) কে ডেকে পাঠান এবং তাকে আবু বকর (র)'র সাথে মিলিত হতে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর আলী (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উষ্ট্রী নিয়ে বের হয়ে যুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে আবু বকর সিদ্দীক (র)'র সাথে মিলিত হলে তিনি বলেন: আমীর হিসেবে আগমন করেছেন না অনুগত হিসেবে? আলী (র) বললেন: অনুগত হিসেবে। তারপর তাঁরা দুজন রওনা দেন। অতঃপর জাহেলী যুগে যেই স্থানসমূহে তাঁরা অবস্থান করেছিলেন সেখানে আবু বকর সিদ্দীক (র) মুসলিমদের জন্য হজ্ব পালনের ব্যবস্থা করেন এবং সহীহ বর্ণনামতে যুল-হজ্ব মাসেই হজ্ব পালন করা হয়।

আবু বকর সিদ্দীক (র) তারভিয়াহ'র (৮তারিখ) পূর্বে, আরাফাহ'র দিন, কুরবানীর দিন এবং প্রথম রওয়ানা হওয়ার দিন হাজীগণের মাঝে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর লোকজনকে আরাফাহ'র অবস্থান, কুরবানী, ইফাদ্বাহ, জামারাতের পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির রীতিনীতি শিক্ষা দেন এবং আলী (র) প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পেছনে থাকেন। অতঃপর তিনি সূরাহ বরাআহ'র প্রথামাংশ উপস্থিত হাজীদের পাঠ করে শুনান। তারপর তাদের মাঝে ৪টি বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করেন:

১) মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

২) উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করবে না।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে কারো অঙ্গীকার থাকলে তা যথাসময়ে (চার মাসে) পূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) মুশরিকদের অঙ্গীকার থেকে মুক্ত হবেন।

---

[১]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওয়িল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৩৬।

[২]) সহীহ মুসলিম [২৩০৯]।

[৩]) সালিহ বিন হুমাইদ ও অন্যান্য, নাদ্বরাতুন নাঈম, প্রাগুক্ত:১/৩৯৮।

[৪]) ইবন হাজর আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৮/৮২।

৪) এই বৎসরের পরে কোনো মুশরিক হজ্ব পালন করতে পারবে না[১]।
অতঃপর আমীরে হজ্ব আবু বকর সিদ্দীক (র) বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ (র) কে সাহাবীদের একটি গ্রুপ নিয়ে আলী (র) কাজে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেন[২]।

আবু বকর সিদ্দীক (র)'র হজ্বের সাথে সম্পৃক্ত বিধিসমূহ

৮ম হিজরীতে মক্কাবিজয়ের পর পবিত্র মক্কাহ নগরীর দ্বীনি পরিবেশ যথেষ্ট উন্নত না হওয়ার কারণে হজ্ব পালনে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সশরীরে হজ্বে অংশ গ্রহণ না করে নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে মুলিমদের হজ্ব পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কারণ আল্লাহ'র রাসুল (স) বিধানদাতা হিসেবে উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ ও মুশরিকদের সাথে হজ্ব পালন করলে পরবর্তী প্রজন্ম তা অনুমোদিত বিষয় হিসেবে ধারণা করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি সেই বৎসর হজ্ব পালন থেকে বিরত থেকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে যাবতীয় অনৈসলামিক কার্যক্রম দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আলী (র) মাধ্যমে উপস্থিত হাজীদের মাঝে ৪টি বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করে সমগ্র আরবজাতির নিকট ইসলামে হজ্বের বিধি-বিধান জানিয়ে দিলেন এবং পরবর্তী বৎসর তাঁর হজ্ব পালনের পূর্বে সকল অনৈসলামিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে আবু বকর (র)'র হজ্বকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হজ্বের ভুমিকা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। পাশাপাশি পবিত্র মক্কাহ নগরী থেকে শিরক ও পৌত্তিলিকতা চিরতরে বিদায় দিয়ে পবিত্র নগরীর মর্যাদা ফিরিয়ে আনা হয়।

---

[১]) ইবরাহীম আলী, সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৩১।

[২]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওইল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৩৫।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিদায়ী হজ্ব

পবিত্র হজ্ব ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। ইবন কাইউম এর মতে ৯ম হিজরীর শেষের দিকে হজ্বের বিধান সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [আর এ ঘরের হজ্ব ফরয করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহ'র প্রাপ্য; যে লোকের এ ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রয়েছে][১]। তবে ইবন কাইউম এর মতে মুসলিমদের ওপর ১০ম হিজরীতে হজ্ব ফরয করা হয়[২]। আল্লাহ'র রাসুল (স) ১০ম হিজরীতে তাঁর একমাত্র হজ্ব পালন করেন। এটি হজ্জাতুল বালাগ, হজ্জাতু ইসলাম ও হজ্জাতুল বিদা নামে পরিচিতি লাভ করে। কারণ এই হজ্বে আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে বিদায় নেন এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের স্বীকৃতি লাভ করেন নিম্নোক্ত আয়াত অবতরণের মাধ্যমে: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পুর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম][৩]।

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদতেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবু বকর (র) ও উমর (র) ছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেলিছেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। উমর (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কেন কাঁদতেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন: পরিপূর্ণতার পরে ঘাটতি শুরু হয়। তা ছাড়া আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রচার-প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। মহান রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ ঘোষাণা করলেন তখন বুঝতে হবে তাঁর প্রেরিত রাসুল'র দায়িত্ব পালন সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে। অতঃপর তিনি তাঁর রাসুল কে নিয়ে যাবেন[৪]। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে লক্ষাধিক সাহাবা কিরাম পবিত্র হজ্ব পালন করেছিলেন[৫]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হজ্বের বিবরণ

আল্লাহ'র রাসুল (স) হজ্ব পালনের ইচ্ছা পোষণ করে তাঁর সাহাবীদের জানালে তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১০ম হিজরীর যুল কাদাহ মাস থেকে তাঁর সাথে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বের হবেন বলে সাহাবীগণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এই সংবাদ শুনে মদীনার চারপাশ থেকে সাহাবীগণ এসে তাঁর সাথে যুক্ত হতে থাকেন। যুল কাদাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার যুহর নামায আদায় করে মদীনা থেকে বের হন[৬]। বের হওয়ার পূর্বে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন এবং সাহাবীদের হজ্ব পালনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন;

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান: ৯৭।

[২]) ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ, প্রাগুক্ত: ৩/৫৯৫।

[৩]) সূরাহ আল-মায়িদাহ: ৩।

[৪]) মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওয়িল কুরআন ওয়া আস-সুন্নাহ, প্রাগুক্ত:২/৫৭৫।

[৫]) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৮৬।

[৬]) ইবরাহীম আলী, সহীহ আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৪।

হজ্বের ইহরাম পরিধান থেকে শুরু করে হজ্বের আরকান ও সুনানসহ সকল রীতিনীতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেন। তারপর তালবিয়াহ {لبيك اللّٰهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لـك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك لا شريـك لـك} পড়তে পড়তে যাত্রা করেন[১]। লোকজন বাড়তে থাকলে তাদেরকে সাথে থাকার স্বীকৃতি প্রদান করেন কাউকে অস্বীকার করেননি এবং তালবিয়াহ অব্যাহত রেখে চলতে চলতে আবওয়া পৌঁছান। অতঃপর আসফান, তারপর যী তুওয়া অঞ্চলে পৌঁছান। অতঃপর সেখানে রবিবার রাত্রিযাপন করেন এবং ফজরের নামায আদায় করেন, তারপর গোসল সেরে মক্কাহ'র দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর মক্কাহ'র উপরিভাগ দিয়ে দিনের আলোতে পবিত্র মক্কাহ নগরীতে প্রবেশ করেন। তারপর যাত্রা করে দুপুরের সময় মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন[২] অতঃপর রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করেন[৩] অতঃপর তিন চক্কর রমল করেন এবং চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ করে তাওয়াফ যিয়ারাত সমাপ্ত করেন। তারপর মকামে ইবরাহীমের দিকে গিয়ে উক্ত আয়াত {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [যখন আমি কাবাহ গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তিরালয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখো][৪] তিলাওয়াত করেন এবং মকামে ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ ও নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাকআত নামায আদায় করেন; নামাযে {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [সূরাহ কাফিরুন] ও {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [সূরাহ তাওহীদ] পাঠ করেন। তারপর রুকনের (হাজরে আসওয়াদ) দিকে ফিরে এসে পুনরায় চুম্বন করেন। অতঃপর দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা'র দিকে যান। অতঃপর যখন সাফা'র নিকটে পৌঁছান তখন উক্ত আয়াত {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবাহ ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দিবেন][৫] তিলাওয়াত করেন এবং আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন তিনিও সেভাবে শুরু করেন অর্থাৎ সাফা দিয়ে শুরু করেন। অতঃপর সাফা'র ওপরে চড়ে যখন বায়তুল্লাহ দেখতে পান তখন কিবলাহমুখী হয়ে আল্লাহ'র একত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করে বলেন: {لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعـده، ونصر عبـده، وهـزم الأحـزاب وحـده} তারপর সেখানে দোয়া করেন এবং এভাবে তিনবার বলেন। তারপর মারওয়াহ'র দিকে অবতরণ

---

১) সহীহ বুখারী [১৫৪৯]।

২) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৮৭।

৩) সহীহ মুসলিম [১২২৭]।

৪) সূরাহ আল-বাকারাহ: ১২৫।

৫) সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৫৮।

করে তাঁর পা সমতলে স্থীর হলে সাঈ করে মারওয়াহ উঠেন, সাফা'য় যা যা করেছিলেন মারওয়াহ'য় সেভাবে আদায় করে তাঁর সাঈ মারওয়াহ এসে সমাপ্ত করেন। অতঃপর বলেন: { لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة }[আমি যদি পিছনের বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে আসতাম না এবং কুরবানীর পশু না নিয়ে আসতাম এবং আমি এটা ওমরাহ করে নিতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে হালাল হয়ে যাবে (ইহরাম খুলে ফেলবে) বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়াহ'র সাঈসহ ওমরাহ করে নিবে][১]।

সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুশুম দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! এই বিধান কি শুধু এই বছরের জন্য, নাকি সবসময়ের জন্য? আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দুইবার বললেন: ওমরাহ হজ্বের মধ্যে ঢুকে গেছে, এই বিধান শুধু এই বছরের জন্য নয়, চিরকাল বলবৎ থাকবে[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হজ্ব নিয়ে মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে; যারা মনে করেন যে, তিনি মদীনায় ইহরাম পরিধান করেন তাদের মতে তিনি মুফরাদ হজ্ব (ওমরাহ ব্যতীত শুধুমাত্র হজ্ব) আদায় করেছেন[৩]। অন্যদলের মতে তিনি কিরান হজ্ব (ওমরাহ পালনের পর হালাল না হয়ে একই ইহরামে হজ্ব পালন) আদায় করেছেন[৪]। আরেক দল মনে করেন তিনি ওমরাহ'র ইহরাম নিয়ে পবিত্র মক্কাহ প্রবেশ করে ওমরাহ আদায় করেন তারপর তিনি হালাল হয়ে যান। পরবর্তীতে হজ্বের ইহরাম পরিধান করে হজ্ব পালন করেছেন[৫]।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ দৃশ্যমান হলেও মূলত কোনো বিরোধ নেই; কারণ তিনি মদীনা থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাহ আগমন করে ওমরাহ আদায় করেছেন। পরবর্তীতে হজ্বের সময়ে পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্ব আদায় করেছেন। সুতরাং বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা মনে করেছেন মদীনা থেকে বেঁধে আসা ইহরাম নিয়েই তিনি ওমরাহ অতঃপর হজ্ব উভয়টা পালন করেছেন; তাদের মতে তিনি কিরান হজ্ব পালন করেছেন। অন্যগ্রুপ মনে করেন যে, তিনি ওমরাহ আদায়ের পর হালাল হয়েছিলেন, পরবর্তীতে হজ্বের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধেছিলেন। তাদের মতে তিনি তামাত্তু হজ্ব পালন করেছেন বলেই বর্ণনা করেন।

মহানবী (স) হজ্ব পালনের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে হজ্বের বিধি-বিধান (মানাসিক) শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি বিদায়ী হজ্বের ভাষণে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তিনি বিশেষ বার্তা পৌঁছান; যার মধ্যে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে যা নিম্নরূপ:

---

১) সহীহ মুসলিম [১২১৮]।
২) সহীহ মুসলিম [১২১৮]। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন; ইবরাহীম আলী, সহীহ সীরাহ নাবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫৯।
৩) সহীহ মুসলিম [২১২৬]।
৪) মুসনাদ আহমদ [৫৩৫০]।
৫) সহীহ বুখারী [১৫৬৮]।

১) মহানবী (স)'র হজ্বের সংখ্যা ও হজ্ব ফরযের সময়

আল্লাহ'র রাসুল (স) নুবুয়্যতপ্রাপ্তির পর কতবার হজ্ব করেছেন, এ বিষয়ে মুহাদ্দিসীনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। জামে তিরমিযী'র বর্ণনা মতে মহানবী (স) মদীনায় হিজরতের পূর্বে তিনবার হজ্ব পালন করেছেন[১]। ইবন হাজর আসকালানী বলেন: মূলত তাঁর হজ্ব পালন মিনায় আনসারদের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের ওপর নির্ভর করেছে। প্রথমে আনসারগণ মিনায় আগমন করেন এবং পরবর্তী বৎসর আগমনের অঙ্গীকার করেন। তারপর তাঁরা দ্বিতীয়বার আগমন করেন এবং আকবায় প্রথম বায়আত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁরা তৃতীয়বার আগমন করেন এবং আকবায় দ্বিতীয়বার বায়আত গ্রহণ করেন[২]।

অর্থাৎ আনসারগণ যেহেতু হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাহ আগমন করতেন এবং তাদের আগমনের অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (স)ও হজ্ব পালন করতেন। তবে তিনি মদীনায় হিজরতে পর একবারই হজ্ব পলন করেছেন; যা ইসলামের ইতিহাসে বিদায়ী হজ্ব নামে পরিচিতি লাভ করে[৩]।

তবে হজ্ব ফরয হয় নবম হিজরীতে। কারণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে আবদ কায়স প্রতিনিধিদলের সাথে মহানবী (স)'র সাক্ষাতের পর তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন[৪]। উক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে হজ্ব উল্লেখ না থাকায় সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র হজ্ব এই প্রতিনিধিদলের আগমনের পরবর্তী সময়ে ফরয হয়। সুতরাং মহানবী (স)'র হিজরতের পূর্বে পালিত হজ্বসমূহ ফরয হজ্ব ছিল না তা সহজেই অনুমেয়।

২) মহানবী (স)'র হজ্বের তাৎপর্য

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র হজ্ব পালনের তাৎপর্য অপরাসীম; যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামের সাধারণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। মুসলিমগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কাছ থেকে তাঁদের নামায আদায়, সিয়াম পালন ও যাকাতের বিধি-বিধান শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ ইবাদাত ও সামাজিক রীতিনীতির ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও অবগত হয়েছেন; অবশিষ্ট ছিল শুধুমাত্র হজ্বের বিধি-বিধান। আরবজাতি যেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে হজ্বের মওসুমে বিভিন্ন শিরকী আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে হজ্ব পালন করতো। সুতরাং হজ্বের ফরয অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা জাহেলী যুগে হজ্ব পালন করতাম, তা ইসলামেও পালন করবো? মহানবী (স) বললেন: তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্বের বিধি-বিধান শিখে নাও[৫]।

মূলত মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে মক্কাহ নগরীতে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবাহ নির্মাণের পর সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ'র হজ্ব পালনের আহ্বান করেছিলেন নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আ)। যুগে যুগে মানুষ বিশেষ করে আরবজাতি হজ্ব পালন অব্যাহত

---

[১]) জামে তিরমিযী [৮১৫]।

[২]) ইবন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত:৮/৭৪।

[৩]) সহীহ বুখারী [৪৪০৪] ও সহীহ মুসলিম [১২৫৪]।

[৪]) সহীহ বুখারী [৫৩ ও ৩৫১০] ও সহীহ মুসলিম [১৭]।

[৫]) সহীহ মুসলিম [১২১৮ ও ১২৯৭] সুনান আবী দাউদ [১৯০৫] ও সুনান ইবন মাজাহ [৩০৭৪]। কাছাকাছি শব্দে অভিন্ন অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাখে; যদিও তারা পরবর্তী সময়ে ইবরাহীম (আ)'র হজ্ব পালনের রীতিনীতির মধ্যে অনেক সংযোজন-বিয়োজন করে শিরক ও কুসংস্কারে ভরে দিয়েছিল। মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের পর বায়তুল্লাহ'র হজ্ব পালনের বিধান ইসলামে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন এই মহান ইবাদতকে চিরন্তন করে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখলেন। সুতরাং জাহেলী যুগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিক রীতিনীতি থেকে পবিত্র করে তাওহিদী রীতিনীতির আলোকে হজ্ব পালনের লক্ষ্যে মহানবী (স) তাঁর নুবুয়্যতী দায়িত্ব পালনের শেষ পর্যায়ে এসে বায়তুল্লাহ'র হজ্ব পালনের ঘোষণা প্রদান করেন।

সুতরাং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সংস্পর্শে ও সার্বিক তত্ত্বধানে হজ্ব পালন এবং তাঁর সৌহার্দ্য লাভের উদ্দেশ্যে সাহবীগণ বিভিন্ন প্রান্তর থেকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসলেন। মহানবী (স) মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে লক্ষাধিক (প্রায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার) সাহাবী নিয়ে নিরাপদ ও পবিত্র মক্কাহ নগরীতে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম নির্মিত ঘরের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করেন। যেহেতু লক্ষ লক্ষ হাজী আল্লাহ'র নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের যিয়ারত করবেন এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে ও সুনির্দিষ্ট স্থানে সঠিক নিয়মে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালন অপরিহার্য বিধায় সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার হজ্ব পালনের বিধান প্রদান করা হয়; যাতে করে আল্লাহ'র ঘরের অতিথিগণ সহজেই যথাযথভাবে এই মহৎ ইবাদত পালনে সক্ষম হন।

বিদায় হজ্বের ভাষণ

মহানবী (স) হজ্ব মওসুমে আরফাহ ময়দানে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন; ইতিহাসে সেটি বিদায়ী ভাষণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুধুমাত্র মুসলিম জাতির জন্য নয়, বরং এই ভাষণ মানবসভ্যতার মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত; কারণ তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বিশ্বমানবতার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। মূল ভাষণ:

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা শুনো, আমি জানি না হয়ত আমি তোমাদের সাথে এই বছরের পর এই অবস্থানে কখনো সাক্ষাৎ করবো কি না! হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের ওপর হারাম নিষিদ্ধ (পবিত্র) করা হলো আজকের এই নিষিদ্ধ (পবিত্র) দিন, নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস ও নিষিদ্ধ (পবিত্র) শহরের মতো। সাবধান! জাহেলী যুগের সবকিছু আমার এই দুই পায়ের নীচে পুতে রাখা হয়েছে। জাহেলী যুগের রক্তপাত আমার এই দুই পায়ের নীচে পুতে রাখা হয়েছে এবং আমাদের বংশের সর্বপ্রথম রক্তপাত ইবন রাবীআহ বিন হারিস এর রক্ত আমার এই দুই পায়ের নীচে পুতে রাখলাম (মওকূফ করে দিলাম) এবং জাহেলী যুগের সকল প্রকার সুদ আমার এই দুই পায়ের নীচে পুতে রাখা হয়েছে এবং সর্বপ্রথম আমাদের গোত্রের আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ এই দুই পায়ের নীচে পুতে ফেললাম (মওকূফ করে দিলাম) ।

হে মানব সম্প্রদায়! শয়তান নিরাশ হয়েছে, কারণ তোমাদের এই পবিত্র ভূমিতে কখনো তার ইবাদত করা হবে না, তবে ইবাদত ব্যতীত অন্য বিষয়ে তার আনুগত্য হয়ত করা হবে। অতঃপর তোমাদের ভালো কাজগুলোতে ঘাটতি সাধণ করতে পেরেছে বলে সে এতে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে তার সম্পর্কে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। হে মানব সম্প্রদায়! এই মাস প্রলম্বিত পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মধ্যে

বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা এগুলোকে হালাল করে নেয় এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা নিজেদের স্বার্থে আল্লাহ'র নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাসগুলোর গণনা পূর্ণ করে নেয়। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ'র পক্ষ থেকে হারামকৃত মাসগুলোকে। নিশ্চয় সময় আল্লাহ'র পৃথিবী ও সৌরজগত সৃষ্টির দিন থেকে তার নিজস্ব গতিতে চলছে। বারো মাসে এক বৎসর, এর মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস; যুল-কা'দাহ, যুল-হজ্ব, মুহাররম ও রজব।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে তাকওয়া করো। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ'র নামে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ'র বাণীর মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছ। নিশ্চয় তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে: তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের অবর্তমানে ঘরে প্রবেশাধিকার প্রদান না করে। যদি তারা তা করে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো যথাযথভাবে তাদের খোর-পোষের ব্যবস্থা করা।

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথাগুলো সংরক্ষণ করো নিশ্চয়ই আমি পৌঁছে দিয়েছি, আমি তোমাদের নিকট দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা আকড়িয়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহ'র কিতাব ও তাঁর রাসুল (স)'র সুন্নাহ[১]।

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কথা শুনো এবং আনুগাত্য করো যদি কোনো নাকবোচা নিগ্রো দাসকেও তোমাদের ওপর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে আল্লাহ'র কিতাব (আল্লাহ'র কিতাব মতে শাসন পরিচালনা করে) প্রতিষ্ঠা করে।

তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক হও.... তোমরা যা পানাহার করো তা তাদেরকে পানাহার করাও এবং তোমরা যা পরিধান করো তা তাদেরকে পরিধান করাও। তারা যদি তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ'র বান্দাদের বিক্রি করে দাও (যদি ক্ষমা করতে না পারো) তাদেরকে শাস্তি দিও না।

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথাগুলো সংরক্ষণ করো, তোমরা জেনে রাখো প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, নিশ্চয় মুসলিমগণ পরস্পর ভাই, সুতরাং তার ভাইয়ের কোনো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। অতঃপর তোমরা নিজেদের প্রতি জুলম করো না। হে আল্লাহ! আমি কী পৌঁছাইনি? খুব শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রব এর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হবে না। তবে একে অপরের গলা কাটবে। সাবধান! উপস্থিত লোকজন অনুপস্থিতদের বার্তা পৌঁছে দাও। সাবধান! আমি কী (আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও বার্তা) পৌঁছাইনি? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন: অবশ্যই পৌঁছিয়েছেন। নবী (স) বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো[২]।

তারপর মহানবী (স) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করেন। সূর্যাস্তের পরই তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের নিয়ে মুযদালিফাহ'র দিকে রওনা হন। অতঃপর

---

১) মুআত্তা ইমাম মালিক [৮৯৯]।

২) সহীহ বুখারী [৪৪০৬] ও সহীহ মুসলিম [১৬৭৯]।

মুযদালিফায় মাগরিব ও ঈশার সামায এক সাথে বিলম্বে আদায় করেন এবং মুযদালিফায় সেই রাত্রিযাপন করেন। তারপর সূর্যদয়ের পূর্বে মিনা'র উদ্দেশ্যে মুযদালিফাহ ত্যাগ করেন। অতঃপর জামরাহ আকবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতি পাথর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলেন। তারপর তিনি পশু জবাইয়ের স্থানের দিকে যান। অতঃপর ৬৩টি পশু নিজে জবেহ করে অবশিষ্ট পশুগুলো (৩৭টি) জবেহ করতে আলী (র) কে নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহ'র দিকে রওনা হন। অতঃপর মক্কাহ নগরীতে যুহর আদায় করেন। তারপর বনু আবদুল মুত্তালিবের (আবদুল মুত্তালিবের সন্তানাদির) নিকট আসেন তখন তাঁরা হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন: হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের তোমরা বালতি দিয়ে পানি তুলে বিতরণ করো। যদি তোমাদের পানি পান করানোর কাজে অন্যরা যুক্ত হয়ে তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে এই ভয় না থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের দলে যুক্ত হতাম। অতঃপর তারা তাঁকে পানির পাত্র দিলে তিনি পানি পান করেন[১]। তারপর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

৩) মহানবী (স)'র বিদায়ী হজ্বের ভাষণের তাৎপর্য

মহানবী (স) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায়ী ভাষণে মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেন; তাঁর ভাষণকে বিষয়ভিত্তিক ছয়টি ধারায় বিভক্ত করা যায়:

প্রথম ধারা: মানবজাতির মৌলিক অধিকার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন: হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ অপরের জন্য তোমাদের রব এর সাথে সাক্ষাৎ (কিয়ামত পর্যন্ত) পর্যন্ত হারাম (নিষিদ্ধ) করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিনের মতো এবং এই মাসের মতো নিষিদ্ধ। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। কেউ কারো জীবনের ওপর এবং সম্পদের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাঁর ভাষণে একাধিকবার উচ্চারণ করে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অতঃপর বলেন: প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সুতরাং এক ভাই অপর ভাইয়ের জীবন ও সম্পদের ওপর যেমন অবৈধ হস্তক্ষেপ করে না অনুরূপভাবে ভাই হওয়ার সুবাদে এক মুসলিম অপর মুসলিমের জীবন ও সম্পদের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধারা: তাঁর ভাষণের এই অংশে তিনি মানবজাতিকে ধ্বংসকারী প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করার পাশাপাশি সতর্ক করে বলেন: সাবধান! জাহেলী যুগের সকল হত্যাকান্ড আমার এই দুপায়ের নীচে পুতে রেখে দিলাম। অর্থাৎ আজ থেকে জাহেলী যুগের কোনো হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। কারণ প্রতিশোধ পরায়ণতা শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে না, নিজেকেও ধ্বংস করে দেয়। এই পর্যায়ে তিনি নিজ পরিবারের হত্যাকান্ডকে সামনে নিয়ে আসেন এবং বলেন: হুযাইল গোত্রের লোকজন রাবীআহ বিন হারিস'র (হারিস আবদুল মুত্তালিবের বড় পুত্র মহানবী (স)'র আপন চাচা) দুগ্ধপায়ী শিশুপুত্র বনু সাআদ গোত্রে অবস্থানকালে হত্যা করেছিল তার

[১]) সহীহ ইবন খুযাইমাহ [২৯৪৪] ও মুসনাদ আহমদ [৩৫২৭]।

প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের অধিকার প্রত্যহার করে নেন। তবে পরবর্তীতে সংঘটিতব্য সকল খুনের শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার কার্যকর হবে।

অনুরূপভাবে মানবসমাজকে ধ্বংসকারী সুদপ্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন: জাহেলী যুগের সকল প্রকার সুদী লেন-দেন আমার এই দুপায়ের নীচে পুতে রেখে দিলাম। অর্থাৎ আজ থেকে জাহেলী যুগের সকল প্রকার সুদী লেন-দেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম। তবে কেউ তার মূলধন থেকে বঞ্চিত হবে না। এই পর্যায়ে তিনি নিজ পরিবারের সুদী লেন-দেনকে সামনে নিয়ে আসেন এবং বলেন: প্রথমে নবী (স) এর চাচা আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব (র)'র সুদী লেন-দেন'র সকল প্রকার বর্ধিত অর্থ নিষিদ্ধ করা হলো। সুদপ্রথা নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানবসমাজের প্রধান চালিকা শক্তি অর্থনীতিকে তিনি সুদমুক্ত ঘোষণা করলেন।

তৃতীয় ধারা: তাঁর ভাষণের এই অংশে তিনি যুগের পরিবর্তনের ধারাকে যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিলেন। জাহেলী যুগে আরবজাতি প্রতি দুবছর সুনির্দিষ্ট মাসে হজ্ব পালন করতো; যেমন যুল-হজ্ব মাসে দুবছর হজ্ব পালন করতো, পরবর্তী দুবছর মুহার্‌রম মাসে হজ্ব পালন করতো। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) দশম হিজরীতে যুল-হজ্ব মাসে হজ্ব পালন করে ঘোষণা প্রদান করেন যে, মহান রাব্বুল আলামীনের পৃথিবী ও সৌরজগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে যুগ (সময়) তার নিজস্ব গতিতে চলে আসছে। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছে মতো মাসসমূহকে এগিয়ে-পিছিয়ে নেওয়া যাবে না। সুতরাং আজকের দিন থেকে যুল-হজ্ব মাস ব্যতীত অন্য মাসে হজ্ব পালন করা যাবে না।

অন্য বর্ণনা মতে জাহেলী যুগে মুশরিকরা বারো মাস পনের দিনে এক বছর গণনা করতো বিধায় হজ্ব কখনো রমাদ্বান মাসে, কখনো শাওয়াল মাসে, কখনো যুল-কাদাহ মাসে...এভাবে বছরের প্রতি মাসে হজ্ব পালন করা হতো। এটা মূলত বর্ধিত পনের দিনের কারণে বিভিন্ন মাসে হজ্ব ঘুরে-ফিরে আসতো। অনেক ইসলামী গবেষক মনে করেন যে, একই কারণে আবু বকর (র)'র হজ্ব যুল-কাদাহ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী বছর আল্লাহ'র রাসুল (স) যুল-হজ্ব মাসের দশ তারিখ হজ্ব পালন করেন (তাঁর হজ্ব যুল-হজ্ব মাসের দশ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়ে মাসসমূহের সমন্বয় ঘটে)। তখন তিনি যুগের বিবর্তনের পুরোনো হিসেব বাতিল ঘোষণা করে বারো মাসেই বছর গণনা নির্ধারণ করেন।

চতুর্থ ধারা: তাঁর ভাষণের এই অংশে তিনি নারীর অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন: জাহেলী যুগে নারীর কোনো অধিকারই স্বীকার করা হতো না। ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে।

পঞ্চম ধারা: তাঁর ভাষণের এই অংশে তিনি মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকেই করতে হবে বলে ঘোষণা প্রদান করে বলেন: মানবজাতি যতক্ষণ কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে থাকবে কখনো তারা পথভ্রষ্ট হবে না।

ষষ্ঠ ধারা: তাঁর ভাষণের এই অংশে তিনি শাসকগোষ্ঠি ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন: সাধারণ জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শাসকের কথা শুনা ও আনুগত্য করা; তাঁর বংশমর্যাদা ও সামজিক অবস্থা যাই হোক না কেন। যতক্ষণ তিনি কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কোনো অবস্থাতেই তাঁর অবাধ্য হওয়া যাবে না। তবে শাসক যদি কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

অপরিহার্য নয়। এই অংশে তিনি নিজেদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন: তারা যদি কোনো অপরাধ করে বসে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। অন্যথায় বিক্রি করে দাও। তবু তাদেরকে নির্যাতন করো না। কারণ কোনো মানবসন্তান দাস-দাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। জালিম শাসকগোষ্ঠি, নিপীড়নকারী সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণকারী মানবসন্তানকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছে।

উসামাহ বিন যায়দ (র) কে বালকা অভিযানে প্রেরণ

পবিত্র হজ্ব পালন শেষে মদীনায় ফিরে আসার পর থেকে মহানবী (স)'র শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স) এই যুদ্ধে নেতৃত্বদানের জন্য যুবক সাহাবী উসামাহ বিন যায়দ (র) কে আমীর (সেনাপতি) হিসেবে নির্বাচন করেন। অতঃপর তাকে তার পিতা যায়দ বিন হারিসাহ'র হত্যাস্থলের দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশের পরও মুনাফিকরা গুজব চড়াচ্ছিলো যে, অল্পবয়সী একজন যুবককে বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের ওপর আমীর (সেনাপতি) নির্বাচন করা হয়েছে! এই গুজব শুনার পর মহানবী (স) ব্যথার কারণে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বেরিয়ে এসে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করে বলেন: তোমরা যদি উসামাহ বিন যায়দের নেতৃত্বের সমালোচনা করে থাকো ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ'র শপথ! সেই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সে (যায়দ বিন হারিসাহ) যোগ্য ছিল এবং আমার নিকট অতি প্রিয় ছিল[১]।

আর এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উসামাহ বিন যায়দ যোগ্য ব্যক্তি ও আমার নিকট অতি প্রিয়। সুতরাং আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করছি, কারণ সে তোমাদের মধ্যকার ভালোদের অন্যতম[২]। অতঃপর সাহাবীগণ আল্লাহ'র রাসুল (স)'র নির্দেশ মতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, উসামাহ'র সাথে মুহাজিরীন এবং আনসারগণ ছিলেন এবং উসামাহ (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর নির্দেশমতে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হয়ে মহানবী (স)'র শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির পর উসামাহ বিন যায়দ (র) তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে খলীফা আবু বকর (র) বয়স্ক সাহাবীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন এবং মুসলিম বাহিনী তাঁর নেতৃত্বে এই অভিযানে বিজয় অর্জন করেন।

উসামাহ বিন যায়দ (র)'র অভিযানের উপদেশ ও শিক্ষা

উসামাহ বিন যায়দ (র)'র অভিযান থেকে আমাদের জন্য বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে:

ক) সর্বাবস্থায় আমীরের প্রতি আনুগাত্য প্রকাশের বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়। কেউ আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর বয়সের সমালোচনা না করে বিশৃঙ্খলা নিরসনে কোনো শরয়ী কারণ না থাকলে আনুগত্য করা অপরিহার্য।

খ) রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে যোগ্যতার ভিত্তিতে অল্পবয়স্ক কাউকে বয়স্কদের ওপর আমীর নির্বাচিত করতে পারবেন। তবে অযোগ্য কাউকে আত্মীয় বা অন্য কোনো বৈষয়িক কারণে আমীর নির্বাচন করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত নয়।

---

[১]) সহীহ বখারী [৩৭৩০ ও ৪৪৬৮] এবং সহীহ মুসলিম [২৪২৬]।

[২]) সহীহ মুসলিম [৪৩৬১]।

মহানবী (স)'র অসুস্থতা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসুস্থতার শুরুর দিকের অবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী ও মহানবী (স)'র মুক্তদাস আবু মুওয়াইবাহা'র বরাতে বিভিন্ন সীরাহ ও হাদীস গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) এক রাত্রে আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি আমাকে বলেন: হে আবু মুওয়াইবাহা! আমাকে এই বাকীবাসী (বাকিউল গারকদ কবরস্থান)'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তুমি আমার সাথে চলো। অতঃপর আমি তাঁর সাথে চললাম। আমরা সেখানে থামলে তিনি কবরবাসীকে সালাম দিলেন এবং আমার দিকে ফিরে বললেন: ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) অন্ধকার রজনীর ন্যায় একের পর এক আসতে থাকবে, প্রথমটি অপেক্ষা পরবর্তীটা আরো মন্দ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন: আমাকে পৃথিবীর গুপ্তধনের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কী এটি গ্রহণ করবো নাকী আল্লাহ'র সাক্ষাৎ ও জান্নাত গ্রহণ করবো? অতঃপর আমি বললাম: আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর বিসর্জিত হোক, আপনি আগে পৃথিবীর গুপ্তধনের চাবিসমূহ ও তাতে দীর্ঘস্থায়ী থাকার সুযোগ গ্রহণ করুন, তারপর জান্নাত। অতঃপর তিনি বললেন: না, হে আবু মুওয়াইবাহা! আমি আল্লাহ'র সাক্ষাৎ ও জান্নাত গ্রহণ করছি। অতঃপর তিনি বাকীবাসী'র (বাকিউল গারকদ কবরস্থান) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে যান। তারপর ঘরে ফেরার পর তাঁর ব্যাথা শুরু হয় এবং সেই ব্যাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন[১]। পেটের ব্যাথা পূর্বেও ছিল, খায়বরের অভিযানে ইহুদী মহিলার বিষ মিশ্রিত খাবার গ্রহণের কারণে যেই ব্যাথাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই ব্যাথা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় ও ফিকহী বিধান আবির্ভূত হয়:

১) কবর যিয়ারতের বৈধতা ও মুসলিমদের কবরস্থানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কবর যিয়ারত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। রাত্রে কবর যিয়ারত করা সুন্নাতের বিষয়টি সহজেই প্রতিয়মান হয়।

২) পাশাপাশি নবী (স) এর অবর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা'র সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা প্রদান করেন এবং ধৈর্য্যের সাথে তার মোকাবেলা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

৩) আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মহান রাব্বুল আলামীন পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে জীবন-যাপনের প্রস্তাব প্রদান সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ'র সাক্ষাৎ ও জান্নাতকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর উম্মাহকে পার্থিব সম্পদের লোভ না করার উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে জীবন-যাপনের প্রচেষ্টা না করার ইশারা প্রদান করেন।

স্ত্রীদের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

মা আয়েশা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বাকী'র (কবরস্থান) যিয়ারাত থেকে ফিরে আসলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাই তখন তাঁর প্রচন্ড মাথাব্যাথা শুরু হয়। অতঃপর শরীরে প্রচন্ড জ্বর আসে। একাদশ হিজরী'র সফর মাসের শেষের দিকের ঘটনা এই যে, মা আয়েশা (র) কুরআনের শেষ দুই সূরাহ (সূরাহ আল-ফালাক ও সূরাহ আন-নাস) পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ

[১]) মুসনাদ আহমদ [১৫৭৫৩]।

দিতেন[১]। এরপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মায়মুনাহ (র)'র ঘরে অবস্থান করেছিলেন, এমতাবস্থায় উম্মুহাতুল মুমিনীনগণ (র) বুঝতে পারলেন যে, তিনি অসুস্থাবস্থায় আয়েশা (র)'র ঘরে থাকতে চাচ্ছেন। তখন তাঁরা সবাই মিলে তাঁর ইচ্ছেমতো থাকতে অনুমতি দিলে তিনি মায়মুনাহ (র)'র ঘরে থেকে আব্বাস (র) ও আলী (র)'র কাঁধে ভর দিয়ে আয়েশা (র)'র ঘরে চলে যান। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও তাদের অধিকারের প্রতি সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

মৃত্যুমুখী মানুষের ইচ্ছাপূরণে সতর্ক থাকা

ইবনু আব্বাস (র) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স)'র অসুস্থতা যখন বেড়ে যায় তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত লোকদের বলেন: তোমরা কাগজ-কলম নিয়ে আসো আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে যাই, যেন তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হও। উপস্থিত কেউ (উমর) বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ওপর ব্যাথার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের কাছে কুরআন রয়েছে, কিতাবুল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আহলে বাইত এই বিষয়ে মতবিরোধ করলেন এবং উচ্চ-বাচ্চ বৃদ্ধি পেলো (বিতর্কে জড়িয়ে যান)। তাদের একজন (আলী) বলেন: কাগজ-কলম কাছে নিয়ে যাও তিনি কিছু লিখে দিবেন, যেন তোমরা তাঁর পরে পথভ্রষ্ট না হও। অতঃপর যখন বিতর্ক ও অনর্থক কথা-বার্তা বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেন: তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও[২]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আহলে বাইতের লোকেরা নিজেরাই বিতর্কে অবতীর্ণ হন। সুতরাং এ ব্যাপারে শুধুমাত্র উমর (র) কে দোষারোপ ও অপবাদ দেয়ার কোনো কারণ নেই। তদুপরি নবী (স) স্বয়ং সবাইকে চলে যেতে বলেছেন উমর (র) নন। অধিকান্ত এ ঘটনাটি ঘটেছিল বৃহস্পতিবারে আর নবী (স) এর মৃত্যু হয়েছিলা পরবর্তী সোমবারে। বিষয়টি যদি অহী ভিত্তিক কোনো জরুরী বিধান হতো এই কদিনে তিনি তা অবশ্যই লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাহাবীগণ সারাজীবন নিজেদের জীবনের ওপর তাঁর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন; বিশেষ করে উমর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইচ্ছাপূরণের জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনায় তিনি অতি সতর্কতার সাথে তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে প্রচন্ড দৃঢ়তা থাকার পাশাপাশি সত্যের পক্ষে অটল থাকার বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

অধীনস্থদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ'র রাসুল (স) অসুস্থতার কারণে নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না, তখন তিনি বললেন: তোমরা আবু বকর (র) কে নির্দেশ দাও (আমার পক্ষ থেকে) তিনি যেন মুসাল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করে নেয়। অতঃপর আয়েশা (র) বললেন: হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আবু বকর (র) কোমল হৃদয়ের লোক, নিশ্চয় তিনি আপনার স্থানে দাড়িয়ে (তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না) মুসাল্লীদের নিয়ে বড়

---

১) সহীহ বুখারী [৪৪৩৯ ও ৫৭৩৫]।
২) সহীহ বুখারী [১১৪ ও ৪৪৩২]

কণ্ঠে নামায আদায় করতে পারবেন না। অতঃপর তিনি বলেনঃ নিশ্চয় তোমরা ইউসুফের সাথীবৃন্দের মতো (চালাকীর আশ্রয় নিতে চাচ্ছ), তোমরা আবু বকর (র) কে নির্দেশ দাও (আমার পক্ষ থেকে) সে যেন মুসাল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করে নেয়[১]।

উপরিউক্ত হাদীসে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র তাঁর জীবদ্দশায় যোগত্যার ভিত্তিতে আবু বকর (র) কে মুসাল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করার দায়িত্ব প্রদান করে নিজের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত করার প্রতি সুদৃঢ় ইঙ্গিত প্রদান করেন।

বসা ইমামের পেছনে দাড়িয়ে মুক্তাদীর নামায

অবশেষে আবু বকর (র) মুসাল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ'র রাসুল (স) একটু সুস্থতা অনুভব করলে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে এসে আবু বকর (র) কে মুসাল্লীদের নিয়ে নামাযরত অবস্থায় পেয়ে যান। অতঃপর আবু বকর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপস্থিতি বুঝতে পেরে পেছনে যেতে চাইলে তিনি তাকে নিজ অবস্থায় থাকতে ইশারা করে আবু বকর (র)'র পাশে বসে যান। অতঃপর আবু বকর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সাথে নামায আদায় করেন এবং তিনি বসাবস্থায় ছিলেন, আর মুসাল্লীগণ আবু বকর (র)'র ইমামতিতে নামায আদায় করেন[২]। সাহাবীগণ মসজিদে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র উপস্থিতি দেখে আনন্দিত হলেও সেই অবস্থা বেশিক্ষণ ছিল না। এটি ছিল মসজিদে নাবভীতে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র সর্বশেষ নামায আদায়।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বসা ইমামের (সমস্যা হলে) পেছনে দাড়ানো মুক্তদীর নামায আদায় বৈধ। আল্লাহ'র রাসুল (স) নামাযে শরীক হওয়ার পর আবু বকর (র) আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ইক্তিাদা করেন, অন্যদিকে সাহাবীগণ আবু বকর (র)'র ইক্তিদায় ছিলেন।

রোগ বা কষ্টের কারণে গুনাহ মাফ হয়

ধীরে ধীরে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (র) থেকে বর্ণীত; তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শেষ অবস্থায় তাঁর ঘরে প্রবেশ করি তখন তাঁর প্রচন্ড খিচুনী হচ্ছে। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করি। অতঃপর বলিঃ হে আল্লাহ'র রাসুল (স)! আপনার প্রচন্ড খিচুনী হচ্ছে। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমাদের যেমন খিচুনী হয় আমারও তোমাদের মতো খিচুনী হচ্ছে। আমি বললামঃ আপনার দুগুণ সাওয়াব হবে। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) বললেনঃ অবশ্যই, কোনো মুসলিমের রোগের কারণে বা অন্য কোনো কারণে কষ্ট পৌঁছালে আল্লাহ তার দুষ্কর্মসমূহ হ্রাস করে দেন যেমন বৃক্ষ তার পাতা হ্রাস করে দেয়[৩]। উপরিউক্ত হাদীস থেকে রোগ বা কষ্টের কারণে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

কবরে সিজদাহ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা

এমতাবস্থায় আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মুখমন্ডল একটি সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। অতঃপর যখন ব্যাথা অনুভব করেছেন এবং ব্যাথা তাঁকে কাবু করে ফেলেছে তখন তিনি

[১]) সহীহ বুখারী [৬৬৪]।
[২]) সহীহ বুখারী [৭১৩] ও সহীহ মুসলিম [৪১৮]।
[৩]) সহীহ বুখারী [৫৬৬৭] ও সহীহ মুসুলম [২৫৭১] এবং সহীহ ইবন হিব্বান [২৯৩৭]।

তাঁর মুখমন্ডল থেকে চাদরটি সরিয়ে বললেন: ইহুদী ও খৃষ্টানেদের ওপর আল্লাহ'র অভিশাপ যে, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে[১]।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে কবরে সিজদাহ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর উম্মাহকে ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো তাঁর কবরকে মসজিদ বানিয়ে সিজদাহ করার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যুযন্ত্রণা

মহান রাব্বুল আলামীনের চিরচারিত রীতি পৃথিবীতে যার আগমন ঘটেছে তাকে একদিন যেতেই হবে। এই রীতিনুসারে পবিত্র কুরআন করীমে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}[আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন প্রদান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে][২]। অর্থাৎ পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং আল্লাহ'র রাসুল (স)'র ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বিধায় কুরআন করীমের অন্য আয়াতে বর্ণীত হয়েছে: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে][৩]।

একাদশ হিজরীর ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার সকালে যখন মসজিদে নাবভীতে সাহাবীগণ আবু বকর (র)'র পেছনে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন; তখন মা আয়েশা (র)'র ঘরের পর্দা সামান্য সরানো হলে পর্দার পেছনে আল্লাহ'র রাসুল (স) দৃশ্যমান হয়ে নামাযরত সাহাবীগণকে দেখে মুচকী হাসলেন। তখন আবু বকর (র) মহানবী (স) নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হবেন মনে করে তাঁর পেছনের সারির দিকে যাওয়ার পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন। সাহাবীগণেরও মহানবী (স) এর সুস্থতা দেখে আনন্দে নামায ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) হাত দিয়ে নামায পরিপূর্ণ করার জন্য ইশারা করে ঘরে প্রবেশ করে পর্দা ঝুলিয়ে দেন[৪]।

সাহাবীগণ নামায সমাপ্ত করে চলে যান এবং তাঁরা মনে করলেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর রোগ সেরে উঠেছেন। পরে পরিষ্কার হলো যে, এটি তাঁর সাহাবীগণের প্রতি শেষ দৃষ্টি ছিল। অতঃপর আল্লাহ'র রাসুল (স) মা আয়েশা (র)'র ঘরে এসে শুয়ে যান। মা আয়েশা (র) তাঁর মাথা নিজের বুকে রাখেন এবং মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁকে বারবার আঘাত করে যাচ্ছে। মা আয়েশা (র) বলেন: তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা হয়েছিলো এবং তিনি পানিতে হাত ঢুকিয়ে তাঁর চেহারা মুছে নিচ্ছিলেন এবং বললেন: {لا إله إلا الله، إن للموت سكرات}[আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে][৫]। নবীতনয়া ফাতিমা

---

১) সহীহ বুখারী [১৩৩০] ও সহীহ মুসুলম [৫৩০]।

২) সূরাহ আম্বিয়া: ৩৪-৩৫।

৩) সূরাহ আয-যুমর: ৩০।

৪) সহীহ বুখারী [৬৮০ ও ৬৮১] ও সহীহ মুসলিম [৪১৯]।

৫) সহীহ বুখারী [৬৫১০]।

(র) তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে বলে উঠলেন: হায় আমার বাবা'র যন্ত্রণা! অতঃপর তিনি বললেন: তোমার বাবা'র যন্ত্রণা আজকের পর থাকবে না[১]।

মা আয়েশা (র) বলেন: নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মৃত্যুর সময় আমার থুথু ও তাঁর থুথু এক করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার বুকের সাথে টেক লাগিয়ে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান বিন আবী বকর (র) হাতে মিসওয়াক নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে মিসওয়াকের দিকে তাকাতে দেখলাম, আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক পছন্দ করেন। অতঃপর আমি বললাম: আপনার জন্য সেটা নিব? তিনি মাথা নেড়ে ইতিবাচক সাড়া দেন। অতঃপর আমি সেটা নিয়ে দেখলাম এটা তাঁর জন্য শক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম: আপনার জন্য নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে ইতিবাচক সাড়া দেন। অতঃপর আমি চাবিয়ে নরম করে দিলাম। তিনি সামনে রাখা পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তাঁর চেহারা মুছে নিচ্ছেন এবং বললেন: {لا إله إلا الله، إن للمـوت سـكرات}[আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে][২]। তারপর তাঁর হাত তুলে {في الرفيـق الأعلى}[সর্বোচ্চ বন্ধুর নিকটে ফিরে যাচ্ছি] বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর হাত ঢলে পড়লো[৩]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র মৃত্যুর সংবাদ লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, আবু বকর (র) তাঁর বাড়ী থেকে একটি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এসে (তিনি ইতিপূর্বে মহানবী (স)'র ব্যাথা একটু কমলে বাড়ী গিয়েছিলেন) ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন, কারো সাথে কোনো কথা না বলে আয়েশা (র)'র ঘরে প্রবেশ করলেন। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। অতঃপর তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরানো হলো এবং আবু বকর (র) ঝুকে তাঁর কপালে চুমো দিলেন এবং কাঁদলেন। তারপর বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর বিসর্জিত হোক! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে দুবার মৃত্যু দিবেন না। যেই মৃত্যু আপনার জন্য লেখা ছিল তা আপনি বরণ করেছেন[৪]।

তারপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং উমর (র) লোকজনকে বলতে লাগলেন: আল্লাহ'র রাসুল (স) মৃত্যুবরণ করেননি। তবে তিনি তাঁর রব এর নিকট চলে গেছেন যেমন মুসা বিন ইমরান (আ) চলে গেছেন। মুনাফিকদেরকে শেষ না করা পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। অতঃপর আবু বকর (র) এগিয়ে এসে উমর (র) কে চুপ থাকতে বললেন। কিন্তু উমর (র) তাঁর কথা অব্যাহত রাখলেন। আবু বকর (র) যখন দেখলেন উমর (র) চুপ হচ্ছেন না; তখন তিনি সমবেত লোকজনের দিকে এগিয়ে আসলে লোকজন উমর (র) কে ছেড়ে আবু বকর (র)'র দিকে এগিয়ে আসলো। অতঃপর আবু বকর (র) বললেন: হে লোকজন! তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মদ (স)'র ইবাদত করো নিশ্চয় মুহাম্মদ (স) মৃত্যুবরণ করেছেন, আর যে আল্লাহ'র ইবাদত করো তোমরা জেনে রাখো

---

১) সহীহ বুখারী [৪৪৬২] ।

২) সহীহ বুখারী [৬৫১০]।

৩) সহীহ বুখারী [৪৪৪৯ ও ৬৫১০]।

৪) সহীহ বুখারী [৪১৮৭] দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ।

নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন: { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ }[আর মুহাম্মদ একজন রাসুল বৈ তো নয়। তার পুর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?][১]। আবু বকর (র)'র বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছিল যেন লোকজন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে জানতই না। অতঃপর উক্ত আয়াত লোকজন তাঁর কাছ থেকে পুনরায় গ্রহণ করলেন এবং যেই শুনেছেন তিলাওয়াত শুরু করে দেন। এই অবস্থা দেখে উমর বললেন: আল্লাহ'র শপথ! মনে হচ্ছে আবু বকর (র)'র তিলাওয়াতের পূর্বে এই আয়াতের মর্ম আমি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি; যখন তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম তখন বুঝলাম নিশ্চয় আল্লাহ'র রাসুল (স) মৃত্যুবরণ করেছেন[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জন্ম তারিখ ও মাস নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সকল বর্ণনাকারী ও মুহাদ্দিসীন ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার মধ্যে নুবুওয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে ৪০ বছর ও নুবুওয়্যত প্রাপ্তির পর মক্কায় ১৩ বছর এবং হিজরতের পর মদীনায় ১০ বছর অতিবাহিত করেন। একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল তাঁর মৃত্যু হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিশিষ্ট সাহাবী আমর বিন হারিস (র) থেকে বর্ণীত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) তাঁর সাদা খচ্চরী (যাতে তিনি আরোহণ করতেন), যুদ্ধাস্ত্র এবং ভূমি (যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ করেছেন) ব্যতীত কোনো দিনার, দিরহাম বা দাস-দাসী রেখে যাননি[৩]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র গোসল

মা আয়েশা (র) বর্ণনা করেন যে, সাহাবীগণ যখন আল্লাহ'র রাসুল (স) কে গোসল দেওয়ার ইচ্ছে করলেন তখন তাঁরা বললো: আমরা জানি না তাঁকে কীভাবে গোসল দিব? তাঁর শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে নিব যেমন আমরা আমাদের সাধারণ মৃতব্যক্তিদের করে থাকি, নাকী শরীরে কাপড় রেখেই গোসল দিব? অতঃপর তাঁরা মতবিরোধ করতে লাগলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের ওপর তন্দ্রা ঢেলে দেন এবং তন্দ্রার কারণে তাঁদের প্রত্যেকের থুতনি বা চিবুক বুকের সাথে লেগে যায়। অতঃপর ঘরের কোণা থেকে কেউ একজন বললেন (তিনি কে কেউ জানে না): আল্লাহ'র রাসুল (স) কে শরীরে কাপড় রেখে গোসল দাও। সুতরাং শরীরে জামা রেখে জামার ওপর পানি ঢেলে সরাসরি হাতের স্পর্শ ব্যতীত জামা দিয়ে ঘসে গোসল প্রদান করা হয়। মা আয়েশা (র) বলেন: যদি এটি আমার কাজ হতো তাহলে আমি পেছনে থাকতাম না। অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসুল (স) কে গোসলদানের বিষয় আমার সামনে আসলে আমি পিছিয়ে থাকতাম না, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে গোসল দিতেন[৪]।

---

[১]) সূরাহ আলে ইমরান: ১৪৪।

[২]) সহীহ বুখারী [৪১৮৭] দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ।

[৩]) সহীহ বুখারী [৩০৯৮ ও ৪৪৬১]।

[৪]) সুনান আবী দাউদ [৩১৪১] সুনান ইবন মাজাহ [১৪৬৪] ও মুসনাদ আহমদ [২৬৩০৬]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাফন ও নামাযে জানাযাহ

আল্লাহ'র রাসুল (স) কে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল; তার মধ্যে কামীস (জামা) ও পাগড়ী ছিল না[১]। অতঃপর সাহাবীগণ ইমাম ব্যতীত তাঁর নামাযে জানাযাহ আদায় করেন। ইবন আব্বাস (র) বলেন: যখন আল্লাহ'র রাসুল (স) মৃত্যুবরণ করেন পুরুষদের ভিতরে ঢুকানো হয়। অতঃপর তারা ইমাম ব্যতীত এককভাবে তাঁর নামাযে জানাযাহ আদায় করেন। তারপর মহিলাদের ভিতরে ঢুকানো হয়। অতঃপর তারা ইমাম ব্যতীত এককভাবে তাঁর নামাযে জানাযাহ আদায় করেন। তারপর বালকদের ভিতরে ঢুকানো হয়। অতঃপর তারা ইমাম ব্যতীত এককভাবে তাঁর নামাযে জানাযাহ আদায় করেন। তারপর দাসদের ভিতরে ঢুকানো হয়। অতঃপর তারা ইমাম ব্যতীত এককভাবে তাঁর নামাযে জানাযাহ্ আদায় করেন। কেউ তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেননি[২]।

আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাফন

সাহাবীগণের মধ্যে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র দাফনের স্থান নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। কেউ বলেন মিম্বরের পাশে তাঁকে দাফন করা হোক। কেউ বলেন তাঁকে বাকীতে (বাকিউল গারকদ কবরস্থান) দাফন করা হোক। কেউ বলেন তাঁর নামাযের স্থানে দাফন করা হোক। অতঃপর অবু বকর (র) এসে বললেন যে, উক্ত বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র কাছ থেকে যা শুনেছি তা আমি ভুলে যাইনি। অতঃপর তিনি বলেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো নবীকে তাঁর দাফনের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মৃত্যু প্রদান করেন না বিধায় যেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা অপরিহার্য[৩]। সুতরাং তাঁর বিছানায় তাঁকে দাফন করো। ইবন কসীর বলেন: একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মা আয়েশা (র)'র ঘরে যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানে দাফন করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর পাশে আবু বকর (র) ও উমর (র) কে দাফন করা হয়[৪]। দাফনের উদ্দেশ্যে আলী (র), ফাদ্বল ইবন আব্বাস (র), কুসাম ইবন আব্বাস (র) কবরে নেমেছেন[৫]। অধিকাংশ ইতিহাসবিদগণের মতে তাঁকে বুধবার রাত্রে দাফন করা হয়[৬]।

---

[১]) সহীহ বুখারী [১২৬৪] সহীহ মুসলিম [৯৪১] সুনান আবী দাউদ [৩১৫১] জামে তিরমিযী [৯৯৬] সুনান নাসায়ী [১৮৯৯] সুনান ইবন মাজাহ [১৪৬৯] ও মুসনাদ আহমদ [২৪৮৬৯]।

[২]) আল-বায়হাকী, দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়াহ, সম্পাদনা ড. আবদুল মু'তী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ ইং:৭/২৫০। সুনান ইবন মাজাহ [১৬২৮]। মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত: ৫/২৩২।

[৩]) জামে তিরমিযী [১০১৮] শায়খ আলবানী সহীহুল জামে [৫৬৪৯]।

[৪]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৫/২৩৮।

[৫]) সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত: ৪/৩২১।

[৬]) ইবন কাসীর, বিদায়াহ নিহায়াহ, প্রাগুক্ত:৫/২৩৭।

উপসংহার

আল্লাহ'র রাসুল (স) কে মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও রাহমত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নিজ সমাজে তথা সমগ্র আরবাঞ্চলে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেতে পরিচিত ছিলেন। কুরাইশ তাদের মূল্যবান সবকিছু তাঁর কাছে আমানত রেখে যেমন মূল্যবান বস্তুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো তেমনি নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁকেই সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে একমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতো। সুতরাং তাঁর নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে কাবাহ নির্মাণের সময় সমগ্র আরবজাতির হৃদয়ে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ বস্তু "হাজরে আসওয়াদ" প্রতিস্থাপন নিয়ে অতি স্পর্শকাতর বিরোধপূর্ণ সমস্যার সমাধানে তাঁকেই সালিস মনোনীত করা হয়েছিল; কিন্ত নুবুওয়্যতপ্রাপ্তির পর ইসলামের মৌলিক বার্তা একত্ববাদ, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে যিনি চল্লিশ বছর ধরে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী, কখনো কবি, আবার কখনো যাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানাবিধ নির্যাতন, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। কখনো শারীরিক, কখনো মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। গুপ্তহত্যার হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন, শেষ পর্যায়ে প্রকাশ্য হত্যার হুঙ্কারের মুখে মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী ও নির্দেশে আবু বকর (র) কে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। সেখানেও কুরাইশ তাঁকে শান্তিতে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করেছে, গুপ্তহত্যার চেষ্টা করেছে এবং মদীনায় অবস্থানরত মুনাফিক ও ইহুদীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন; সুতরাং তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়াদির পর্যালোচনাপূর্বক তাতে আমাদের জন্য কী উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে তা এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া সীরাতে রাসুল (স) সাধারণ ব্যক্তি, সমাজ সংস্কারক বা কোনো জাতীয় নেতার জীবনালেখ্য নয় যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে সঠিক চিত্রায়ন করা যাবে। আল্লাহ'র রাসুল (স)'র জীবনের প্রতিটি অংশের সাথে অহীর সম্পৃক্ততা বিদ্যমান এবং তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ ব্যতীত কোনো অভিমত ব্যক্ত করতেন না বিধায় তাঁর জীবনালেখ্য রচনা অথবা অধ্যয়ন কুরআন করীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; যেমনটি মা আয়েশা সিদ্দীকা (র) হাসান (র) বিন আলী (র)'র প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: তোমরা কী কুরআন পড়ো না?{كان خلقه القرآن}[আল-কুরআনই তো তাঁর জীবনালেখ্য][১]।

সুতরাং এই গ্রন্থ রচনায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল্লাহ'র রাসুল (স) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ ও আল্লাহ'র রাসুল (স) সম্পর্কে তাঁর সাহাবীদের বর্ণনা মৌলিকসূত্র হিসেবে বিবেচনা করে অন্যান্য সঠিক তথ্য-সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ'র রাসুল (স)'র

---

১) মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩।

জীবনচরিত'র চিত্রায়ন ও পর্যালোচনা **"সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা"** শিরোনামের গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

তবে তথ্যনির্ভর ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সূত্রসমূহের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণানীতির আলোকে যথাযথ উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থে উদ্ধৃত কুরআন করীমের আয়াতসমূহ মূল আরবী টেক্সসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সূরাহ ও আয়াত নাম্বর রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে কুরআন করীমের মতো মূল আরবী টেক্স সবক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীস টেক্সসহ লিপিবদ্ধ করা হলেও অধিকাংশ হাদীসের বঙ্গানুবাদ সারমর্মসহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং রেফারেন্সের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হাদীসের সংকলিত গ্রন্থসমূহের হাদীসের ক্রমিক নাম্বরানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে **"সীরাতুন্নবী (স)'র উপদেশ ও শিক্ষা"** শিরোনামের ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক গ্রন্থটি সীরাতে রাসুল (স)'র চিরন্তন ও নান্দনিক সৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাবিত বিষয়াদির মাধ্যমে মানবজাতির সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ তথা মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক রীতিনীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চিত্রায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সীরাত পাঠকের জ্ঞানভান্ডারে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী মুহাম্মদ (স)'র আলোকিত জীবনের আদর্শে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

তথ্যসহায়ক গ্রন্থাবলী নির্দেশিকা

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. আবদুর রজ্জাক, মুসান্নাফ, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী।

৩. আবদুর রহমান আহমদ বিন শুআইব বিন আলী আন-নাসায়ী, সুনানে নাসায়ী, দারু আল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১।

৪. আবদুল কাদির হামিদ আত্তাজানী, উসুলু আল-ফিকরি আস-সিয়াসী ফী আল-কুরআনি আল-মক্কী, দারুল বশীর, আম্মান, জর্ডান, প্রথম প্রকাশ:১৪১৬ হি:/১৯৯৫ ইং।

৫. আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস বিন ইসহাক, সুনান আবী দাউদ, দারু আল-ফিকর, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

৬. আবু আবদিল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, আল-মাকতাবু আল-ইসলামী, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

৭. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,১ম সংস্করণ, ১১৯০।

৮. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, দারু আল-মানারাহ, জিদ্দাহ, তারিখ ব্যতীত।

৯. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ, সুনান ইব্‌ন মাজাহ, দারু আল-ফিকর, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

১০. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন মালিক বিন আনাস, আল-মুআত্তা, দারু ইয়হইয়াউ আত-তুরাস আল-আরবী, মিশর, তারিখ ব্যতীত।

১১. আবু নুআইম আহমদ বিন আবদিল্লাহ আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, মাতবাআতু আস-সাআদাহ, মিশর, ১৩৫১ হিজরী।

১২. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, জামে তিরমিযী, লাজনাতু আত-তালীফ, ওয়া আন-নাশর, বৈরুত, ১৯৬৪।

১৩. আবু খলীল শওকী, আতলাস-আস-সীরাহ আল-নাবভিয়্যাহ, দারুস সালাম, কায়রো, ১৯৮৬।

১৪. আবু বকর আল-বায়হাকী,দালায়িলু আন-নুবুওয়্যাহ,আল-মাকতাবাহ আল-ইলমিয়্যাহ,বৈরুত, ১৯৬৪।

১৫. আবু বকর আহমদ বিন আমর আল-বাযযার, আল-মুসনাদ, মাকতাবাতু আল-উলুম ওয়া আল-হিকাম, মদীনা, সৌদি আরব, ১৯৮৮ ইং।

১৬. আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-বায়হাকী, শুআব আল-ঈমান, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী।

১৭. আবু বকর ইবনুল আরবী, আহকামুল কুরআন, দারু ইয়হইয়াউ আত-তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, ১৪০৫ হিজরী।

১৮. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আহমদ ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, দারু আল-ফিকর, বৈরুত, ১৪০৫।

১৯. আবু হাতিম মুহাম্মদ বিন হিব্বান, সহীহ ইব্ন হিব্বান, মুআস্সাসাহ আর-রিসালাহ, কায়রো, তারিখ ব্যতীত।
২০. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আবকরিয়্যাতু মুহাম্মদ (স), আল-মাকতাবাহ আল-মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ, কায়রো, ১৯৬৪ ইং।
২১. আয-যুরকানী, মুআত্তা'র ব্যখ্যা, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১১ হিজরী।
২২. আল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ আত-তাবারানী, আল মুজামু আল-কাবীর, আল-মাকতাবাতু আয-যাহরা, আল-মাউসূল, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩।
২৩. আল-মাওয়ারদী, আল-আহকামু আস-সুলতানিয়্যাহ, মাকতাবাতু দারি ইবনে কুতাইবাহ, কুয়েত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯।
২৪. আল-মাসউদী, মুরুজ আয-যাহাব, দারু আত-তিবাআহ আল-মুআসিরাহ, মিশর, ১২৮৩।
২৫. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, সম্পাদনা; ড. মারসিদন জোন্স, আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৫ হিঃ/১৯৮৪ ইং:।
২৬. আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ আরদ ওয়াকায়ে ওয়া তাহলীল আহদাস, মুআসসাসাতু আর-রিসালাহ, লেবানন, ২০০৯ ইং/১৪৩০ হিজরী
২৭. আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী, আসবাব আন-নুযুল, সম্পদনা ও পর্যালোচনাঃ কামাল বাসুয়ুনী যাগলুল, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।
২৮. আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী, আসবাবু আন-নুযুল, সম্পদনা ও পর্যালোচনাঃ কামাল বাসুয়ুনী যাগলুল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯১ ইং।
২৯. আলী বিন বুরহানুদ্দীন আল-হালবী, আস-সীরাহ আল-হালবিয়্যাহ ফী সীরাতে আল-আমীন ও আল-মামুন, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।
৩০. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালে আল-মুসতাফা, মুওয়াসসাতু আস-সাদিয়্যাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ২০১৫ ইং।
৩১. আল্লামা মুহাম্মদ ফুযাইল যুরহুনী, আল-ফাজরু আস-সাতিয় আলা আস-সহীহ আল-জামেয়, মাকতাবাতু আর-রুশদ, বৈরুত, লেবানন, ২০০৯।
৩২. আকরাম আল-উমরী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ আস-সহীহা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা, সৌদি আরব, ১৪১২ হি:/১৯৯২ ইং।
৩৩. আশ-শারবীয়ানী, মুগনী আল-মুহতাজ, দারু আল-ফিকর, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।
৩৪. আহমদ বিন আবদুর রাহমান আস-সাআতী, আল-ফাতহু আর-রাব্বানী,দারুল হাদীস, কায়রো, ১৯৫৭।
৩৫. ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল বার,আত-তামহীদ, মুআসসাতু আল-ফুরকান লি আত-তুরাস আল-ইসলামী, লেবানন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ হি:/১৯৭৬ ইং।

৩৬. ইব্‌নে কালবী, কিতাবু আল-আসনাম, দারু আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ৪থ সংস্করণ, ২০০০।

৩৭. ইব্‌ন ইসহাক, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরী।

৩৮. ইব্‌ন কাসীর, তাফসীরু আল-কুরআনিল আযীম, দারু আস-শাআব, কায়রো, ১৯৫৮।

৩৯. ইব্‌ন হাযম, আল-মাহাল্লী, ইয়াহইয়াউ আত-তুরাস আল-আরবী, দারু আল-আফাক আল-জাদীদাহ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

৪০. ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, ইসাবাহ ফী তাময়ীযি আস-সাহাবাহ, মাকতাবাহ আয-যাহারিয়্যাহ, কায়রো, তারিখ ব্যতীত।

৪১. ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, আল-মাকতাবাহ আল-সালাফিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৪৭।

৪২. ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারুল জীল, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি।

৪৩. ইব্‌নুল কাইউম, যাদু আল-মাআদ, ইবনে কাইউম আল-জাওযিয়াহ, মাকতাবাতু আল-মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত, ২৭ তম সংস্করণ, ১৯৯৪।

৪৪. ইবনে খালিক্কান, অফইয়াতু আল-আ'ইয়ান, দারু আস-সাদির, বৈরুত, ১৯৭২।

৪৫. ইবন কুতাইবাহ আদ-দ্বীনওয়ারী, তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস, দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত, লেবানন, তারিখ ব্যতীত।

৪৬. ইবন সাইয়েদিন্নাস, উয়ুনুল আছার ফী ফুনুনি আল-মাগাযী ওয়া আস-শামায়িল ওয়া আস-সিয়ার, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

৪৭. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমুউ আল-ফাতাওয়া (ফাতওয়াহ সংকলন) দারুল ইফ্‌তা, রিয়াদ, ১৯৬৮।

৪৮. ইবনুল আসীর, উসুদু আল-গাবাহ ফী মাআরিফাতি আস-সাহাবাহ, দারু ইবনে হাযম, ১ম সংস্করণ, ২০১২।

৪৯. ইবনুল কাইউম, মাজমুউ আল-ফাতাওয়া (ফাতওয়াহ সংকলন) দারু আল-ইফ্‌তা, রিয়াদ, ১৯৬৮।

৫০. ইবনুল কাইউম, যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, মুআসসাতু আর-রিসালাহ, কায়রো, ১৩৯৯ হিজরী।

৫১. ইবরাহীম আল-আলী,সহীহুস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ,দারু আন-নাফায়েস, ১৪০৮ হি:/১৯৯৮ ইং।

৫২. ইমাম শাফেয়ী, আল-উম, দারু আল-মাআরিফ, বৈরুত,তারিখ ব্যতীত।

৫৩. ইমাম শাতেবী, আল-মুওয়াফিকাত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, পাবলিকেশন, ১৯৮৭।

৫৪. ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, দারু আস-শাআব, কায়রো, তারিখ ব্যতীত।

৫৫. ইমাম গাযালী, ইয়াহইয়াউ উলুম আদ-দ্বীন, দারু আল-মাআরিফ, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।

৫৬. ইমাম তাবারী, তারীখ, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি।
৫৭. ইযযুদ্দীন ইবন বদরুদ্দীন আল-কান্নানী, আল-মুখতাসারু আল-কাবীর ফী সীরাতে আর-রাসুল, দারু আল-বাশীর, আম্মান, জর্ডান, ১৯৯৩ ইং।
৫৮. কুসতুলানী, ইরশাদু আস-সারি লি শারহি সহীহ আল-বুখারী, আল-মাকতাবাতু আল-কুবরা, মিশর, তারিখ ব্যতীত।
৫৯. নিযামুদ্দীন আল-বালখী ও অন্যান্য, ফাতোয়া আলমগিরী, দারু আল-ফিকর, বৈরুত, ১৩১০ হিঃ।
৬০. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮৬।
৬১. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারাল, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮৬ ইং।
৬২. মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী, অহয়ু আল-কালাম, মাকতাবা মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৭।
৬৩. মুনীর আল-গাদ্ববান, আল-মানহাজুল হারাকী লিস-সীরাহ, মাকতাবাহ আল-মানার, জর্ডান, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ ইং;১/৬৭-৬৮।
৬৪. মুসা বিন রাশেদ আল-আযেমী, আল-লুলু আল-মাকনূন ফী সীরাতে আন্নবিউল মামুন, আল-মাকতাবাতুল আমেরিয়্যাহ, কুয়েত, ১৪৩২ হিঃ/২০১১ ইঃ, পৃঃ ১/৩৭৩।
৬৫. মুসলিম বিন হজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিসাপুরী, সহীহ মুসলিম, দারু ইয়হইয়াউ আত-তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, তারিখ ব্যতীত।
৬৬. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আবু ফারিস, আস-সিরাউ মাআ আল-ইহুদ, দারুল ফুরকান, ১৯৮৯ ইং।
৬৭. মুহাম্মদ আবু ফারিস, আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যীন, দারুল ফুরকান, ১৪১১ হিজরী/১৯৯০ ইং।
৬৮. মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ ফী দ্বাওই আল-কুরআন ওয়াস-সুনন্নাহ, দারুল কালম, দামেস্ক, ১৪১৭ হি:/১৯৯৬ ইং।
৬৯. মুহাম্মদ আল-মুবারক, বাস্তবতার আলোকে আরবজাতি, দারুল কলম বৈরুত, ১৯৭৬ ইং।
৭০. মুহাম্মদ আল-খাযির, ইতমামুল অফা ফী সীরাতি আল-খুলাফা, মাকতাবা ছাকাফিয়্যাহ, ১৯৮২।
৭১. মুহাম্মদ আল-খাদ্বরামী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল ফাইহা, দামেস্ক, ১৪২৫ হিঃ, পৃঃ ৫১।
৭২. মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিকহু আস-সীরাহ, দারু আল-কলম, দামেস্ক, ১৯৯৮ ইং।
৭৩. মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, নাইলু আল-আওতার, ইদারাতু আত-তিবায়াহ ওয়া আল-মুনীরিয়্যাহ, বৈরুত,তারিখ ব্যতীত।

৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাআদ, আত-তাবকাতু আল-কুবরা, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৩৭।

৭৫. মুহাম্মদ ইবন সাইয়েদুন্নাস, উয়ুনু আল-আছার ফী ফুনুন আল-মাগাযী আস-শামায়েল ওয়াস-সিয়ার, মাকতাবাতু আন-নাহদাহ, মিশর, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৫ ইং।

৭৬. মুহাম্মদ কালআজী, কিরাআহ সিয়াসিয়্যাহ লিস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ, দারুন নাফায়েস, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ ইং।

৭৭. মুহাম্মদ সাদিক আরজুন, মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ (স), দারুল কলম, বৈরুত, ১৪১৫ হি:/১৯৯৫ ইং।

৭৮. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মদ, দারু আল-মাআরিফ, কায়রো, ১৪ তম সংস্করণ, তারিখ ব্যতীত।

৭৯. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-আদাবু আল-মুফরাদ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, মুআস্‌সাসাহ আর-রিসালাহ, কায়রো, তারিখ ব্যতীত।

৮০. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আস-সানআনী, সুবুল আস-সালাম শরহু বুলুগ আল-মুরাম, মাকতাবাতু মুসতাফা আল-বাবি আল-হালাবী, মিশর, ৪র্থ সংস্বকর, ১৯৬০।

৮১. মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, সম্পাদনা ড. মার্সাদন জুন্স, আলাম আল-কুতুব, বৈরুত, ১৪১৫ হি:/১৯৮৪ ইং।

৮২. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত,কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮ ইং, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

৮৩. যরকশী, ইলামু আস-সাজিদ বি আহকামি আল-মাসাজিদ, মাজলিসু আল-আলা লি আস-শুয়ুন আল-ইসলামিয়্যাহ, মিশর, ৫ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী।

৮৪. শরফুদ্দিন আন-নাভভী, শরহু মুসলিম, দারু ইয়হইয়াউ আত-তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরী।

৮৫. শাহরিস্থানী, আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল, দারু আল-মাআরিফ, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরী।

৮৬. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আল-আহাদীসু আদ-দাঈফাহ, দারুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২।

৮৭. শায়খ উসাইমীন, মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু ইবন উসাইমীন, দারু আল-ওয়াতন, রিয়াদ, সৌদি আরব, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৪১৩ হি:।

৮৮. শায়খ মহাম্মদ বিন আবদুল ওহহাব, মুখতাসারু সীরাতি আর-রাসুল (স), মুহাম্মদ ইবনে সউদ আল-ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব, তারিখ ব্যতীত।

৮৯. শায়খ মুহাম্মদ বিন সাালিহ হাফিয ইবন দিহয়া, ইলামু আল-ওয়ারা বিআলামি আল-হুদা,দারু আল-ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংসকরণ, ১৩৯৭ হিজরী।

৯০. সফীউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীক আল-মাখতুম, মুওয়াসসসাতু আর-রিসালাহ, লেবানন, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ ইং।

৯১. সাইয়েদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, দারুস শুরুক, ১৯৮০ ইং/১৪০০ হিঃ :১/২৯।

৯২. সাঈদ রামাদ্বান আল-বুতী, ফিকহু আস-সীরাহ আন-নাবভিয়্যাহ মাআ মুজিয লিতারিখিল খুলাফাহ আর-রাশিদাহ, দারুস সালাম, মিশর, ১৪৩১ হিজরী/২০১০ ইং।

৯৩. সালিহ বিন হুমাইদ ও অন্যান্য, নাদ্বরাতুন নাঈম ফী মাকারিমে আখালাকি আর-রাসুলি আল-করীম, দারুল ওয়াসীত, ১৪১৮ হিজরী।

৯৪. সুলাইম হিজাযী, মানহাজ আল-ইলামু আল-ইসলামী ফী সুলহি আল-হুদাইবিয়াহ, দারুল মানারাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ ইং।

৯৫. হাফিয আবুল খাত্তাব, আত-তানভীর ফী মাওলিদি আল-বাশীর ওয় আন-নাযীর, দারু আল-ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংসকরণ, ১৩৯৭ হিজরী।

৯৬. হাফিয ইরাকী, শারহু আত-তাসরীব, তবায়ে আল-মিসরিয়্যাহ আল-কাদীমাহ, তারিখ ব্যতীত।

সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন এর প্রকাশনা সমূহ

নং	বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশসাল
১.	Productivity and Efficiency Challenges of Microcredit Program in Bangladesh	Md. Mahmudul Alam Prof. Dr. Rafiqul Islam Molla	২০১৩
২.	Development Issues Policies and Actions	Prof. Dr. Rafiqul Islam Molla Dr. Md. Wahid Murad Md. Mahmudul Alam	২০১৩
৩.	A manual on Sampling Techniques for Survey	Dr. Sheikh Sirajul Islam	২০১৫
৪.	القواعد الفقهية والأصولية في ضوء الأحاديث النبوية " "Al Qawaed Al Fiqhiya wal Usuliayah Fi Daw el Ahadith Al Nabawiyah" (The Jurisprudic Principles In the Light of Islamic traditions)	Prof. Dr. Abu Reza Muhammad Nezamuddin Nadwi	২০২১
৫.	دراسات عن الترجمات البنغالية لمعاني القرآن الكريم	Prof. Dr. Md. Nazmul Hoque Nadwi	২০২২
৬.	বিরল প্রতিভার এক জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.	প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী	২০২২
৭.	ইসলামি আইনশাস্ত্রের মুলনীতিমালা	প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী	২০২২
৮.	আল্লামা ফজুল্লাহর কাব্যানুবাদ	প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী	২০২২
৯.	Maxims of Islamic Jurisprudence	Prof. Dr. Abu Reza Muhammad Nezamuddin Nadwi	২০২২
১০.	কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ রহ. (কাব্যগ্রন্থ)	প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী	২০২২

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লাল মোহাম্মদ সিকদার বাড়ীতে সত্তরের দশকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা সিরাজুল হক একজন শিক্ষক ও সমাজসেবক এবং মাতা খালেচা বেগম একজন গৃহিণী। শৈশবে গ্রামের হিফ্য মাদরাসায় পবিত্র কুরআন করীমের হিফ্য সম্পন্ন করে মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৯০ সালে জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি (প্রকাশ জিরি মাদরাসা) থেকে দাওরা হাদীসে প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে ভারতের নাদওয়াতুল উলামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী সাহিত্যে আলেমিয়্যাহ বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৯৯৬ সালে ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার পরিচয় দেন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিশরীয় আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যিক নাজীব মাহফুযের কথাসাহিত্য নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভ আরব বিশ্বের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান Modern Book's World থেকে ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়।

এ পর্যন্ত তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভসহ গ্রন্থ: আরবী-৬ ও বাংলা-৪ সর্বমোট: ১০ এবং গবেষণা প্রবন্ধ: আরবী-৫২, বাংলা-৩০ ও ইংরেজী-১ সর্বমোট: ৮৩ [দেশে-৩২ ও বিদেশে-৫১] প্রবন্ধ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০টি পিএইচডি থিসিস মূল্যায়ন করেছেন এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ২০ গবেষণা জার্ণালের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি রাবেতা আদবে ইসলামী বাংলাদেশ ব্যুরু'র নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ'র মনোনীত সদস্য।

আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, কুয়েত, চেচনিয়া, জর্ডান, তুরস্ক, তিউনিসিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত, মরক্কো, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, মিশর, রাশিয়া, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুদান ও সৌদি আরবসহ ২১টি দেশের ৪৮টি আন্তর্জাতিক সেমিনার, কনফারেন্স ও সিম্পোজিয়ামে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, কুরআন-হাদীস, সীরাহ ও ইসলামিক স্টাডিজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও যুগপোযোগী বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

কর্মজীবনে তিনি কিছুদিন কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বর্তমান তিতাস উপজেলায় গাজীপুর খান বহুমুখী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ২০০১ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীনে আরবী ভাষার লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং ২০১৪ সালে উক্ত অনুষদের সায়েন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি দক্ষতার সাথে অনুষদের ডীন ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দুই মেয়াদে প্রায় দশ বছর আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট'র পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সায়েন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে দ্বিতীয় মেয়াদে চেয়ারম্যান ও সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন'র মহাপরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সর্বোচ্চ পর্ষদ সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

IIUC

সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

978-984-35-9031-2
978-984-35-9031-2